'গৃহস্থ' গ্রন্থাবলী——২

বিশ্ব-শক্তি

('গৃহস্থ' হইতে পুনর্মুদ্রিত)

——:*:——

কলিকাতা,

ষ্টুডেণ্ট্‌স্‌ লাইব্রেরী,

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্‌,

১৩২০

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ইণ্ডিয়া প্রেস্
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী,
কলিকাতা
প্রিণ্টার—শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু

প্রকাশক
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেণ্ট্স্ লাইব্রেরী
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

প্রবন্ধগুলি 'গৃহস্থে' প্রথম বাহির হইয়াছিল একণে পাঠক-গণের অনুরোধে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল।

চৈত্র, ১৩২০
২৪নং মিডিল রোড, ইটালী,
কলিকাতা।

প্রকাশক

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিশ্ব-শক্তি

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন *

বিগত পৌষ মাসে কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনে সমগ্র হিন্দুস্থানের সাহিত্য-সেবিগণ উপস্থিত ছিলেন। লাহোর, দিল্লী, বিকানীর, রিবা, কাণপুর, নৈনিতাল, বিলাসপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দীভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত তিন দিন সম্মিলনের কার্য্য চলিয়াছিল।

এই সম্মিলনে বাঙ্গালীর দেখিবার, বুঝিবার এবং নূতন শিখিবার অনেক জিনিষই ছিল; অধিকন্তু বাঙ্গালাদেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় —সকল হুজুগের আড্ডায়—সকল সৎপ্রয়াসের কেন্দ্রস্থলে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল; কিন্তু বাঙ্গালাদেশ, বাঙ্গালী-সমাজ এবং বঙ্গসাহিত্য এই অনুষ্ঠান হইতে কোন সংবাদ বা শিক্ষা গ্রহণ করিল কি না সন্দেহ।

---

* গৃহস্থ (মাঘ, ১৩১৯) হইতে।

বাঙ্গালী কি সাহিত্যচর্চ্চা করে না? বাঙ্গালার সমাজে কি বিদ্যার গৌরব নাই? তাহা হইলে এত দিন ধরিয়া কি শিখিলাম? উত্তর-বঙ্গের ও সর্ব্ব বঙ্গের এতগুলি সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া কি ফল ফলিল? বাঙ্গালাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কি কম হইয়াছে বা হইতেছে? বাস্তবিক পক্ষে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালাদেশেই ত বিদ্যাচর্চ্চা ও সাহিত্যানুশীলনের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। মৌলিক সাহিত্য বঙ্গদেশেই অধিক রচিত হইয়াছে।

তথাপি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিতে পারিলাম না কেন? আমাদের সাহিত্যে ইহার কোন প্রভাব দেখিতে পাইব কি? আমাদের কর্ম্মিগণের হৃদয়ে ইহার দ্বারা কোন নূতন আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইবে কি? এই সাহিত্য-সম্মিলনের সুযোগে আমরা আমাদের কর্ম্মপ্রণালীর নূতন কোন দিক দেখিতে পাইব কি? এই সকল প্রশ্নই আমাদের মনে উপস্থিত হইয়াছে।

অবশ্য কয়েকজন বাঙ্গালী—বঙ্গসমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবী যে হিন্দীসম্মিলনের সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তাহা নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও যে কয়েক জন প্রতিনিধি পাঠান নাই—তাহাও নহে। আফিসী কায়দার কোন ত্রুটিই হয় নাই। সৌজন্য-রক্ষার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য, বাঙ্গালীরা ব্যক্তিগত ভাবে অথবা পরিষদের "ডেলিগেট" ভাবে তাহা কথঞ্চিৎ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু নিমন্ত্রণ-রক্ষার দায়িত্ব এক—কর্ম্মে যোগদান আর। একটাতে আফিসের সম্বন্ধ—কাগজে কলমে লেখার সম্বন্ধ—ছাপার অক্ষরে নাম প্রকাশিত হইবার সম্বন্ধ। অপরটিতে হৃদয়ের সম্বন্ধ, চরিত্রের যোগাযোগ, বন্ধুত্বের পরিচয়,—জাতীয়তাবর্দ্ধনের লক্ষণ—ঐক্য-বন্ধনের উপায়। আমাদের দুঃখ এই যে, এখন পর্য্যন্ত আমরা কোন কাজেই আন্তরিকতা,

হৃদয়ের আসক্তি, প্রকৃত ব্যাকুলতা, দেশের জন্য মর্ম্মবেদনা, সাহিত্যের জন্য বৈরাগ্য অনুভব করিতে পারি না। কেবল লোক দেখান ভালবাসাই আমাদের হৃদয়ের একমাত্র সম্বল। 'লোকে কি বলিবে ?'—এই আশঙ্কায়ই আমরা কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকি। আমাদের চলাফেরা, উঠাবসা, বক্তৃতা-আলোচনা, সভাসমিতিগঠন, দশের কর্ম্মে যোগদান, সকল বিষয়েই জাতীয় চরিত্রের অসারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যদি সমাজের প্রকৃত অভাব, অভিযোগ, আদর্শ ও লক্ষ্যের জীবন্ত উৎস হইতে আমাদের কর্ম্মরাশির উদ্ভব হইত, তাহা হইলে সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবন-প্রবাহের সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম। যদি দেশের মাটীর সঙ্গে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মকর্ত্তা ও চিন্তাবীরেরা ভারতবর্ষকে আরও ভাল করিয়া চিনিতে চেষ্টা করিতেন। যদি বাস্তবিক তাড়নার প্রভাবে সমাজহিতের আকাঙ্ক্ষা জন্মিত, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে আমরা আর এক চোখে দেখিতে শিখিতাম। যদি দেশভক্তি ধর্ম্মভাবে চিত্তকে আলোড়িত করিত, তাহা হইলে ছাত্র ও শিক্ষার্থিবৃন্দ, জনসাধারণ এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সমাজের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত জীবন্ত সম্বন্ধে পরিচিত হইতে চেষ্টা ও শিক্ষা করিতে পারিত।

এই হিন্দী-সম্মিলনকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের ছাত্রগণ দেখাইয়াছে যে, তাহারা দেশকে এখনও চেনে নাই—চিনিতে শিখে নাই—চিনিতে চেষ্টাও করে না। অভিভাবকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাতৃভাষার সেবা নিষ্প্রয়োজন—সাহিত্যের আলোচনায় কোন লাভ নাই। আর নেতৃগণ ত কাউন্সিলে নির্ব্বাচন এবং কংগ্রেস ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন লইয়াই ব্যস্ত!

কিন্তু বাঙ্গালার ভবিষ্যতের যাঁহারা আশার স্থল—সেই ছাত্রবৃন্দের এরূপ উৎসাহহীনতা অতীব শোচনীয়। বই পড়া, আর পাশ করা—কিম্বা নামাজদা লোকের বক্তৃতা শুনাই কি তোমাদের একমাত্র ধর্ম্ম ?

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, আমরা যে কথা বলিতেছি প্রায় সেইরূপই কলিকাতার দৈনিক "নায়ক" বলিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার উক্তি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অনেক ভাবিবার কথা আছে :—

"এই উপলক্ষে একটা সোজা কথা কহিয়া রাখিব। হিন্দুস্থানের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ রাখিতে হইলে, রাজনীতি, ব্যবসায়নীতি বা অন্য কোন নীতির সাহায্য গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সমাজ—এই কয়টার সমন্বয় ঘটাইতে পারিলে, তবে আমরা এক হইতে পারিব—এক ভাবে ভাবুক হইয়া, এক মহাজাতি গড়িয়া তুলিতে পারিব। আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ হিন্দী ও উর্দ্দ জানিতেন, হিন্দুস্থানের সহিত আচার-ব্যবহারগত সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাই ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, নিধুবাবু পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কাব্যে ও গানে হিন্দুস্থানের ছাপ পরিস্ফুট ছিল। পরে ইংরেজী শিখিয়া, সাহেব সাজিয়া, ভারতবর্ষকে ভুলিয়া, আমরা বাঙ্গালী বাবু একেবারেই ইউরোপের প্রেমে ডুবিয়া গেলাম। ফিরিঙ্গী সাজে কালোবরণ ঢাকিয়া, ডিঙ্গী মারিয়া বড় হইয়া আমরা আমাদের অনুচিকীর্ষার বাহার খুলিলাম। তাই রঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক কবিগণের কাব্যগাথায় কেবল ইউরোপের ছায়াই দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতীয় গন্ধ তিলমাত্র নাই। ফলে, বাঙ্গালার সাহিত্য কতকটা কাচের ঘরে টবে বসান ফুলের মতন হইয়াছে। এখন যদি আবার হিন্দুস্থানের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে হয়, ভাবের আদান-প্রদান করিতে হয়, তাহা

হইলে আমাদিগকে হিন্দী শিখিতে হইবে। বোধ হয় বাঙ্গালার অনেকে জানেন না যে, বিশাল হিন্দুস্থানের সুলেখক মাত্রেই বাঙ্গালা ভাষা জানেন, বুঝেন এবং নিয়মিত বাঙ্গালা পুস্তক সকল পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আর হিন্দুস্থানের কাছে আত্মপরিচয় দিতে হইবে না। পরন্তু হিন্দুস্থানের পরিচয় বাঙ্গালীকে লইতেই হইবে। সে পরিচয় লইতে হইলে বাঙ্গালীকে হিন্দী শিখিতে হইবে; হিন্দী-সাহিত্যসেবীদিগের সহিত এক ভাবের ভাবুক হইতে হইবে। তোমরা ফরাসী জর্ম্মণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা শিখিতে কষ্টবোধ কর না, ভারতের হিন্দী, উর্দ্দু, মারাঠী, গুজরাটি শিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে কেন? জ্ঞানে, গুণে, পাণ্ডিত্যে যদি ভারতের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়া থাকিতে চাও, তবে ভারতের নবীন ভাব-তরঙ্গের উপর ভাসিতে শিক্ষা কর। সত্য বলিতে হইলে, বলা প্রয়োজন যে, মনীষার প্রভাবে এখনও বাঙ্গালা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালার আচার্য্য জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ-প্রমুখ পণ্ডিতগণ ভারতে অপরাজেয় হইয়া আছেন। এখনও কি বাঙ্গালীর আত্মবোধ হইবে না? এখনও কি সাহিত্য-পরিষদ্ প্রাদেশিকতা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের ভাবে বিভোর হইবেন না?

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের বিরাট সভা-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের মনে এই ভাবটাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার ও হিন্দুস্থানের মনীষিগণকে দেখিয়া সাধ হইয়াছিল, উভয়পক্ষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না কি? উভয় পক্ষে ভাবের আদান-প্রদান চলে না কি? গোটা ভারতকে এক করিতে চাও, বচনে ত খুব লম্বাই চৌড়াই কর; কিন্তু কিসে কি হইতে পারে সে ভাবনা ত ভাব না, সে সাধনা ত কর না। আমাদের দুঃখই ঐ জন্য।"

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

বাঙ্গালাদেশে নানা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। পল্লীতে, সহরে, মফঃস্বলে, কলিকাতায় বহুস্থানে বিচিত্র কর্ম্মকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। এই সমুদয় কর্ম্মের একটা সাধারণ প্রতিবন্ধক অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সেটা দেশের স্বাস্থ্যের অবনতি। যাঁহারা কাজে নামিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে বঙ্গদেশের এই অস্বাস্থ্যকর বিষয় মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত আছেন। আমাদের কর্ম্মিগণের উৎসাহ, সাহস, নির্ভীকতা ও একাগ্রতা স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় যথেষ্ট কমিয়া যাইতেছে। যতগুলি কারণে আমাদের চেষ্টাসমূহ কিছু কিছু বিফল হইতেছে, তাহার মধ্যে জলবায়ুর প্রতিযোগিতা প্রধান বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

সুতরাং আমাদের সমাজে এখন যেমন বিদ্যাপ্রচারক, শিল্পপ্রচারক, রাষ্ট্রনীতিপ্রচারকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে সেইরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানকরী পর্য্যটক চিকিৎসকের আবশ্যকতা দিন দিন বুঝিতে পারিতেছি। পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ নিস্বার্থ ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য চিকিৎসকগণের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে অনেক সদনুষ্ঠানের উদযাপন হইতে পারিবে—বিদ্যালয়গৃহে আশার সঞ্চার হইবে—পল্লীবাসীর হৃদয়ে নির্ভীকতা আসিবে—শিল্পকারখানার কুলী-মজুরের চিত্ত হইতে অবসাদ দূরীভূত হইবে। স্বদেশসেবকগণ সমাজ-হিতের এই দিকটা পরিপূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হউন—চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অনন্যকর্ম্মারূপে জীবন উৎসর্গ করুন। সকল বিষয়েই উন্নতির গতি দ্রুত হইতে থাকিবে।

আমরা এই উপলক্ষ্যে একখানি পুস্তিকার উল্লেখ করিতেছি। তাহা আমাদের আপামর জনসাধারণের অবশ্যপাঠ্য। আর যাঁহারা লেখাপড়া করিতে জানেন না, তাঁহাদিগকেও এই পুস্তিকার সারমর্ম শুনান অবশ্য কর্ত্তব্য। পৌষ মাসের "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রিকায় বঙ্গদেশের জলের বিষয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখিত হইল—জলের সহিত শরীরের সম্বন্ধ, বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পানীয় জলের অবস্থা, কতপ্রকারে মনুষ্য কর্ত্তৃক জল দূষিত হয়, জলবিশোধন, দূষিতজল সম্বন্ধে কি প্রকারে সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে, পানীয় জলের ব্যবহার ইত্যাদি।

আমরা ইচ্ছা করি, এইরূপ পুস্তিকা আমাদের ধনিসমাজ কর্ত্তৃক বিনামূল্যে পল্লীতে পল্লীতে বিতরিত হউক। সমাজসেবকগণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট কাজের কথাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করুন।

বিহারে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন

এবার নবগঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী—মগধ সাম্রাজ্যের পাটলিপুত্র—আধুনিক বাঁকিপুর নগরে ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলন—কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। কংগ্রেস এইরূপে একে একে সাতাইস বৎসর কর্ম্ম করিলেন। আমাদের মনে অনেক কথা উঠিয়াছে—কংগ্রেসের সার্থকতা, কর্ম্মপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আমরা সময়ে সময়ে আলোচনা করিব।

এবারকার সম্মিলনে কোন প্রদেশ হইতেই বেশী প্রতিনিধি আসেন নাই। সর্ব্বসমেত দুইশতেরও কম ডেলিগেট সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিগত বর্ষে কলিকাতার অধিবেশনে পাঁচ শতেরও কম সভ্য আসিয়াছিলেন। কিছুকাল হইতে কংগ্রেসের প্রধান প্রধান ধুরন্ধরেরা কংগ্রেসের প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার হ্রাস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। এবার তাঁহাদের অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ভয় হইয়াছে, আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই বা কংগ্রেস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন! কংগ্রেসের তিরোভাব হইলে, আর কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা আবশ্যক কি না, সেই বিষয়ে ছোটখাট পরামর্শ-সম্মিলনও হইয়া গিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় কথা। কংগ্রেসকে রক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজন। যাঁহারা কিছুকাল হইতে বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা আবার যোগদান করুন এবং নূতন জীবন অর্পণ করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। এই প্রতিষ্ঠানটি তিন দিনের গল্পগুজবের স্থান বটে, কিন্তু ইহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।

এবারকার কংগ্রেস সম্বন্ধে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রথমতঃ, বিহারপ্রদেশবাসিগণ একটা বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করিলেন। বিহারীরা যথাসম্ভব বিহারপ্রদেশবাসী বাঙ্গালীর সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুবন্দোবস্তে, সুচারু কর্ম্ম-পরিচালনায় সকল ডেলিগেটই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই। সকল বিষয়েই তাঁহারা কর্ম্ম-কুশলতা, পারিপাট্য এবং শৃঙ্খলা-বিধান-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিহার প্রদেশের বহুসংখ্যক লোকই দর্শকভাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। বিহারী মহিলাসমাজেও সাড়া পড়িয়াছিল; অনেক ভদ্রমহিলা কংগ্রেসের কার্য্য-পরিচালনা দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বিহারপ্রদেশে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের বীজ ভালভাবে উপ্ত হইল, বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই সুযোগে যে নূতন শক্তিপুঞ্জের সৃষ্টি হইল, বিহারের জন-নায়কগণ তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে অল্পকালের মধ্যে বিহার-প্রদেশ ভারতবর্ষের একটি সুপটু কর্ম্মক্ষম অঙ্গে পরিণত হইতে পারিবে। কংগ্রেসের এই অধিবেশন বিহারপ্রদেশের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিহারিগণের রাজনৈতিক শিক্ষা, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনগঠন ইহার দ্বারা যথেষ্ট সাধিত হইবে, আশা করি। বিহারবাসিগণ এজন্য যে অর্থব্যয় ও ত্যাগস্বীকার করিলেন, তাহা ব্যর্থ হইবে না। সমগ্র ভারতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পাইবার জন্য যে সাধনা আবশ্যক, এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা তাহার সূত্রপাত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের আহ্বানকারিগণের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৌলবি মজউল হক মহোদয় একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে মুসলমানগণের প্রতি হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইবার অনেক

উপদেশ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, অনেক কারণে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস হিন্দু ও মুসলমানের মিলন অবশ্যম্ভাবী। এই বক্তৃতায় অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। হিন্দু ও মুসলমানের ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে মহোদয় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইয়া নিজ চোখে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই সমুদয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় হইয়াছিল, এজন্য ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলী উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত লাজপত রায় মহোদয়গণ যথাক্রমে হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় গোখ্‌লে মহাশয়ের বক্তৃতার সার মর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা যে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, তাহার হৃদয়-বিদারক কাহিনী প্রদীপ্ত ভাষায় যখন বিবৃত হইতেছিল, তখন সমবেত শ্রোতারা দুঃখে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমুদয় বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কর্ত্তব্য-নির্ণয়, সমাজ-সেবা, কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। অন্য কোন ফল না হইলেও কেবল এই জন্যই এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন সার্থক হইয়াছে।

চতুর্থতঃ এবারকার কংগ্রেসে বাঙ্গালীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলার" ব্যবহার অত্যধিক হইয়াছিল। সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভাষা-ভাষীর ও বঙ্গদেশের মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। একা সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া বাঙ্গালী

আর কতদিন বড়াই করিবে? রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে, কংগ্রেসের আসরে, ভারতীয় জীবনপ্রবাহের মধ্যে বাঙ্গালী যে ক্রমশঃ নিম্ন স্থানে আসিয়া পড়িতেছে—বক্তারা, ধুরন্ধরেরা, কাউন্সিলের মেম্বরগণ, রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ তাহা কি বুঝিতেছেন না? ভারতীয় রাষ্ট্রগঠনব্যাপারে বাঙ্গালীর দান কি ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসিবে?

পঞ্চমতঃ, এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশনে সঙ্গীতাদির কোন ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দীভাষাভাষিগণের পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা। হিন্দী-সাহিত্যে কি জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় না? আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিব না। অধিকন্তু, বিহারে বহু বাঙ্গালীর বাস, বাঙ্গালা গানই বা গীত হইল না কেন? বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে যত জিনিষ দান করিয়াছে, তাহার মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত একটা প্রধান সামগ্রী। বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর 'বন্দে মাতরং' সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে। বাঁকিপুরের কংগ্রেসেও অনেকবার "বন্দে মাতরং" ধ্বনি সভামণ্ডপকে মুখরিত করিয়াছিল। তথাপি তিন দিনের মধ্যে একবারও কি হিন্দী, কি বাঙ্গালা কোন সঙ্গীতের ব্যবস্থা না করিয়া অনুষ্ঠাতারা একটা প্রধান অঙ্গহানি ঘটাইয়াছেন। বিহারপ্রদেশের স্বাতন্ত্র্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, আমরা বিহারীগণকে একটি সুদক্ষ জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিতে দেখিতে ইচ্ছা করি—সুতরাং তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক নীতির আমরা সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা উদারতা, কৃতজ্ঞতা, চরিত্রের মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্যবোধ এবং বিশাল জাতীয় জীবনের উপযোগী প্রশস্ত হৃদয়বত্তা ত্যাগ করিবেন—এরূপ ইচ্ছা করি না। অনেক বিষয়ে বিহারপ্রদেশবাসী বাঙ্গালীর সাহচর্য্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা বিহারীগণের কর্ত্তব্য ছিল।

———

ঢাকায় সাহিত্য-পরিষৎ

আমাদের মনে হয়, সমাজের শক্তি কোন এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় এখনও আসে নাই। বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানগুলিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার ইহা সময় নয়। এখন নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে শক্তি-বিকীরণের যুগ। কোনও এক কর্ম্মকেন্দ্রকে বিশেষ প্রতাপশালী দেখিয়া আমরা উৎসাহিত হই না। আমরা সমাজের বিচিত্র কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে জাতীয় জীবনের উৎস দেখিতে চাই। এজন্য আমরা সকল বিষয়ে বৈচিত্র্য, পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী।

সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে একটি সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা এই সমিতির মঙ্গল কামনা করি। রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষৎ, রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, মালদহের জাতীয়-শিক্ষাসমিতি বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া ইতিমধ্যেই তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক্ অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণিত করিয়াছেন। ঢাকার পরিষৎ হইতেও আমরা এইরূপ ফল আশা করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস—ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ পাইয়া অনেকে মাথা তুলিতে পারিবেন। চরিত্র-গঠন ও যশোলাভের সুবিধা সুবিস্তৃত দেখিয়া অনেকে বিলাস ত্যাগ করিবেন, অনেকে দাতা হইবেন, অনেকে সৎসাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করিবেন। অচিরেই পূর্ব্ববঙ্গে সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় জাগরণের লক্ষণগুলি দেখা দিবে।

আমরা ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎকে একটা কার্য্য করিতে বলি। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতি বৎসর উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া সেই প্রান্তের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগাইয়াছেন। দেশের ইতিবৃত্ত, পল্লীকাহিনী, প্রবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আপামর জনসাধারণের শিক্ষা হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে অনেক নূতন কথা, নূতন দৃশ্য, নূতন কর্ম্মী, নূতন কবি বাঙ্গালার চিন্তা-ক্ষেত্রে স্থান পাইবে। ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে অবিলম্বে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য মনে করি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

আমরা গৃহস্থ; পাঁচজন আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালন করা আমাদের ধর্ম্ম; পাড়া-প্রতিবাসীর দুঃখে আমাদিগকে দুঃখী হইতে হয়, সুখে আমাদিগকে সুখী হইতে হয়। দুই চারি জন পরের কথা না ভাবিয়া আমরা দিন কাটাইতে পারি না।

আজকাল রেলগাড়ী ও কলের জাহাজ হইয়াছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত লোক দূরবিদেশে যাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সংবাদ গ্রহণ করা আমাদের গৃহস্থালীর ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। তাঁহাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা না রাখিতে পারিলে লোক-সমাজে আমাদের মুখ দেখান কঠিন। গৃহস্থের পক্ষে, হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিন্দাজনক আর কিছুই হইতে পারে না।

ভারত-বাসিগণ পূর্ব্ব কালে বহু দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন। সেই সকল স্থানে তাঁহাদের দেবালয় নির্ম্মিত হইত, আচার্য্য-কুল প্রতিষ্ঠিত হইত, অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত। অধ্যাপক রাধাকুমুদ প্রমাণ করিয়াছেন—এইরূপে চীনে, জাপানে, যবদ্বীপে, দক্ষিণ-আফ্রিকায়, মাডাগাস্কারদ্বীপে হিন্দুপল্লী, হিন্দুটোলা, হিন্দুনগর, হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত। সে অনেক দিনের কথা।

আজকালও আমরা ভারতবর্ষের বাহিরে যাই, বিদেশে গিয়া বাস করি। কিন্তু এখনকার দৃশ্য—আমাদের বিদেশবাসী বন্ধুগণের অবস্থা আর এক রকমের। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

আধুনিক কালে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান দক্ষিণ-আফ্রিকায় কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন, এবার তাহারই একটি চিত্র প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহারা আমাদেরই নিজের লোক। আমাদেরই ভাষায় কথা কহেন। আমাদের ধর্ম্মেই তাঁহাদেরও সান্ত্বনা লাভ হয়। আমাদের আদর্শেই তাঁহারা জীবন গঠন করেন। সুতরাং তাঁহারা ভারতবর্ষের বাহিরে থাকিয়া একটি বৃহত্তর ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার যে অংশের কথা বলিতেছি, তাহা ইংরেজ-জাতির রাজ্য-ভুক্ত। সুতরাং ভারতবর্ষের ন্যায় আফ্রিকার সে অংশটুকু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের একটি ভাগ মাত্র। এই রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আদিম আফ্রিকাবাসী। এই আদিম সমাজের মধ্যে দুইটি নূতন জাতি যাইয়া বাস করিতেছে। প্রথমতঃ ভিন্ন ইউরোপীয় জাতি-সমূহ। তাহাদের লোকসংখ্যা ১২॥০ লক্ষ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের লোক, তাহাদের সংখ্যা ১॥০ লক্ষ মাত্র।

আমাদের দেশের লোকেরা কি জন্য সেখানে গিয়াছেন? সেখানে তাঁহারা কি করিয়া খান? প্রায় অধিকাংশ লোকই সেখানকার ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণের কুলী ও মজুর ভাবে গিয়াছেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মহাজনগণের সহিত আইন-অনুসারে একটি চুক্তি করিতে হইয়াছিল। সেই চুক্তির মর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবার পরও তাঁহারা সেখানে বাস করিতেছেন, ক্রমশঃ তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণের সংখ্যা বাড়িয়া আসিয়াছে। এই দাসখতে লেখা কুলী-মজুর ছাড়া আর এক শ্রেণীর ভারতবাসী সেখানে আছেন। তাঁহারা ব্যবসায়-হিসাবে স্বাধীন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম এবং সামর্থ্যও অতি অল্প। তাঁহারা সামান্য রকমের ফেরিওয়ালার কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। কাহারও কাহারও ছোটখাট ব্যবসায়ও আছে। আর কিছু লোক

গৃহস্থের ঘরে ভৃত্যের কর্ম্ম করে। সুতরাং আমাদের দেশে যাহাদিগকে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোক বলা যায়, সেই শ্রেণীর লোক সেখানে নাই বলিলেই চলে।

আমাদের এই আত্মীয়দিগের জন্য আমরা বিশেষ কিছু করিয়াছি মনে হয় না। আমাদের ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের আলোক-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন—এরূপ শুনা যায় না। ইঁহাদের মধ্যে বাস করিয়া আমাদের সমাজ-সেবকেরা বিদ্যা দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—সে সংবাদও পাই না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা এই বৃহত্তর ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দের দুঃখ-দারিদ্র্য নিবারণের আয়োজন করিতেছেন—তাহাও কখন জানি না। বিশেষ পরিতাপের বিষয় বটে। অতিদুঃখের সহিতই বলিতে হয় যে, আমরা ইঁহাদের কোন সংবাদই রাখি না। ইঁহারা যে আমাদেরই সমাজের অঙ্গ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের জন-নায়ক গোখলে মহাশয় দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া আমাদের স্বধর্ম্মিগণের, স্বজাতীয়দিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী হইতেই আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিলাম—এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাদিগের অভাব বুঝিবার কোন চেষ্টাই করি নাই।

তাঁহাদের অভাব কি কি? কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে? সকল কথা লিখিতে গেলে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভারত-বর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে লেখকগণের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। আমাদের দেশে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের চোখ ফুটাইবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

যাহা হউক, এবার আমরা তাঁহাদের দুর্দ্দশার একটা যৎসামান্য পরিচয় দিতেছি। তাঁহারা আকাশের চাঁদ ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহাদের সংগ্রাম—সামান্য ভাবে মানুষের মত জীবন ধারণ করিবার জন্য। মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া—গো-মেষ হইতে পৃথক্ অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া তাঁহারা বাঁচিতে চাহেন, আর কিছু চাহেন না। বড় বড় চাকুরী, সম্মানসূচক উপাধি বা উচ্চ অঙ্গের রাজনৈতিক অধিকার পাইবার জন্য তাঁহারা লালায়িত নহেন। নিম্নের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে তাঁহারা কি অমানুষিক কষ্ট ভোগ করিতেছেন—তাঁহাদের জন্য আমাদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে।

(১) ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদিগকে লাইসেন্স লইতে হয়। এই অধিকার প্রতি বৎসর নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কোন লোকের অন্নসংস্থান এক বৎসরের বেশী সুনিশ্চিত থাকিতে পারে না। পর বৎসর পুরাতন ব্যবসায় বা কাজকর্ম্ম চালাইবার অধিকার নূতন ভাবে দেওয়া না হইতেও পারে। অনেক স্থলেই দেওয়া হয় না। যে সকল কর্ম্মচারী এই অধিকার প্রদানের জন্য দায়ী, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণের পরিচিত প্রিয়জন। কাজেই প্রতিযোগিতার ভয়ে অনেক সময়ে ব্যবসায়ের অধিকার ভারতীয় লোকেরা পা'ন না।

(২) যেখানে সোণার খনি বাহির হইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে ভারতবাসীদিগের সহরের মধ্যে বাস করিবার অধিকার নাই। সেই জনপদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তাহার মধ্যে সকলকে থাকিতে হয়। সুতরাং ব্যবসায় এবং কাজকর্ম্ম করিবার অধিকার পাইলেও সেই সকল অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ ঘটে না। সোণার খনি যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই আমাদের দেশীয় লোকদিগের দুরবস্থা শোচনীয় হইতে চলিয়াছে।

(৩) কোন কোন প্রদেশে আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা জমি-জমা করিতে পান না। স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবার ভারতবাসিগণের কোন অধিকার নাই।

(৪) লেখা-পড়া শিখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কয়েকটি খৃষ্টপ্রচারক-সমিতির সাহায্যে কতিপয় প্রাথমিক পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে মাত্র। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কোনরূপ শিক্ষালাভের কিছুমাত্র আয়োজন নাই।

(৫) যাঁহারা আইন অনুসারে দাস-খত লিখিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাহার পর যাঁহারা সেখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে জন প্রতি বাৎসরিক ৪৫৲ টাকা খাজনা দিতে হয়। যোল বৎসরের বেশী পুরুষমাত্রেই, এবং তের বৎসরের বেশী স্ত্রীলোকমাত্রেই এই কর দিতে বাধ্য। যিনি না দিতে পারিবেন—স্ত্রীলোকই হউন বা পুরুষই হউন—তাঁহাকেই সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মনে করুন—একটি পরিবারে পিতা-মাতা আর দুইটি কন্যা সর্ব্বসমেত চারিজন লোক আছেন। এক কন্যার বয়স তের বৎসর, অপরটির বয়স পনের বৎসর। দক্ষিণ আফ্রিকায় কেবল মাত্র বাস করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে বৎসরে ১৮০৲ টাকা দিতে হইবে। সমস্ত পরিবার মিলিত হইয়া মাসিক ৩০৲ টাকার বেশী রোজগার করিতে পারেন না। অতএব তাঁহাদের বার্ষিক আয় ৩৬০৲ টাকা। তন্মধ্যে কেবল সেই দেশে থাকিবার ভাড়াই ১৮০৲ টাকা। এই অবস্থায় পড়িলে আমাদের দেশে যাঁহারা আছেন তাঁহারা কিরূপে জীবন যাপন করিবেন, আর বুঝাইতে হইবে কি? চুরি, বাটপাড়ি, বেশ্যাবৃত্তি সমাজে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিবে—তাহাও সুনিশ্চিত। অভাবে ত স্বভাব নষ্ট হইবেই। ভারতবাসীর কলঙ্ক—

হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মনাশ, চরিত্র-হানি—এই সকল নৈতিক অবনতির জন্য মুখ্যত সেই ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণই দায়ী। কারণ তাঁহাদের সেবা করিবার জন্যই এদেশ হইতে লোক লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের কর্ম্ম শেষ করিয়া এই সকল লোককে সেখানে থাকিতে হইতেছে এবং সেখানে থাকিবার জন্যই এই সমুদয় অনর্থ ঘটিতেছে।

(৬) দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ-লাভের নিয়ম। নূতন কোন ভারতবাসী কয়েক প্রদেশে প্রবেশ করিতেই পান না। আর কয়েকটি প্রদেশে প্রবেশের অধিকার আছে বটে, কিন্তু বহু কষ্টে। কোন একটি ইউরোপীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে প্রবেশ-নিষেধ—'পত্রপাঠ বিদায়'।

(৭) যাঁহারা বহুকাল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা যদি কখনও মাতৃভূমি ভারতবর্ষে আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের এক কঠিন আইন মানিয়া চলিতে হয়। তাঁহাকে অনুমতি লইতে হইবে। তাহাতে কত দিনের মধ্যে ফিরিবেন সে কথা ভাল করিয়া লেখা থাকিবে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে দিন-ক্ষণ মিলাইয়া লওয়া হইবে। এক আধঘণ্টা দেরী হইলে সেই সার্টিফিকেট পচিয়া যাইবে। তিনি আর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসায়, কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতে হইবে। এইরূপে কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার হিসাব নাই। একটি দৃষ্টান্তে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে। এক ব্যক্তি এক বৎসরের 'পাশ' লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার স্ত্রী সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া পৌঁছিবার হিসাব করিয়া তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু হঠাৎ ঝড় হওয়ায় জাহাজ

আসিতে একদিন দেরী হইল। তিনি আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না—স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন!

(৮) এতদ্ব্যতীত, ভারতবাসিগণ বহুবিধ সামাজিক অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ট্রামে চড়িতে পান না, রাস্তার ফুটপাথে চলিতে পান না, ইত্যাদি।

কলিকাতায় আর্য্যসমাজ

সম্প্রতি কলিকাতায় আর্য্যসমাজের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে চাহেন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি তাঁহারা এখানে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন :— (১) হিন্দুসাহিত্য-প্রচার (২) উচ্চশিক্ষিতসমাজে নাগরী-অক্ষর-প্রচলন, (৩) হিন্দীভাষা-প্রবর্ত্তন, (৪) নিম্নশ্রেণীর উত্তোলন ও শুদ্ধীকরণ। ইঁহারা বৈদিক যুগের জপ-হোমাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির বিরোধী। তথাপি উভয় পক্ষের মধ্যে উদারতা ও সরলতা থাকিলে হিন্দুগণ আর্য্যসমাজকে সহযোগিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। আশা করি, বঙ্গদেশে আর্য্যসমাজের সঙ্গে সনাতন হিন্দুসমাজের সৌহার্দ্দ্য থাকিবে, এবং ইঁহাদিগের সঙ্গে এক যোগে বাঙ্গালীরা অনেক বিষয়ে কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

আর্য্যসমাজ পঞ্জাবে যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে। নানা স্থানে নানা ভাবে বঙ্গসমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। সুতরাং আর্য্যসমাজের আগমনে কোন বিষয়ে বিরোধ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। বরং বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন কর্ম্মীর আবির্ভাব হইবে। তাহার ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন কথঞ্চিৎ বৈচিত্র্য ও সম্পদ লাভ করিবে এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে এক ভাব, এক আদর্শ, এক চিন্তা, এক কর্ম্ম প্রচারিত হইবার সুযোগ সৃষ্ট হইবে।

———

বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা

আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালী-সমাজে স্বাধীনভাবে জীবিকা-উপার্জ্জনের ইচ্ছা বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীরা অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে কম চাহিতেছেন। আশার কথা বটে, কিন্তু এ বিষয়ে অনেকের বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কোন স্থায়ী উপকার হইল কি না, আজকাল এ সম্বন্ধে যেন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অধিকন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীর এই স্বদেশী প্রচেষ্টা লইয়া সকলে ঠাট্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস বাঙ্গালায় এ কয় বৎসর শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি কথা-কাটাকাটি মাত্র হইয়াছে—কাজ কিছুই হয় নাই। বাঙ্গালীর মধ্যেও অনেকে এইরূপ বুঝিয়া আত্মগ্লানি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পরিতাপের বিষয় কি না—নৈরাশ্যের কারণ আছে কি না—একবার হিসাব নিকাশ করা আবশ্যক। ব্যাপারটা একটুকু তলাইয়া দেখা যাউক।

প্রথমেই সকলকে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। বঙ্গদেশে ১০০।১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শিল্প ছিল, ব্যবসায় ছিল—কৃষি ত ছিলেই। তাহার সাহায্যে বাঙ্গালী নিজেদের সকল অভাব স্বদেশের পণ্যেই মোচন করিতেন। এ সব ইতিহাসের কথা বটে—কিন্তু বেশী পুরাতন খবর নহে। জাতীয় সম্পদের পরিচয়, আর্থিক স্বচ্ছলতার বিবরণ, লাভ করিবার জন্য বেশী কষ্ট করিতে হয় না। পরে সেই বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্যের ধারা কিছু কাল ক্ষীণ হইয়াছিল। ধনাগমের উপায়গুলি ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। উচ্চশিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, ব্যবসায়, মহাজনী, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রতি আদর কমিয়াছিল।

প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে ৺ বীরেশ্বর পাঁড়ে 'মানব-তত্ত্ব'নামক একখানি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের প্রতি বাঙ্গালীর অশ্রদ্ধার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ—"যখন য়ুরোপীয়েরা এদেশে আসিলেন, তখন তাঁহাদিগের শান্ত মূর্ত্তি ও কার্য্যশক্তি দেখিয়া বঙ্গবাসিগণ তাঁহাদিগের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয়গণও বঙ্গবাসীর প্রতি বিলক্ষণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সে সময়ে যাঁহারা য়ুরোপীয়দিগের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা বিলক্ষণ সুখী ও ধনশালীও হইতেন। * * * বিশেষতঃ ঐ দাসত্ব লাভের জন্য বিশেষ বিদ্যারও আবশ্যক ছিল না। ইংরাজি ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলেই লোকে ঐ কার্য্য প্রাপ্ত হইত। * * * য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা নাই, সুতরাং তাঁহারা ভারতীয়গণকে জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের অধীনে কার্য্য করিতে দিতেন। তদ্দৃষ্টে ভারতীয় সকল জাতিই তাঁহাদের দাসত্ব আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায় সকলেই আপন আপন পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-প্রার্থী হইল। ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচারিত হইল, তাহাও ঐ কার্য্যের সহায় হইয়া উঠিল। অর্থাৎ যিনি বিদ্যা শিখিবেন তিনি একই নিয়মে কয়েকখানি ইংরাজি সাহিত্য, কিছু ভূগোল, কিছু ইতিহাস, ও কিছু গণিত শিক্ষা করিয়া দাসত্বের উপযোগী পরীক্ষা দিয়া দাসত্ব আরম্ভ করিতে লাগিলেন। দাসত্ব-লাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, অর্থাৎ দাসত্ব-প্রাপ্তি হইলেই শিক্ষার সফলতা সম্পাদিত হয়, এই সাধারণ বিশ্বাস বঙ্গবাসীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই শিল্প-বাণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ঐ উপায়ে দাসত্বলাভের চেষ্টায় রত হইল।"

আজকাল আবার যে শিল্প ও ব্যবসায়ে আগ্রহ দেখা যাইতেছে—তাহা নূতন যুগের কথা, নূতন ভাবের পরিচয়। আমরা নূতন উপায়ে "কেঁচে গণ্ডুষ করিয়া" শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকর্ম্মে মন দিয়াছি। প্রাচীন ব্যবসায় বা শিল্পের অনুষ্ঠান হইতে আমরা কোন সাহায্যই পাই নাই। বুনিয়াদি ঘরের লোকেরা যে ভাবে কাজ-কর্ম্ম চালাইয়া থাকেন, আমরা সে ভাবে চালাইতে পারি নাই। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন তহবিল রাখিয়া যান নাই, তাঁহারা নূতন প্রণালীতে নূতন ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

দুঃখের কথাই হউক, আর সুখের কথাই হউক, আমরা এখন শিল্প-প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়-প্রচলন বা কৃষিকার্য্যবিষয়ক ব্যাপারসমূহে প্রাথমিক অবস্থাতেই রহিয়াছি। সকল আন্দোলনের একটা শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ় অবস্থা থাকে। আমরা এখন বৈষয়িক জীবনের শৈশবাবস্থায় আছি। ধনাগমের উপায় আবিষ্কার সম্বন্ধে, স্বাধীন অন্ন-সংস্থান বিষয়ে আমাদের এখন বর্ণ-পরিচয় ও হাতে-খড়ী হইতেছে মাত্র। সুতরাং আমাদের প্রাচীন যুগের সঙ্গে তুলনা করিয়া হতাশ যেন না হই, অথবা আধুনিক ব্যবসায়ী জাতির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যেন চম্‌কাইয়া না যাই। যাহারা বেশী দিন এই সকল ব্যাপারে লাগিয়া আছে, তাহারা ৫।৭ বৎসরে যথেষ্ট সুফল লাভ করিবে—সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে অন্যায় তুলনা করিয়া নিজকে অপদস্থ ও নিরাশ করিয়া তোলা নিষ্প্রয়োজন। এ কথাটা সর্ব্বদা যেন আমাদের মনে থাকে।

শিশুরা হাঁটিতে হাঁটিতে আছাড় খায়—কথা বলিতে বলিতে অস্পষ্ট শব্দ করে। শৈশবাবস্থায় কোন বিষয়েই স্থিরতা,-দৃঢ়তা, নিশ্চয়তা থাকে না। আমরা শিল্প ও ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি মাত্র—এ জন্য এখনও আমাদের বৈষয়িক জীবনে কোন দিকে স্থায়িত্ব নাই। কোন একটা

কার্য্যের আরম্ভকালে অনেকগুলি অসম্পূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়। বঙ্গদেশের স্বদেশী প্রচেষ্টায়ও প্রারম্ভিক দুর্ব্বলতার চিহ্ন থাকিবে—তাহা সুনিশ্চিত।

আশার কথা

আমাদের স্বাধীন-জীবিকার জন্য আন্দোলন প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে অতি সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। গত ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই এই প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির উৎসাহ ও সহানুভূতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আমাদের আন্তরিকতা পরীক্ষা করিবার অথবা কর্ম্মের ফল মাপিবার সময় এখনও আসে নাই। যাহা কিছু দেখিতেছি প্রায় সকলই আশাপ্রদ—আমরা এখনও কোন বিষয়ে সত্য সত্যই রণে ভঙ্গ দিবার অবস্থায় পৌঁছি নাই—রণে ভঙ্গ দিতে হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণও নাই। অনেক ক্ষেত্রে আমরা পরিশ্রমের অনুরূপ সুফল না পাইতে পারি, কিন্তু তথাপি ব্যবসায়ে, শিল্পে, কৃষিকর্ম্মে—সকল বিষয়েই আমরা মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া আছি।

দেশের মধ্যে—পল্লীতে সহরে বহুসংখ্যক কৃষির অনুষ্ঠান, শিল্পের কারখানা, ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি লুপ্তপ্রায় ভাবে রহিয়াছে, এবং কতকগুলি কোন উপায়ে চলিয়া যাইতেছে। স্থায়ী ফল বহুল পরিমাণে পাইতেছি না সত্য—কিন্তু স্বাধীন অন্নের ইচ্ছা ও চেষ্টা সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ন্যূনাধিক পরিমাণে আপামর জনসাধারণ অন্নসংস্থানের নূতন উপায় বাহির করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। এই অবস্থায় কেবল মাত্র কল-কারখানার গণনা করিয়া বা ফ্যাক্টরীর তালিকা প্রকাশ করিয়া, বা দৈশীয় কারবারসমূহের মূলধন-গুলি যোগ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের ওজন করা যাইবে না। আমাদের বৈষয়িক জীবনে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহা এখন সাধারণ

গজকাঠিতে মাপা অসম্ভব। এখনকার অসফলতা, দুর্ব্বলতা, অনিশ্চয়তার মধ্যে সমগ্র জাতীয় সাধনার বীজ নিঃশব্দে পরিপুষ্ট হইতেছে।

আমাদের দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য মূলধন পাওয়া যায় না বলিয়া একটা অপবাদ প্রচলিত ছিল। সে অপবাদ দূরীভূত হইয়াছে। এখন অনেকে টাকা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের সুদের বা লাভের কথাই ভাবিতেছেন। কেহ কেহ ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার জন্য বর্ত্তমানে অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কেহ কেহ বর্ত্তমান লাভ বা ভবিষ্যৎ সুবিধার কথা ভাবেন না; কেবল দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্যই স্বকীয় অর্থ জলের ন্যায় খরচ করিতেছেন—ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজে ধনাগমের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হয়, তাহা আলোচনা ও পরীক্ষা করিবার জন্য সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিতেছেন। ফলতঃ, দেশের মূলধন এখন আর অবরুদ্ধ না থাকিয়া সমাজের বিবিধ বৈষয়িক অভাব মোচনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, শিল্পের অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইতেছে।

তার পর, দেশের লোকেরা এখন কেবল উকীলী, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী বা চাকুরীকেই জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় বিবেচনা করেন না। শিক্ষিত সমাজে নূতন নূতন শিল্পশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িতেছে। জাতীয়বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই অভাব মোচন করিবার চেষ্টা হইতেছে। যাঁহারা এই সকল নূতন বিদ্যা শিখিতেছেন, তাঁহারা সকলেই যে ব্যবসায়ে বা শিল্পে নামিয়াছেন অথবা নামিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা নহে। কেহ কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং দু'দশজনকে ক্ষতিগ্রস্তও করিয়াছেন। কেহ কেহ হতাশ হইয়াছেন। অপর পক্ষে কেহ কেহ তাঁহাদের অর্জ্জিত শিল্পবিদ্যা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি সমাজে প্রচার

করিবার জন্য সেবাব্রত অবলম্বন করিতেছেন। কেহ কেহ প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের বিদ্যালাভের সুফলও দেখাইয়াছেন। অনেকে তাঁহাদের বিদ্যা অপেক্ষা যথেষ্ট কম বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বহু শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্‌যাপন করিতেছেন।

পূর্ব্বে আমরা বিদেশে যাইতাম—চাকুরী অথবা ব্যারিষ্টারীর জন্য। এখন শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। বিদেশ-প্রেরণ-সমিতি এইরূপে সমগ্র বঙ্গে যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন সাহস, নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ আনিয়া দিয়াছেন। শিল্প-শিক্ষা এবং শিল্পের আন্দোলন সকল বঙ্গবাসীরই চিন্তার প্রধান বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ, কেবল বিদেশ হইতে প্রত্যাগত যুবকগণের হিসাব করিলে এই নব অভ্যুদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। কারণ শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশ-গমনের আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালী সমাজের নিভৃততম স্থান পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং দুই দশজনের অকৃতকার্য্যতায় বা চরিত্রহীনতায় এই আন্দোলন স্থগিত হইয়া যাইবে না। ভাবুকতাময় বাঙ্গালী যুবক নিন্দা, অপমান, দুঃখ-কষ্ট, অনাহার, অর্থাভাব সকল বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিতে শিখিতেছেন, এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ, শান্তি ও অর্থ-সচ্ছলতা প্রদানের নিমিত্ত দূরবিদেশে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন। এই ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে।

তারপর আমাদের সাহিত্যের কথা। বঙ্গসাহিত্য এখন আর গোয়েন্দাকাহিনী ও নাটক-নভেলে পরিপূর্ণ নয়। চিন্তাশীল ও বিদ্বান্ লেখকেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন। কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি সকল বিষয়ে উপযুক্ত লোকেরা সারগর্ভ প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কৃষিজীবী, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের

সুবিধার জন্য সুশিক্ষিত বিজ্ঞানাভিজ্ঞ জননায়কেরা মাতৃভাষায় তাঁহাদের বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি হইতেছে, আমাদের মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচিত হইতেছে, এবং কলকারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ে দেশীয় লোকের মধ্যে সহজে শিক্ষা প্রচার হইতেছে। বিদেশ হইতে যাঁহারা শিখিয়াছেন, তাঁহারা দেশের সকলকে যথাসম্ভব সোজা কথায় বিজ্ঞানের উপদেশগুলি শিখাইতেছেন। সুতরাং শিল্প-ও-ব্যবসায়-শিক্ষা জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়া দেশের মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়া যাইতেছে। এই উপায়ে ধনাগমের নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইতেছে—বৈষয়িক আন্দোলন সমাজে বদ্ধমূল হইতেছে।

সুতরাং বলিতে হইবে—আমরা আমাদের শৈশবাবস্থার কর্ত্তব্য সকল দিক হইতেই পালন করিতেছি। শিল্পের আয়োজন, ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত্র—সকল বিষয়েই কর্ম্ম করা হইতেছে। ধনিগণ ব্যক্তিগত ভাবে অথবা যৌথকারবারের জন্য সমবেত ভাবে বৈষয়িক আন্দোলনের সহায় হইবার জন্য অর্থব্যয় করিতেছেন। জনসাধারণও অর্থ সঞ্চয় করিয়া যৌথকারবার খুলিতেছেন। ব্যবসায়ের ধুরন্ধর এবং শিল্পবিৎ পণ্ডিতগণ স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় শিখিবার জন্য যুবকেরা দেশে ও বিদেশে চেষ্টা করিতে-ছেন। সুধীগণ তাঁহাদের বিদ্যা মাতৃভাষায় প্রচার করিতেছেন।

কোনও একটা ফ্যাক্টরী বা একটা আন্দোলন বা একজন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া এখন বঙ্গীয় বৈষয়িক আন্দোলনের প্রকৃত শক্তির পরিমাণ পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গালা দেশের জলবায়ুর সঙ্গে স্বাধীন অন্নের প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা মিশিয়া রহিয়াছে।

যাঁহারা কোনও এক স্থানের উল্লেখ করিয়া আমাদের অকৃতকার্য্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহারা হয় হিংসা বা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ওরূপ বলিয়া থাকেন। অথবা তাঁহারা আমাদের অবস্থার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে অসমর্থ।

আমরা আমাদের বৈষয়িক জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থায় আছি বটে, শৈশবোচিত দুর্ব্বলতা ও অসম্পূর্ণতা আমাদের রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা অবস্থোপযোগী ব্যবস্থা করিতেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র

ঢাকায় একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। ইহার কাগজপত্রগুলি অনেকের কাছে আসিয়াছে। আমরা এই সমুদয় পড়িয়া দেখিলাম। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় হইতেছে দেখিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দিত। কিন্তু নূতন একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার কারণ সকলেই জানিতে ইচ্ছুক। আমরাও এই কারণগুলি বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ ত্রুটি দূর করিবার সঙ্কল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে বিশেষ পারদর্শী হইবে কি? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ দেশের ধনবৃদ্ধির নূতন নূতন উপায় বাহির করিতে পারিবেন কি? এই প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-তালিকা পড়িয়া এ সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারিলাম না। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হইবে বলিয়া বোধ হইল না। সুতরাং অন্নচিন্তা সম্বন্ধে 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং'। এতদ্ব্যতীত, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন হইবে কি? আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকে সকল দিক হইতে পুষ্ট করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ঢাকায় বিশেষ ভাবে করা হইবে কি? মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া না

তুলিতে পারিলে আমাদের সমাজে শিক্ষাবিস্তার সুচারুরূপে হইতে পারিবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু করিবেন বলিয়া মনে হইল না।

তাহার উপর, সমাজের কথা। বাঙ্গালীর সামাজিক ও জাতিগত অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্বন্ধ কিরূপ থাকিবে? দেশের যাবতীয় কর্ম্মরাশির প্রভাব ছাত্রগণের জীবনে লক্ষিত হইবে কি? আমাদের বিশ্বাস, এই ছাত্রেরা দেশের সমাজ হইতে ক্রমশঃ বহু দূরে সরিয়া আসিবে। তাহা হইলে চরিত্রগঠন কি উপায়ে হইবে? তাহাতে নৈতিক অধোগতি ঘটিবারই আশঙ্কা।

একেবারে কোন উপকার হইল না—এ কথা বলা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের শারীরিক উৎকর্ষ বিশেষভাবে সাধিত হইত না। ঢাকায় তাহার প্রতি যত্ন থাকিবে বুঝা যাইতেছে। তাহা ছাড়া অনেকগুলি টাকা বাঙ্গালাদেশের এক স্থানে বিদ্যাবিস্তারের জন্য খরচ হইবে। কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিত বিদেশ হইতে আমদানী করা হইবে। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থ সাহায্য করা হইবে। প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে—বড় বড় বিজ্ঞানশালা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অতএব পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে দেখিবার ও কৌতূহল বাড়াইবার একটা জিনিষ সৃষ্ট হইল। ইহাই প্রধান লাভ। কিন্তু পড়াইবার, শিখাইবার বা মানুষ করিবার কোন উন্নত প্রণালী অবলম্বিত হইল—এরূপ বুঝা গেল না। প্রাচীন (অর্থাৎ কলিকাতার) রীতিতেই বই বাছাই, অধ্যাপক নিয়োগ, শিক্ষণীয়বিষয়-নির্ব্বাচন, পাঠপ্রণালী—প্রায় সকল কর্ম্মই চলিতে থাকিবে। প্রকৃত শিক্ষাসংস্কারের কোন লক্ষণ দেখিলাম না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রগুলির মধ্যে কেবল একটা নূতন শব্দের প্রয়োগ বেশী দেখিতে পাইলাম। সে "রেসিডেন্‌শ্যাল" বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা কি পদার্থ ভারতবর্ষের লোকে জানেই না। সুতরাং কেহ ইহাকে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া চালাইতেছেন। কেহ ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান-প্রণালীর চরম কথা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। কেহ ইহাকে প্রাচীন হিন্দুসমাজের গুরুগৃহেরই আধুনিক সংস্করণ ভাবে দেশীয় লোকের মনস্তুষ্টি করিতেছেন। ফলতঃ সাধারণে বুঝিতেছে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিদ্যাদান-রীতির অপূর্ব্ব সম্মিলন ঢাকার এই রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হইল।

আমরা মনে করি, এত সহজে বিষয়টা বুঝিলে চলিবে না। ইহার বিশদ আলোচনা আমরা পরে করিব। এবার কয়েক জন দেশীয় বিজ্ঞ লোকের মত প্রদান করিতেছি। আমাদের দেশে ছাত্রেরা গৃহস্থের ঘরে অথবা ছোটখাট বোর্ডিংএ থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলেজে যাওয়া আসা করিবে? না, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া প্রকাণ্ড ব্যারাকে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবে? এই বিষয়ে কোন দেশেই শেষ সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবর্ষেও ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই।

আষাঢ় মাসের প্রবাসী পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে যে, ছাত্রদের শিক্ষালয়-সংসৃষ্ট ছাত্রাবাসে থাকিয়া শিক্ষা করা ভাল, না নিজ পিতামাতার নিকট থাকিয়া শিক্ষা করা ভাল। আমাদের বিবেচনায় পিতামাতার নিকট থাকিয়া শিক্ষা করাই ভাল। কারণ তাহাতে ছাত্রগণ পারিবারিক কার্য্যে অভ্যস্ত হয়, পরিবারের সুখ-দুঃখের মধ্যে বর্দ্ধিত

হইয়া পরিবারে রোগীর পরিচর্য্যাদি করিয়া, পারিবারিক জীবনের সদ্গুণ লাভ করে, ও ভবিষ্যতে গার্হস্থ্যজীবন-যাপনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। অনেকে বলিবেন যে, অনেক পরিবার সুশিক্ষার আলয় নহে। ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে, ছাত্রাবাসসকলের অধ্যক্ষ ও পর্য্যবেক্ষকগণ অনেক স্থলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্নেহশীল, বিবেচক, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সচ্চরিত্র নহেন? প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষালাভের নিয়ম ছিল বটে। কিন্তু সেই গুরুগণ সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতেন, ছাত্রগণ তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া এক দিকে যেমন সংযম, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতাদিতে অভ্যস্ত হইত, অপরদিকে তেমনি পারিবারিক জীবনের স্নেহ ও মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিত। বর্ত্তমান ছাত্রাবাস গুরুগৃহও নহে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও নহে, এবং ঐ গুলির দারোগা ও প্রহরী মহাশয়েরাও প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জ্ঞানধর্ম্মান্বেষী গুরু নহেন। সুতরাং প্রাচীন কালের আশ্রম-চতুষ্টয়ের কথা এই প্রসঙ্গে না তোলাই ভাল।"

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৩১২ সনে প্রকাশিত 'শিক্ষাসমস্যা' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কয়েকটি সমীচীন কথা বলিয়াছিলেন:—"পূর্ব্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনও বিরোধ ছিল না।" * * *

"বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে, তাহা মনোহর নয়, তাহা বারিক্, পাগলা গারদ, হাঁসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।" "দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে

যে বিচ্ছেদ, এমন কি, বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায়, ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতা-সম্পর্কশূন্য একটা গুরুপাক আবষ্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।”

শিক্ষাবিজ্ঞানপ্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ মহাশয়ের “শিক্ষাসমালোচনা” গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :— “ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ বটে, কিন্তু ছাত্র ত কেবল এক আলমারি বই নয়! ছাত্রেরা কেবল ছেলে নয়, তাহারা মানুষ। অতএব বাল্যকালের কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে মনুষোচিত কার্য্যও করিতে হইবে।” * * * “পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে ছাত্রকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। তাহার ফলে ব্রহ্মচারীরা কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা নৈয়ায়িক হইয়া বাহির হইতেন না। সেখানে সংযম, শৌচ, কর্ত্তব্যপালন ও কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষোচিত গুণ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিত। গুরুগৃহের হাওয়াতেই অহঙ্কার-নাশ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান বীজ থাকিত। আমাদের আজকালকার অবস্থায়ও ছাত্রদিগের জন্য এই সংযম-পালন ও পরার্থে জীবন-যাপনের সুবিধা করিয়া না দিতে পারিলে বিদ্যাশিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হইবে না। * * মানুষকে ভবিষ্যতে সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মবিষয়ক, আর্থিক ইত্যাদি যতপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে—ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেকটিরই সাধনা হইলে শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে।” এই বিষয় অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার ‘শিক্ষানুশাসনে’র দশমসূত্রে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন :—“শিক্ষার্থীকে সমগ্র জগৎই তাহার শিক্ষালয় বিবেচনা করাইতে হইবে। এই নিমিত্ত ভ্রমণ, ব্যায়াম, কষ্টস্বীকার, আরাম,

কথোপকথন, পরোপকার, উৎসব, সমাজসেবা, ধর্ম্মকর্ম্ম, অধ্যাপনা, শিক্ষাবিস্তার, সঙ্গীত, সাহিত্যপ্রচার প্রভৃতি সকল কর্ম্ম করিবার জন্য শিক্ষার্থীর সুযোগ যথাসম্ভব সৃষ্টি করিয়া দিতে হইবে। কোনও বিদ্যালয়গৃহের অথবা বিজ্ঞানশালার চতুঃসীমার মধ্যে শিক্ষার্থীর সাধনা যাহাতে আবদ্ধ না থাকে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

দেশপূজ্য শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থে আমাদের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন :—"স্বজনবর্গের মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর যেরূপ চিত্তের বিকাশ হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও, সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিলে স্বাতন্ত্র্য ও সংসারের সর্ব্বদিকে দেখা শুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে তাহা হয় না। সুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ কলের মত পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষের মত চলিতে শিখে কি না সন্দেহের স্থল। * * * * কেহ কেহ মনে করেন ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্ব্বদা সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্রনিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে বাসের ন্যায় ফলপ্রদ। এ কথা ঠিক নহে। কারণ প্রথমতঃ ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় সপরিবারে অবস্থিতি করেন না, এবং নিজের বা গুরুর স্বজন-পরিবৃত থাকিয়া ছাত্র যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে তাহা হইতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ পুরাকালে শিষ্য গুরুকে ভক্তি উপহার দিত ও স্নেহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও স্নেহ এই দুইমাত্র আদান-প্রদানের সামগ্রী ছিল, এবং এই দু'য়ের বিনিময়ই এক অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিত। বর্ত্তমান কালে ছাত্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তদুপযুক্ত বাসস্থান ও খাদ্য-দ্রব্যাদি পায় ও বুঝিয়া লয় বা লইবার চেষ্টা করে। এই অর্থ ও

দ্রব্যের আদান-প্রদানমূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও স্নেহের বিনিময়সম্ভূত সম্বন্ধের সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না।"

ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমাদের বিশ্বাস—ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা কম হইবে না। বরং এত ছাত্র এদিকে ঝুঁকিবে যে স্থানাভাব হইবার সম্ভাবনা। অনেক ছাত্রকে বোধ হয় নিরাশ করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা পয়সা থাকিলে আর কলিকাতায় ছেলেদিগকে পাঠাইবেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-সংখ্যা কমিবে, পশ্চিম বঙ্গের ভাল ভাল ছাত্রেরাও এবার হইতে ক্রমশঃ ঢাকায় আসিয়া জুটিবে।

দেখা যাউক, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। শিক্ষার বিস্তার হইলে সুফল ফলিয়াই থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেন উপযুক্ত গৃহস্থ হইয়া সংসার ও সমাজের ভার গ্রহণ করিতে উপযুক্ত হন।

সমাজ-সংস্কার

চারি দিকে সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতবাসী হিন্দু-সমাজের বিবিধ অনুষ্ঠানগুলিকে রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা বাঙ্গালা দেশেই এই চেষ্টার নানা আকার দেখিতে পাইতেছি। মাহিষ্য-সম্মিলন, কায়স্থ-সম্মিলন তিলি-সম্মিলন, ব্রাহ্মণ-সমাজ, সুবর্ণবণিক্-সমাজ, সর্ব্ববঙ্গ-শিক্ষাসম্মিলন প্রভৃতি বিচিত্র কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে হিন্দুর বিশেষত্ব পুষ্ট করিবার আয়োজন হইতেছে। এই সমুদয়ের মধ্যে উপবীত, অশৌচ প্রভৃতি লইয়া কোন কোনটীতে কিছু কিছু কলহের ভাব দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা সাময়িক। সকলেই হিন্দুর বর্ণাশ্রম ও হিন্দুত্বকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টিত। কেহ বৈশ্য হইতে চাহিতেছেন, কেহ ক্ষত্রিয়ের অধিকার লাভ করিতে যত্নবান্, কেহ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি—প্রাচীনধর্ম্ম ও সনাতন সমাজবন্ধনের দ্বারাই সকলে নিজ নিজ কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিবার জন্য অভিলাষী। ফলতঃ হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য আলোককে—ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে নিজস্ব করিয়া লইয়া আধুনিক জগতে স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সর্ব্বত্রই স্বদেশের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে বর্ত্তমান যুগের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস চলিতেছে। জাতীয় জাগরণের ইহাই প্রকৃত নিদর্শন—আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

মাড়োয়ারীর নিকট বাঙ্গালীর শিক্ষা

বাঙ্গালাদেশের এমন স্থান নাই যেথানে বাঙ্গালী মাড়োয়ারীর সম্পর্কে আসেন না। কলিকাতার বড়বাজার হইতে আরম্ভ করিয়া কালিম্পঙ্গের পার্ব্বত্য পল্লী পর্য্যন্ত সকল স্থানেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, মহাজন ও আড়তদারের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ পরিতাপের বিষয়—বাঙ্গালী সন্তান বি এ, এম্ এ পাশ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতেছে। কিসের জন্য? কিসে দু'পয়সা আসে তাহার উপায় আবিষ্কারের জন্য। বিলাতে, আমেরিকায়, জর্ম্মাণিতে, জাপানে আমরা আমাদের ধনবৃদ্ধির উপায়, অন্ন-সংস্থানের পন্থা শিখিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেছি। ঘরের উপর দিয়া যে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে তাহার মাহাত্ম্য বুঝি না। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের কঠোর পরিশ্রম-স্বীকার—তাঁহাদের সংযম-পালন—তাঁহাদের কথার দাম—তাঁহাদের ব্যবসায়ে সাধুতা আমাদের পল্লীতে পল্লীতে যে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছে, ব্যবসায়-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে! বাঙ্গালাদেশের মধ্যেই এতগুলি 'ধনবিজ্ঞান-শিক্ষার ল্যাবরেটারী' সজীবভাবে কাজ করিতেছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়ে না কেন?

মাড়োয়ারীরা কি কম টাকা রোজগার করেন? তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে পাগ্‌ড়ী লোটা সম্বল করিয়া গ্রামে আসিয়া বসেন সে গল্প ত বালকেরাও জানে। তাঁহারা আবার কত কম সময়ের মধ্যে প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন—কত জমিদারকে ধার দিয়া রক্ষা করেন—কোন্ অভিভাবক তাহা না জানেন?

আপনারা বলিবেন—মাড়োয়ারীরা শিক্ষিত নহেন। ধন-বিজ্ঞানের কতকগুলি ইংরাজী বইএর অর্থ আধা বুঝিয়া প্রবন্ধ লিখিবার ক্ষমতাই কি উচ্চ শিক্ষার পরিচায়ক? মানিয়া লইলাম—তাঁহারা কম ইংরাজী জানেন—কামস্কাট্কা কোথায় জানেন না—ইলেক্‌ট্রিসিটি কোন্ পদার্থ বুঝেন না। তোমরা ত এই সব যথেষ্টই বুঝিয়াছ? তাহা হইলে ৪০।৫০৲ টাকার চাকরীর জন্য বি, এ-পাশ মহাশয়গণ লালায়িত হও কেন? পরের গঞ্জনা সহ্য কর কেন? এত সব শিখিয়া নির্জ্জীব ভাবে চলা ফেরা কর কেন? ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখ কেন? সংসাহসকে হঠকারিতা মনে কর কেন? স্বাধীন কর্ম্মে পরাধীন অন্নে যে প্রভেদ, ইংরাজীতে কম অভিজ্ঞ (অতএব তোমাদের হিসাবে "অশিক্ষিত") মাড়োয়ারী আর শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুতে সেই প্রভেদ। এখন স্থির কর, কি চাও? স্বাধীন জীবন, স্বাধীন কর্ম্ম, স্বাধীন চিন্তা—না পরীক্ষায় পাশ, অর্দ্ধাশন আর দুশ্চিন্তা?

যদি পরীক্ষায় পাশ করিয়া পরিশ্রম-স্বীকারের ক্ষমতা এবং স্বাধীন ভাবে অন্ন অর্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি রক্ষা করিতে পার—হাজার হাজার পাশ করিতে থাক, দেশের কোন অনিষ্ট সাধিত হইবে না। আর যদি পরীক্ষার পাশে স্বাধীন অন্নের চিন্তা ও প্রবৃত্তি লোপ পাইয়া যায়, তাহা হইলে আর পরীক্ষা-মন্দিরের ছাপ পাইবার জন্য জীবনকে নিষ্পেষিত করিও না। যদি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ না হইতে পার, লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দাও।

উচ্চ সাহিত্য ও জনসাধারণ

দেশে সুবাতাস বহিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকের সুখ-দুঃখ আমাদের সাহিত্যসেবিগণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালার উচ্চ সাহিত্যে দরিদ্র জনসাধারণের উৎসব-আমোদের কথা স্থান পাইতেছে। কয়েক বৎসর হইল পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'চাকমা-জাতির ইতিহাস' লিখিয়া বঙ্গবাসিগণকে অনেক নূতন কথা শিখাইয়াছেন। সম্প্রতি একখানি বিরাট গ্রন্থে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় ছোট-নাগপুরের মুণ্ডা জাতিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। আমরা এই সকল গ্রন্থ কেবল মাত্র ঐতিহাসিক গবেষণা এবং লেখকগণের পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার দিক হইতেই প্রশংসা করি না। শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতেরা ক্রমশঃ সমাজের মেরুদণ্ডের দিকে তাকাইতে শিখিতেছেন—ইহাই আমাদের পরম আহ্লাদের বিষয়, আশার কথা।

ঢাকার 'প্রতিভা'র গত কয়েক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় এইরূপ আর একটী বিষয়ে জনসাধারণের প্রতি সাহিত্য-সেবিগণের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ভাটিয়ালদিগের সরল হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলি সংগ্রহ করিয়া কাব্যজগতে এক অভিনব উপহার প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার নিম্নশ্রেণীর লোক সম্বন্ধে এইরূপ নানা জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। জন-নায়কগণ সাহিত্যসেবীদিগকে সেই দিকে চালিত করিলে অচিরেই বঙ্গদেশের সাহিত্য বিপুল শক্তি লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয় হরিদাস বাবুর বরেন্দ্র ও রাঢ়-দেশে প্রচলিত গম্ভীরা ও গাজনোৎসবের ইতিহাস-গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকল সাহিত্যসেবীরই ধ্যান করিবার বিষয়। আমরা তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—"উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে এইরূপ আলোচনা পাইলে, স্বদেশ আমাদের নিকটে আমাদের সর্ব্বস্ব হইবে, সমাজের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, এবং আমরা উন্নতির পথে সগৌরবে ধাবমান হইব। আপামর জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে যে, শিক্ষিত সমাজ তাহাদের আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস-উচ্ছ্বাস, সুখ-দুঃখ, নৃত্য-গীত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম অবজ্ঞার চোখে দেখেন না। শিক্ষিত সমাজ এই সমুদায়ের মধ্যেই জাতীয় ইতিহাসের, প্রাচীন স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া থাকেন; নিম্নশ্রেণীকে সমগ্র জাতির প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রধান সহায় মনে করেন। ইহার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের দ্বন্দ্ব, পার্থক্য ও অনৈক্য দূরীভূত হইবে, এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে সমবেদনা, সৌহার্দ্দ্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সমাজে প্রেমের সেই অসীম শক্তি প্রকটিত করিবার জন্য অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের চিত্র, তাহাদের পারিবারিক কাহিনী ও সামাজিক কার্য্য-কলাপের প্রতি কবি, গায়ক, লেখক, নাট্যকার ঐতিহাসিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দরিদ্রের হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইবে, মূকমুখে ভাষা আসিবে, কাঙ্গালের ঘরে প্রাণ সঞ্চার হইবে, পল্লীসমাজে গৌরব-বোধ জন্মিবে,—সমগ্র জাতীয় জীবনে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে, দেশের মধ্যে শীঘ্রই ভাবুকতার বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে।"

সাহিত্য-সম্মিলনের সমস্যা—কেন্দ্র-বিভাগের আবশ্যকতা

এবার একদিনে দুইটা সাহিত্য-সম্মিলনের যোগ পড়িয়াছে। ইষ্টারের ছুটীর সময় উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ দিনাজপুরে সমবেত হইবেন। সেই সময়েই আবার চট্টগ্রামের লোকেরাও গোটা বাঙ্গালার সাহিত্যিক-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে উত্তরবঙ্গের কেহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কলিকাতা, মধ্যবঙ্গ এবং পশ্চিম বাঙ্গালার (রাঢ় দেশের) প্রতিনিধিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইবেন। যাঁহারা এই সকল ব্যাপারে সাধারণতঃ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গে যাইবেন, কেহ কেহ উত্তরবঙ্গে যাইবেন। সুতরাং এবারকার চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবীদিগের প্রাধান্য থাকিবে।

আমরা মাঘ সংখ্যায় "পূর্ব্ব-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন" অনুষ্ঠান করিবার জন্য ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। দেখিতেছি ঘটনাচক্রে তাহারই সূত্রপাত হইতে চলিল।

বাঙ্গলা দেশের অনেক জেলায় সাহিত্যালোচনা এখনও বদ্ধমূল হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন সর্ব্বসমেত ছয় বার মাত্র হইল। সুতরাং ছাব্বিশ জেলায় একবার করিয়া সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠান করিতে হইলে আরও কুড়ি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। এক একটা সাহিত্য-সম্মিলনে যতটুকু সুফললাভ হয়, তাহার জন্য অত দিন বসিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। দেশের ভিতর

সর্ব্বত্র অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। এজন্য শীঘ্র শীঘ্রই বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানে একবার করিয়া সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে প্রচুর ঐতিহাসিক উপকরণ, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য, এবং ভাষাবিষয়ক আলোচনা সংগৃহীত হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক দেখা দিবেন। দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভূত সম্পদ লাভ করিবে।

এইরূপে সাহিত্য-সেবা বাড়াইবার জন্য আমরা একটা প্রস্তাব করিতেছি। আমরা মনে করি—সাহিত্যালোচনার জন্য বাঙ্গালাদেশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে—উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ)। পূর্ব্ব হইতেই উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন চলিয়া আসিতেছে। আমাদের প্রস্তাবে মধ্যবঙ্গ, রাঢ়, এবং পূর্ব্ববঙ্গেও আর তিনটা করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হইবে। মাঝে মাঝে সমগ্র বঙ্গের সাহিত্যিকগণ একবার উত্তরে, একবার পূর্ব্বে ইত্যাদি প্রণালিতে সমবেত হইবেন।—এই উপায়ে সকলের মধ্যে ঐক্য রক্ষা হইবে।

আমরা উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-চর্চ্চা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গে সাহিত্য-জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে—তাহা দেখিয়া আশার উদ্রেক হয়। মধ্যবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। মুর্শিদাবাদের সাহিত্য-পরিষৎ এবং বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বহুকালব্যাপী নীরব চেষ্টা বঙ্গে সাহিত্য-জাগরণের অন্যতম কারণ। তাঁহাদিগকে এই দুই বিভাগের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করিতেছি।

উত্তরবঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই একবার করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গেল। ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-সমিতি, জাতীয় শিক্ষাসমিতি, সাহিত্য-সভা প্রভৃতি সাহিত্যালোচনাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান প্রায় সকল জেলাতেই নিয়মিতরূপে কর্ম্ম করিতেছেন। পাবনা ও জলপাইগুড়ী এই দুই জেলায় সম্মিলনের অধিবেশন হইতে আর দুই তিন বৎসর লাগিবে। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির সর্ব্বত্র সাহিত্যালোচনার ঢেউ পৌছিবার বিলম্ব নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে মোটে দুই স্থানে সাহিত্য-সম্মিলন হইল। আরও পাঁচ ছয় বৎসর না গেলে ঐ প্রদেশে সাহিত্যসেবা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। যাহা হউক, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ সচেষ্ট হউন। তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র একটা আলোড়ন হইয়া যাইবে।

মধ্যবঙ্গে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদে একটা সম্মিলন হইয়াছে, এবং রাঢ়ে কেবলমাত্র হুগলি জেলায় একটা সম্মিলন হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেও সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে এই দুই কেন্দ্রকে জাগাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমরা মধ্যবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জন-নায়কগণকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করি।

সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিয়া লইলেও ৫।৭ বৎসরের পূর্ব্বে গোটা বাঙ্গালায় একটা গভীর ও সুবিস্তৃত সাহিত্যান্দোলন সৃষ্ট হইবে না। যাহা হউক, ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। আশা করি—সুবিবেচকগণ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে ধুরন্ধরগণ আমাদের প্রস্তাবিত বিভাগ-নীতির প্রতি কর্ণপাত করিবেন। এবারকার দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম সম্মিলনের সভাক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা আশা করি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিগণকেও এই প্রস্তাবের যথাযথ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য

গত বৎসরের চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে একটা নূতন কথা উঠিয়াছিল। কোন কোন সাহিত্যসেবী প্রত্যেক সম্মিলনকে দুই তিনটা বিভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন, যথা—বৈজ্ঞানিক সম্মিলন, ঐতিহাসিক-সম্মিলন ইত্যাদি। যাঁহারা দেশের পুরাতত্ত্ব লইয়া ব্যাপৃত আছেন তাঁহারা সকলে একটা ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক সভায় সমবেত হইবেন। বৎসরব্যাপী কর্ম্মের ফলে যে যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন এই সভায় সেই সকল বিষয়ে তর্ক-প্রশ্ন দ্বারা একটা শেষ সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত করা হইবে। আবার তাঁহারা পরামর্শ করিয়া নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। যাঁহারা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন তাঁহারা একটা বৈজ্ঞানিক সভায় মিলিত হইয়া নিজ নিজ জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইবেন। সেইরূপ ভাষাবিষয়ক উপকরণ-সংগ্রহকারিগণ একটা ক্ষুদ্র আলোচনা-সমিতিতে বসিয়া তাঁহাদের সকল কর্ম্ম সমাধা করিবেন। সুতরাং সমবেত সাহিত্যসেবিগণ এইরূপ ৪।৫ সম্মিলনে বিভক্ত হইয়া পড়িবেন। সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁহার যে সম্মিলনে ইচ্ছা তিনি সেই সম্মিলনে বসিয়া পণ্ডিতগণের তর্ক-প্রশ্ন, বাদানুবাদ, সমালোচনাগুলি শুনিবেন।

এই প্রস্তাব সাধু বটে, কিন্তু সময়োপযোগী নয়। আমাদের বিবেচনায় বিশেষজ্ঞদিগের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্মিলনের সময় এখনও আসে নাই।

আমরা এখনও আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে সাহিত্য-সেবিগণের বিভাগ-সৃষ্টির পক্ষপাতী নহি। পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে

Specialist বা বিশেষজ্ঞ বলা হয়, আমাদের দেশে তাঁহাদিগের সংখ্যা এখনও বেশী নয়। অবশ্য যত শীঘ্র তাঁহারা দেশের মধ্যে বাড়িয়া যান ততই মঙ্গল। তাঁহাদের ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টি করা সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমাদের আরও বড় বড় অভাবের কথাই ভাবিতে হইবে। মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা এখনও বিশেষ জন্মে নাই। বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব এখনও সুবিস্তৃত হয় নাই। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণ এখনও বহুল পরিমাণে অজ্ঞ রহিয়াছে।

সুতরাং এখনও কিছু কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র লোকশিক্ষা-বিস্তারের জন্যই সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সমাজের দশজনকে বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ভাবাইতে হইবে। নানাজাতির মধ্যে উচ্চ বিদ্যা প্রচার করিতে হইবে। সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে সাহিত্যের দিক হইতে ভাল করিয়া চষিয়া ফেলিতে হইবে। দেশের মাটির ভিতর সাহিত্যিক আন্দোলনের বীজ বিস্তৃতভাবে বপন করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে জেলার সকল লোককে সাহিত্য-সম্মিলনের সমবেত-শক্তি (এক স্থানে কেন্দ্রীভূত রূপে) দেখাইতে হইবে। অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত লোককে ঐতিহাসিক তথ্য শুনাইতে হইবে,—বৈজ্ঞানিক গল্প বলিতে হইবে। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে দেশের বিচিত্র কথা শিখাইতে হইবে, সমাজের অভাব ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জানাইতে হইবে।

সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া পল্লীবাসী, সহরবাসী এবং 'প্রতিনিধি'গণও সমগ্রদেশকে দেখিবেন, বুঝিবেন ও চিনিবেন। দেশের তরুলতা, নদ-নদী, আর্থিক অবস্থা, মন্দির-মঠ, দীঘিদুর্গ, ঢিপিভিটার সহিত সকলে পরিচিত হইবেন। সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম, রীতিনীতি, কৃষি-শিল্প, প্রবাদপ্রবচন,

প্রভৃতি বিষয়েও সকলের জ্ঞান বাড়াইতে হইবে। সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব দশজনকে বুঝাইতে হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে কত প্রকার আলোচনা চলিতেছে সকলকে জানাইতে হইবে। অনুসন্ধানকারিগণ কোন্ কোন্ তথ্য বাহির করিতেছেন—কোন্ কোন্ তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। এই উপায়ে সমগ্রদেশের বাণীমূর্ত্তি সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে।

তাহা হইলেই সাধারণের মধ্যে জানিবার ইচ্ছা, শিখিবার ইচ্ছা ও বুঝিবার ইচ্ছা জন্মিবে। পল্লীতে পল্লীতে, পল্লীতে সহরে, সহরে সহরে, জেলায় জেলায়, জাতিতে জাতিতে, লেখকে লেখকে, এবং লেখকে পাঠকে সমবেদনা, সহানুভূতি ও ঐক্য বাড়িয়া চলিবে। তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সার্থক হইবে।

সাহিত্য-সম্মিলনের বিশিষ্ট বিভাগসমূহ

আমাদের বিশ্বাস—আর পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা-দেশে বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন সম্মিলন আরব্ধ হইতে পারিবে। বৎসরে চারি কেন্দ্রে চারিটা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই নানা স্থান হইতে নানাবিধ তথ্য সংগৃহীত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে উপযুক্ত সাহিত্য-ও-কর্ম্মবীরগণের আবির্ভাবও হইবে।

সকল জেলাতেই নিয়মিতরূপে বৈষয়িক তথ্যসঞ্চয়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, পুরাতত্ত্বসংগ্রহ ও সাহিত্যালোচনার কার্য্য চলিতে থাকিবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সাহিত্যসভা বাঙ্গালাদেশের অসংখ্য পল্লীতে ও সহরে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। সাহিত্য-সেবায় উৎসাহদাতা ধনিগণের পরিচয় লাভ হইবে। প্রায় সকল আলোচ্য বিষয়েই নানা শ্রেণীর সাহিত্যসেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। এইরূপে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও পরিপোষক-গণের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে।

বিভিন্ন কেন্দ্রে এইরূপ সাহিত্যালোচনার ব্যবস্থা হইলে সাহিত্যের বিজ্ঞান-শাখাতেই কর্ম্ম ও আলোচনা করিবার উপযুক্ত বহুলোকের দেখা পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন বহুলোকের আবির্ভাব হইবে, তখন সমগ্র বঙ্গের বৈজ্ঞানিকগণ একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা ও গবেষণা করিবার সুযোগ পাইবেন। ইচ্ছা করিলে বৎসরে একবার করিয়া কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকেরাই একটা বঙ্গীয় 'বৈজ্ঞানিক-সম্মিলন' বা 'বিজ্ঞান-সম্মিলনে'র অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। সেইরূপ বৎসরে একবার করিয়া সমগ্র বঙ্গের ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানকারিগণ একটা বঙ্গীয় 'ঐতিহাসিক-সম্মিলন' বা 'ইতিহাস-সম্মিলনে'র অনুষ্ঠান

করিতে পারিবেন। সেইরূপ ভাষা-সম্মিলনে সমবেত হইয়া বৈয়াকরণিক এবং ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ পরস্পর দেখা শুনা এবং বুঝাপড়া করিতে পারিবেন। সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বিশেষজ্ঞদিগের বিভিন্ন আলোচনা-পত্রও প্রকাশিত হইতে পারিবে। বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ 'বিজ্ঞান' বা 'বৈজ্ঞানিক' নাম দিয়া একটা মাসিক বা পাক্ষিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা চালাইতে পারিবেন। ইতিবৃত্তের পণ্ডিতগণ 'ইতিহাস' বা 'ঐতিহাসিক' নাম দিয়া তাঁহাদের এইরূপ একখানা মুখপত্র বাহির করিতে পারিবেন; ইত্যাদি—নানা বিশেষজ্ঞ-সমিতির নানা মুখপত্র বাহির হইতে পারিবে।

যত দিন পর্য্যন্ত বিদ্যার কোন ক্ষেত্রে বেশী সেবকের আবির্ভাব না হয় ততদিন পর্য্যন্ত আজকাল বিশেষজ্ঞদিগকে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। এখন কিছুকাল সাহিত্যের এক এক বিভাগে অধিক সংখ্যক অনুসন্ধানকারী আকৃষ্ট ও সমবেত করিবার সময়। আমরা দেখিতেছি বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী স্বস্বপ্রধান সাহিত্যসেবীর উদ্ভব অতীব আবশ্যক। আমরা কেবল উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনার জন্যই বঙ্গসমাজে বিচিত্র কেন্দ্রের পরিপুষ্টি এবং বিবিধ-সমিতির গঠন দেখিতে চাহি। রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণবিজ্ঞান ইত্যাদি পদার্থ-জগৎ-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিদ্যার ক্ষেত্রেও নানা মতাবলম্বী নানাবিধ পণ্ডিতের সঙ্ঘ-গঠন দেখিতে চাহি। বঙ্গদেশের সমাজ-তত্ত্ব, ইতিবৃত্ত, ভাষা ও পুরাকাহিনী লইয়াও স্থানে স্থানে নানা কেন্দ্র ও সমিতির সৃষ্টি হইতেছে দেখিলে সুখী হইব। প্রকৃত কথা এই—সাহিত্য-ঘটিত সকল কর্ম্মে এখন অনৈক্য, মতভেদ, বৈচিত্র্য ও পার্থক্য আবশ্যক। সর্ব্বত্র সকল বিভাগে এখন ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ বাড়াইতে হইবে—ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে—স্বকীয় চিন্তাশক্তির এবং কর্ম্ম-কুশলতার আধিপত্য-স্থাপনের

ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। সকল বিষয়ে এখন স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন কেন্দ্র গঠন আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য আপামর জনসাধারণের ভিতর দায়িত্ব-জ্ঞান জাগরিত করিতে হইবে। ছোট-বড়, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দীন, সুশিক্ষিত-নিরক্ষর—সকল শ্রেণীর লোককে কিছু কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার সুযোগ তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে। স্বাধীনভাবে সাহিত্য-সমিতির কর্ম্ম পরিচালনা করিবার ক্ষমতা, এবং সাহিত্য-বিষয়ক দল গঠন করিবার সাহস সমাজের ভিতর ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

তবে বর্ত্তমান অবস্থাতে বঙ্গসাহিত্যের দু'এক বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ এখন হইতেই সম্মিলিত হইতে পারেন। আমরা সম্পাদকগণের কথা বলিতেছি। বাঙ্গালার দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকা-সমূহের সম্পাদকগণ বৎসরে একবার সমবেত হইলে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে। সকলে পরামর্শ করিয়া কর্ম্ম করিলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যের রং বদলাইয়া দিতে পারেন। আমাদের মনে হয়,—সম্পাদকগণের কালবিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আশা করি, এবারকার সাহিত্যসম্মিলনের ক্ষেত্রদ্বয়ে সম্পাদকগণের একটা বৈঠক বা পরামর্শ-সম্মিলন হইয়া যাইবে।

বঙ্গসাহিত্যের অসম্পূর্ণতা

এবার আমাদের সাহিত্যের কয়েকটা অভাবের প্রতি সাহিত্য-সেবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ, আমাদের সাহিত্যে উচ্চ অঙ্গের সমালোচনা এখনও বেশী স্থান পায় নাই। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের বিবিধ অঙ্গগুলি আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে এবং উপভোগ করিতে শিখি নাই। দেশে ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের রীতিমতে তুলনা-মূলক সমালোচনা-বিজ্ঞানের সূত্রপাত কি উপায়ে হইতে পারে সাহিত্যরথিগণ চিন্তা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গদেশের বাহিরের বেশী খবর আমরা বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া পাইবার চেষ্টা করি নাই। বঙ্গসাহিত্যে ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তের অতি অল্পমাত্র তথ্যই সঞ্চিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যে ভারতবাসী তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে বুঝা যায় না। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের কথা। আমাদের সাহিত্যে পঞ্চনদের আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সমাজ আলোচিত হওয়া আবশ্যক। মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিকেরা ও রাষ্ট্র-নায়কগণ মারাঠী ভাষায় ভারতবর্ষের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। আমাদের ভাষায়ও সেই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। আন্ধ্র প্রদেশের চিন্তাবীরগণ পূর্ব্বকালে এবং বর্ত্তমান সময়ে তামিল ও তেলেগু সাহিত্যে নানা প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন। তাহার সহিত বঙ্গভাষাভাষিগণকে পরিচিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্য-সেবিগণের সঙ্গে হিন্দী, মারাঠী, তামিল, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় রচিত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

স্থাপিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিতে পারিব না—আমাদের সাহিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শক্তিরূপে স্থান পাইবে না—বাঙ্গালা সাহিত্যকে জগতের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করিতে আমাদের লজ্জা বোধ হইবে।

তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশের সমীপবর্ত্তী দেশসমূহের হাব-ভাব, রীতি-নীতি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ আলোচিত হয় নাই। আমরা চীন, তিব্বত, নেপাল, আসাম ও ব্রহ্মদেশ এই পাঁচটি জনপদ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে লাভ করিতে পারি না। অথচ আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, কলা, ইতিহাস এই কয়টি দেশের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠরূপেই জড়িত। আমাদের সাহিত্যকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে বাঙ্গালীদিগকে তিব্বতী, নেপালী, চীনীয়, ব্রহ্ম এবং আসামী ভাষা শিখিতে হইবে। এই সমুদয় ভাষার সাহিত্য হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

আমরা এবার বিজ্ঞান-সাহিত্যের উল্লেখ করিলাম না। কারণ সেদিকে এখন ঘোর অন্ধকার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সাধারণ সাহিত্যের ভিতরেই এতগুলি অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; সেই সমুদয়ের কথা ভাবিতে গেলে হতাশ হইতে হয়। এইগুলি দূর করা বড় সহজ কথা নয়। কারণ এই কার্য্যের জন্য বিদ্যার প্রয়োজন—নূতন শিক্ষার আবশ্যক। আমাদের পেটে তত বিদ্যা নাই। সেই বিদ্যা আমাদের দেশে প্রচারিত হয় নাই। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় করেন নাই। উচ্চ অঙ্গের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বা সাহিত্য-সমালোচনা শিখিবার সুযোগ স্বদেশে একেবারেই নাই। ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা

চীনীয় ও তিব্বতী, আসামী ও ব্রহ্ম ভাষার আলোচনা আশা করিতে পারি না কি ?

তাহার উপর, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ত দেশের সর্ব্বত্র উচ্চ শিক্ষার বিষয়-সমূহের মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক। যে উপায়েই হউক, আমাদিগের এখন মারাঠী, তামিল, হিন্দী, ফরাসী, জার্ম্মান্, তিব্বতী ও চীনীয় ভাষা শিখিতে হইবে। আমাদের ছাত্র ও যুবকগণকে চীনে, তিব্বতে, মহারাষ্ট্রে, সিংহলে, ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে পাঠাইতে হইবে। সেই সকল দেশে বাস না করিলে কেহ বঙ্গ-সরস্বতীকে নূতন রত্ন উপহার দিবার উপযুক্ত হইতে পারিবেন না। বঙ্গের সাহিত্যরথিগণ, আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করুন—কেবল মাত্র বৎসরে একবার সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না।

ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম অবস্থায় ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিখাইবার যথোচিত ব্যবস্থা ছিল না। জড়বিজ্ঞান শব্দে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন মাত্র বুঝাইত। প্রধানতঃ এই দুই বিদ্যার আলোচনাকে বিজ্ঞানালোচনা বলা হইত। এই দুই বিষয়েও আবার প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার আয়োজন থাকিত না—অতি সামান্য রকমের বিজ্ঞান শিখিয়াই ছাত্রগণ যশস্বী হইত।

বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থিগণকে নানাবিধ বিজ্ঞান শিখাইবার দিকে এবং এই বিজ্ঞানগুলির উচ্চ অঙ্গের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, খনিজ-তত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি জড়জগতের নানা বিজ্ঞান উচ্চশিক্ষার্থিগণের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যা শিখাইবার আয়োজনেরও বহু উন্নতি হইয়াছে। বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা এবং উপাধি ও সম্মান-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক কলেজের ল্যাবরেটরীতে (বিজ্ঞানশালা) উপযুক্ত পরিমাণে সাজসরঞ্জাম, মাল-মশলা, যন্ত্র-হাতিয়ার মজুত রাখিবার জন্য অর্থ-ব্যয়ের আয়োজন হইয়াছে।

আমাদের জাতীয় অভাবের হিসাব করিলে এই আয়োজনকে অতি দীন বলিতে হইবে। অন্যান্য প্রদেশের ত কথাই নাই—উচ্চ বিজ্ঞানের আলোচনা বঙ্গদেশেই অতি শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে।

গত ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি দেশীয় সুধীগণের, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়দিগের, ছাত্রসমাজের এবং জনসাধারণের মনোযোগ

বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য যুবকগণকে অজস্র অর্থব্যয়ে জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণি ও ইংলণ্ডে পাঠান হইতেছে; স্বদেশেও ছোট-বড় বিদ্যালয়, ল্যাবরেটরী, টেক্‌নিক্যাল-স্কুল প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিজ্ঞান-চর্চ্চার ক্ষেত্র ও সুযোগ বাড়ান হইতেছে। বিজ্ঞানের উপদেশকে নানা উপায়ে দেশের কাজে লাগাইবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। বিজ্ঞানালোচনা যাহাতে পুঁথিগত বা ল্যাবরেটরী-গত হইয়া না থাকে তাহার প্রতিই আজকালকার বঙ্গীয় অভিভাবক ও জননায়কগণ সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন। শিল্পে, কৃষিকর্ম্মে, ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে সকল প্রকার জড়বিজ্ঞানের নিয়মগুলি প্রয়োগ দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধানই বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যরূপে বিবেচিত হইতেছে।

এমন কি, দেশের ধনবৃদ্ধির ইচ্ছা ও স্বাধীন অন্নের প্রবৃত্তিই বঙ্গে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ-প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই শিক্ষাপরিষৎ মনে করেন—অল্পবয়স্ক বালকগণকে প্রথম হইতেই উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূতত্ত্বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হাতে কলমে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। বেশী বয়সে আরম্ভ করিলে কোন বিদ্যা শিখিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থায়ী বা বদ্ধমূল হয় না। এই নিমিত্ত জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের কর্ম্মকর্ত্তারা বিজ্ঞান-আলোচনাকে সকল শিক্ষালাভের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই শিক্ষাকে সহজ ও আনন্দদায়ক করিবার জন্য মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়ে ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ল্যাবরেটরীতে বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া, কারখানায় যন্ত্রাদি ঘাঁটিয়া, বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা জড়জগতের বিবিধ বিদ্যাগুলি শিখিতে থাকে।

সুতরাং বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ-প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থাকে আধুনিক ভারতবর্ষে বিজ্ঞানালোচনার চরম পরিণতি বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল বিজ্ঞান এদেশে এখনও প্রকৃত পক্ষে যথোচিত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। সমাজে বিজ্ঞান-বিস্তার-কার্য্য অল্প কাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে এবং বিজ্ঞান বেশী লোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্র—অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে—বিজ্ঞান-চর্চ্চা ফলবতী হইয়াছে। ভারতবাসীর একটা অপবাদ রটিয়াছিল যে, বিজ্ঞান তাহাদের মজ্জাগত নহে। তাহা এক সঙ্গে দুই দিক হইতে দূরীভূত হইতেছে।

প্রথমতঃ, অনেক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে সকলেই আজকাল বুঝিতে শিখিয়াছেন—ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্প, ব্যবসায়, কারুকার্য্য, রাষ্ট্র-গঠন, সমাজ-শাসন, যুদ্ধ-কর্ম্ম, নৌ-চালন ইত্যাদি সকল প্রকার বৈষয়িক কার্য্যেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুতরাং এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, হিন্দুসভ্যতায় জড়জগতের প্রতি আস্থা কমিয়া যায়, ভারতবাসিগণ জড়জগতের, ইহ সংসারের—কোন খবর রাখিতেন না—এই মতগুলির কোন ভিত্তি নাই।

অধিকন্তু, নূতন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানগুলিও ভারতবাসীরা—বাঙ্গালীরা—হাত করিতে পারিবেন—পারিতেছেন—ইতিমধ্যেই পারিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্য রীতিতে, পাশ্চাত্য কায়দায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অল্প দিন হইল বিজ্ঞানালোচনা আরব্ধ হইয়াছে বটে—বেশী লোকের পেটে বিজ্ঞান এখনও পড়ে নাই বটে; কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যেই বাঙ্গালী তাঁহার

হাত দেখাইয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান টিকিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বাঙ্গালীর 'ধাতে' লাগিয়াছে—বিজ্ঞানের উপদেশগুলি বাঙ্গালী হজম করিয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। বিজ্ঞানের জগৎ পাশ্চাত্যদিগের একচেটিয়া থাকিবে না—বাঙ্গালীও পাশ্চাত্যগণের সমকক্ষ হইতে পারিবে। তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে।

এই স্বাধীন বিজ্ঞানালোচনার কথা বলিতে গেলে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের নামই আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। ইঁহাদের নাম জাহির করিবার আর প্রয়োজন নাই। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—ইত্যাদি সকল বিজ্ঞানেই নানা কর্ম্মী আবির্ভূত হইয়াছেন। বিশেষ সুখের বিষয় তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার সুফলগুলি বঙ্গভাষায়ও প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের কর্ম্মের পরিচয় আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

সম্প্রতি ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে রসায়ন-বিভাগের পারিভাষিক শব্দ সংকলিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই ব্যাপারের উদ্যোক্তা। এজন্য আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনসংখ্যায় ইহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। বিষয়টা বিজ্ঞানান্বেষীর পক্ষে প্রয়োজনীয়—তাহা আর বলিতে হইবে না। বাঙ্গালা-সাহিত্যের দিক হইতে আমরা এই সঙ্কলনের অভিবাদন করিতেছি। মাতৃভাষায় ভারতবাসীর বিজ্ঞানালোচনার সুবিধার দিক্ হইতেও আমরা এই প্রয়াসের বিশেষ আদর করি। আর আমাদের প্রাচীন—সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা আমাদের বৈষয়িক জীবনের কত নূতন পরিচয় পাইতে পারি—তাহাও এই সঙ্গে নির্দ্দেশ করিতে চাহি।

আর একখানি রাসায়নিক পরিভাষা-সঙ্কলন আমাদের হস্তগত

হইয়াছে। ইহার প্রণেতা জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের রসায়নাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তাহার মধ্যে কতকগুলি নূতনত্ব আছে। বিশেষজ্ঞগণ তাহার আলোচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহার বহুবিধ মৌলিক অনুসন্ধান এবং স্বাধীন গবেষণার ফল ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে।

রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ব-কথা

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতে একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ বঙ্গদেশের জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ এক অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর প্রচার করিলেন। তাহার পর হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে ভারতবাসিগণ একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-গঠনের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ভারতবর্ষের মুসলমানগণও পশ্চাৎপদ রহিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের আলিগড়ের বিদ্যলয়টিকে একটি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। জনসাধারণের এইরূপ প্রয়াস দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টও কতকগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া-নিয়মগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। আশা আছে—এই নিয়মানুসারে তাঁহারা বাঁকিপুরে, রেঙ্গুণে এবং বোম্বাই প্রদেশের দু'এক স্থানে আরও কয়েকটি শিক্ষাপরিষৎ গঠন করিবেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নিয়মে পরিচালিত হইবে। প্রথমতঃ, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কেবল মাত্র পরীক্ষা-মন্দির থাকিবে না। ইহারা প্রকৃত শিক্ষালয়রূপে গঠিত হইবে। তাহার নিয়মে শিক্ষকগণই পরীক্ষক থাকিবেন। যাঁহারা কলেজে শিক্ষকতা করিবেন, তাঁহারাই আবার ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিবেন। শিখাইবার রীতি ও পরীক্ষার প্রণালী এক হাতেই থাকিবে—এক

নিয়মেই চলিবে। যাঁহারা প্রতিদিন ছাত্রদিগকে দেখিতেছেন ও পড়াইতেছেন, তাঁহারাই যথাসময়ে তাহাদিগকে উপাধি দিবেন—'ডিগ্রী' দিবেন—বৃত্তি দিবেন। সুতরাং শিক্ষকগণের মর্য্যাদা সকল দিক হইতে বাড়িতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রেরা নিজের বাড়ীতে বা মেসে, হোটেলে ও বোর্ডিংগৃহে বাস করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই থাকিতে হইবে। সুতরাং আমাদের শিক্ষাজগতে দুইটা নূতন শব্দের প্রচলন দেখিতে পাইতেছি—(১) "টীচিং" বিশ্ববিদ্যালয়, (২) "রেসিডেন্‌শ্যাল" বিশ্ববিদ্যালয়। এই নূতন ছাঁচে ঢালা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। এবার আমরা "রেসিডেন্‌শ্যাল"-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতেছি।

"এই সঙ্গে আধুনিক ভারতের একটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু আমাদের সমাজের অভাব ও স্বভাবের সঙ্গে প্রায় কোন অনুষ্ঠানেরই যথার্থ সম্বন্ধ থাকে না। অন্য কালে বা অন্য দেশে হয় ত কোন অনুষ্ঠানে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভাল রকম চিন্তা না করিয়াই তাহার প্রয়োগ আমাদের সমাজেও চলিতে থাকে।"

গতবৎসরের চুঁচুড়া সাহিত্যসম্মিলনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ধর্ম্মশিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়াছিলেন। রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গেও এই কথা খাটে।

রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন দেশে সুফল দিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সেই ছাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমাদের দেশেও সুফল ফলিবে—তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষ দুঃখের সহিতই বলিতে হয় যে, আমাদের অনেকে বিদেশ হইতে ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন,

কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা আমাদের কেহই হয় ত দেখেন নাই। আধুনিক রীতিতে নূতন নূতন শিক্ষাপরিষৎ তৈয়ারী হইতে চলিল, অথচ জার্ম্মাণিতে কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—আমাদের দেশের কর্ত্তারা তাহার কোন খবরই রাখেন না। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে পৃথক্—সে সূক্ষ্ম বিচার করিবার বিদ্যা আমাদের নাই। আধুনিক জাপান কোন্ কোন্ সমাজের অনুকরণ করিয়া স্বকীয় শিক্ষালয়সমূহ গঠন করিলেন—এই সকল বিষয়েও আমাদের ধুরন্ধরগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার বা অনুষ্ঠানপত্র ও পাঠ্যতালিকা কখনও দেখেন না বা ঘাঁটেন না। এমন কি, ভারতবর্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ তাহাই অনেকের জানা নাই। কাজেই নূতন নাম ধারণ করিয়া যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা তাহাই 'আধুনিক' ও 'বিজ্ঞান-সম্মত' বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। স্বাধীনভাবে বুঝিবার—কোন একটা জিনিষ বাজারে 'যাচাই' করিয়া লইবার—'বাজাইয়া' দেখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

আমাদের মনে হয়—হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা এবং দেশের জনসাধারণ রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে শব্দটার মোহে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চোখে ধূলা পড়িয়াছে। তাঁহারা বিষয়টা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন নাই।

পাশ্চাত্য সমাজে সকল দেশেই যে পুরা-রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহা নহে। তাঁহারা নিজেদের অভাব বুঝিয়া কর্ম্ম করেন—অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করেন। সুতরাং একটা শব্দের প্রলোভন তাঁহারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন। তাঁহারা নিজের জাতীয় স্বার্থ কখনই ভুলিয়া

যান না। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাদের দেশের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা থাকে, তাঁহারা সেই সকল অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হন না।

পাশ্চাত্য দেশে রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে বটে; তাহাতে ছাত্রেরা স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পায়। সেই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদিগের আত্মবোধেরই বিকাশ হয়—তাহাদের আত্মোপলব্ধির প্রণালীকেই সাহায্য করা হয়—নিজকে চিনিবার, নিজেদের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ বুঝিবার ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করা হয়। ফলতঃ নানা দিক হইতে জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, স্বকীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিই ছাত্রগণের চিত্তের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য দেশের আপামর জনসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় ভাবিয়া থাকে, তাহাদের রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যেও সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা হয়। সমগ্র সমাজের যাহা আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ—রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণেরও তাহাই আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ। সমগ্র সমাজের যাহাতে উৎসব—বিশ্ববিদ্যালয়েরও তাহাতেই উৎসব। দেশবাসীদের যাহাতে বেদনা—বিশ্ববিদ্যালয়েরও তাহাতেই বেদনা। স্বদেশের লোকেরা যে ভাষায় কথা কহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেই ভাষারই পুষ্টি ও সৌষ্ঠব সাধিত হয়। সমাজে যে সকল রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সমাদর লাভ করিয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষক-সমাজেও সেই সমুদয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারেরই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির শিকড়সমূহ দেশবাসীর হৃদয়ের নিভৃততম স্থান পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলে। এই শিক্ষা-পরিষৎসমূহ বহমান জাতীয় জীবন-প্রবাহেরই এক

একটি ধারা মাত্র। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠান সমগ্র জাতীয় সাধনা ও সভ্যতার জীবন্ত কেন্দ্রস্বরূপ।

দেশের মাটীর সঙ্গে রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। যাঁহারা নানা উপায়ে স্বদেশকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা, শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যাঁহারা নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া সমাজের ধনাগমের স্থবিধা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণের মধ্যে পরিগণিত হন। যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের ধর্ম্ম অন্যান্য সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্মবীরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সেই সকল সাহিত্যবীরই বিশ্ববিদ্যালয়-সংগঠনের ভার পাইয়া থাকেন। যাঁহারা সমাজের দশ জনকে বড় করিবার ফলে বড় হইয়াছেন সেই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা স্বদেশকে পৃথিবীর মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্মবীরই রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পাইয়া থাকেন।

তাঁহাদের শিক্ষকতায় ছাত্রগণ জাতীয় আদর্শের সম্মুখীন হইয়া থাকে। তাঁহাদের সাহায্যে জাতীয় ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি ছাত্রদিগের শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে। তাঁহাদের পরিচালনায় শিক্ষার্থিগণ জাতীয় অভাব মোচনের উপযুক্ত হইতে থাকে। তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া শিক্ষার্থীরা স্বদেশের সনাতন প্রথাগুলির প্রতি অনুরক্ত হয়। জাতীয় জীবনের সেই নেতৃগণকে গুরুরূপে পাইয়া ছাত্রেরা জন্ম সার্থক করিতে পারে—জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে পারে। সমাজের ধুরন্ধর-

দিগের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া শিক্ষার্থীরা নিজেদের চরিত্র গঠন করিতে পারে—দেশের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে শিখে। দেশের জননায়কগণের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হইয়া দশের জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে যোগ্যতা লাভ করে।

সুতরাং পাশ্চাত্য দেশে রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সমগ্র জনসাধারণের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে, জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষকগণের আদর্শগত যোগ থাকে—দেশের সঙ্গে বিদ্যালয়ের নিকট সম্বন্ধ থাকে—ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের হৃদয়ের যোগ থাকে। বিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়া এবং সমাজের আব্‌হাওয়া সকল বিষয়ে একরূপ থাকে। সমাজ, শিক্ষক এবং ছাত্র—ইহাদের সকলেরই চিন্তায়, সাধনায়, লক্ষ্যে ও আকাঙ্ক্ষায় একটা সূক্ষ্ম ও গভীর ঐক্য থাকে। শিক্ষালয়গুলি সমাজের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় কর্ম্ম করে—এবং দেশের যাবতীয় চিন্তারাশির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

আমাদের দেশে এইরূপ রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইতে পারিবে কি? হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধরেরা কি উত্তর দিবেন জানি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া সে আশা হইল না। কেবল একটি মাত্র কারণ উল্লেখ করিতেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রায় আশী জন লোক বিদ্যালয়ের মধ্যে বাস করিবেন। তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক ভারতবাসী, এবং অর্দ্ধেক ইউরোপীয়। ভারতবাসিগণের বেতন সাধারণতঃ ২০০৲ হইতে ৭৫০৲ পর্য্যন্ত। ইউরোপীয়গণের বেতন ৭৫০৲ হইতে ২৫০০৲ পর্য্যন্ত। ভারতবাসী অধ্যাপকগণ সাধারণতঃ ইউরোপীয় অধ্যাপকগণের সহায়ক ভাবে কর্ম্ম করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার উচ্চশ্রেণীর (অর্থাৎ অধিক বেতনপ্রাপ্ত

অর্থাৎ ইউরোপীয়) অধ্যাপকগণের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হইবেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নেতৃত্বেই গঠিত হইবে।

এই নিয়মে পরিচালিত শিক্ষালয়ে সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কাহিনী পৌঁছিবে কি? দেশের আর্থিক অবস্থা, পল্লীর স্বাস্থ্যহানির কথা দরিদ্রের ক্রন্দন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে কি? বাঙ্গালীসমাজের বিচিত্র অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীবন-প্রবাহকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করিবে? আমাদের আশঙ্কা —ছাত্রগণ সেখানে স্বদেশের কোন গণ্য-মান্য সাহিত্যসেবীর, শিক্ষা-প্রচারকের, শিল্পী বা সমাজ-সংস্কারকের সাক্ষাৎ পাইবেন না। স্বদেশীয় শিক্ষকগণ সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কেরাণী ভাবে—দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া ছাত্রদিগের অবজ্ঞা ও অনুকম্পার পাত্র থাকি-বেন। এই অবস্থায় দেশের মাটীর সঙ্গে, সমাজের অভাবের সঙ্গে, জাতির আশার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ স্থাপিত হইবে না। ছাত্রেরা এই আব্-হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া স্বীয় সমাজের উপযোগী কর্ত্তব্য স্থির করিতে শিখিবে না। এই কর্ম্ম-ও-চিন্তা-কেন্দ্রের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা জীবনের আদর্শ খুঁজিয়া পাইবে না, স্বকীয় চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা মনে করি—রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ নমুনা পাইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের আর্থিক অভাব মোচিত হইবে না—ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবে না—সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে না—সমাজের আশা পূর্ণ হইবে না। এই ক্ষুদ্র আলোচনা হইতে পাঠকগণ বুঝিয়া থাকিবেন যে, ইংলণ্ড ও ইংরেজ-সমাজের সঙ্গে কেম্ব্রিজ বা অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্বন্ধ, বঙ্গদেশ ও বঙ্গসমাজের সঙ্গে

প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সম্বন্ধ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোন মতেই তুলনা করা যাইতে পারে না। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় এক জাতি বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কখনই হইতে পারে না। এই তুলনায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জাতি' যাইবে। অবশ্য কেম্ব্রিজের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই—আমরাই আমাদের অজ্ঞতা ও অন্ধতা প্রচার করিতে থাকিব মাত্র।

জন-নায়কের কার্য্যকরী ভাবুকতা

"আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে। যে ভাবুকতায় লোকে মহতী সিদ্ধি ধ্যান করিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতার অনুপ্রাণনায় বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নিজের গৌরব-বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা-লাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিদ্যা-প্রচারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন,—স্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন; যে ভাবুকতায় ধনবান্ স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন, এবং ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন; যে ভাবুকতার প্রভাবে ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য-মোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম মনে করেন;—সেইরূপ বৈরাগ্য-প্রসূতি ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি-বিধানের জন্য মানব স্থির-সংযতভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবুকতাময় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং যতদিন

পর্য্যন্ত সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং শিক্ষা-প্রচার সফলতার অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত না হয়; অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত এই সমুদয় কার্য্যে যোগদান করিয়া দেশের লোকেরা নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের উন্নতি, নিজেদের পারিবারিক উপকার বিশেষরূপে সাধন করিতে না পারে; যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ এই সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া সকল প্রকারে লাভবান্ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঘোর নৈরাশ্য মাথায় রাখিয়া, সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার করিয়া, অশেষ অকৃতকার্য্যতা সহিয়া এবং নিজ জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য অগ্রগামী কর্ম্মীদিগকে একাকী নীরবে তপস্যা করিতে হইবে।"

বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য একজন সাহিত্যসেবী বঙ্গসমাজে এইরূপ ভাবুকতা চাহিয়াছেন।

কথাটা বড় গভীর, কথাটা বড় কাজের, কিন্তু বোধ হয় এখনও ইহা বেশী লোকের কাণে গিয়া পৌঁছে নাই। আমাদের বিশ্বাস, আমরা যে যুগে রহিয়াছি তাহার পক্ষে ইহা চরম সত্য—শেষ কথা। এই বাক্যই আমাদের আধুনিক জন-সমাজের দীক্ষা-মন্ত্র হইয়া থাকিবে। এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়াই আমাদের বংশধরেরা জীবন গঠিত করিবে।

যে হিসাবে আমরা এতদিন ভাল-মন্দ বিচার করিতাম, আমরা এখন সে হিসাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছি। সেই মাপকাঠিতে আর আমরা সন্তুষ্ট নহি। আমরা জাতীয় জীবনের - উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিয়াছি। আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়াছে—আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বড় সহজ সরল নয়। আমাদের আদর্শপুরুষের হাব-ভাব, কাজ-কর্ম্ম, চিন্তা ও সাধনা মামুলি ধরণের হইবে না।

তিনি জনসাধারণকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিবেন। সেই পূজার জন্য নিজকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা

থাকিবে। তিনি সর্ব্বদা যে কোন সদুপায়ে সকলকে সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। উপযুক্ত সেবক হইবার জন্যই তাঁহার সকল শিক্ষা হইবে। তিনি হয় ত কোন এক শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু নগণ্য গ্রামের মধ্যে বাস করিয়া অনাথ, দরিদ্র ও রোগীর সেবা করিবার জন্য তাঁহার সকল উৎসাহ প্রদান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। যেখানে দেশের মঙ্গল সেখানে তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি বা সুযোগের কথা তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইবে। সমাজের দশ জনকে ভবিষ্যতে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি নিজের সর্ব্ববিধ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবেন। ধনবান্ হইয়া জন্মিলে, তাঁহার কর্ম্ম আরম্ভ হইবে—ধনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া। তাঁহাকে লোকে খুঁজিবে না—তিনি তাঁহার দান দিবার জন্য সকলকে খুঁজিয়া বেড়াইবেন। তিনি নিজের প্রাপ্য বা অধিকারের কথা ভাবিবেন না। সর্ব্বদা দেয় ও কর্ত্তব্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে। তিনি সকল বিষয়ে নিজকে ছোট করিবেন—পরকে বড় করিবার জন্য। অনুন্নত লোককে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত তাঁহার অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইবে। এজন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টিই তিনি তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন।

এইরূপ বৈরাগ্যের প্রভাবে গঠিত কর্ম্মবীরেরাই বর্ত্তমান যুগের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের আহ্বানেই সমাজ সাড়া দিবে। তাঁহাদের স্পর্শেই সাহিত্য জাগিবে, তাঁহাদের প্রচেষ্টায়ই শিল্প ফলপ্রসূ হইবে। তাঁহাদের জীবনেই ধর্ম্ম সজীবতা লাভ করিবে—তাঁহাদের কর্ম্মেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আন্তরিকতা আসিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইলেই বা ওকালতীতে পশার হইলেই বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জগৎকে চমকিত করিতে পারিলেই

জননায়ক হইবার যোগ্যতা জন্মিবে না। যাহার তাহার ডাকে লোকে আর উত্তর দিবে না। এখন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, ত্যাগের পরিচয়, সন্ন্যাসের সার্টিফিকেট না দেখাইতে পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। সমাজের কোন কাজে মেকী চালাইবার দিন আর নাই।

ইউরোপের নূতন সমস্যা

এখন দেখিতেছি অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারী লইয়াই ইউরোপে গোল বাধিবে। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীতে কোন মতে জোড়াতালি দিয়া একটা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্ কোন রাষ্ট্রনীতিবিশারদ বলিতেছেন—এই জোড়াতালি আর টিকান কঠিন। তাঁহাদের আশঙ্কা—এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ শীঘ্রই খসিয়া পড়িবে। আর খাস ইউরোপের বুকের উপর একটা ভাঙ্গাচুরা আরম্ভ হইলে ভাঙ্গাগড়ার ঢেউ অনেক দূর গিয়া পঁহুছিবে। তুরস্কের রাজ্যে ভাগ বসান লইয়াই এতদিন ইউরোপে শান্তিভঙ্গের ভয় ছিল। এক অদ্ভুত ও অভাবনীয় উপায়ে তাহার মীমাংস হইতে চলিয়াছে। তাহার জন্য ইউরোপের জাতিগুলির মধ্যে ভয় অনেকটা কমিয়া আসিতেছে। এখন তাহার কারণ বলিতেছি।

অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীকে নিতান্ত জোর করিয়া এক দেশ বলা যায়। কোন বিষয়েই এই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য নাই। সকল লোকই রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের উপাসক বটে। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম্মের দোহাই আর চলে না। আধুনিক জগতে ধর্ম্মমতে ঐক্য থাকিলেই রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব রক্ষিত হইবে এরূপ আশা নাই। অধিকন্তু, ভাষা, জাতি, সাহিত্য, সভ্যতা সকল বিষয়েই অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীতে অসংখ্য অনৈক্য, বৈষম্য, পার্থক্য রহিয়াছে। বুদ্ধিবলে এই অনৈক্যগুলির সমন্বয় হইতে পারিত। ভিন্ন ভিন্ন বিজিত জাতিগুলিকে কমবেশী স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিলে রাষ্ট্রের ঐক্য কথঞ্চিৎ রক্ষা হইতে পারিত। কিন্তু উদার শাসননীতি অবলম্বন না করিয়া অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর কর্ত্তারা তাঁহাদের অনেক প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছেন।

একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। এই রাষ্ট্রে সার্ভ-জাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই পরাধীন সার্ভ-বংশীয়গণের স্বজাতিরা স্বাধীন ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সার্ভিয়া-রাজ্যে বাস করিতেছে। সার্ভিয়া-রাজ্য বুল্‌গেরিয়ার সঙ্গে মিলিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। যুদ্ধের ফলে সার্ভিয়া-রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে—সমুদ্রের কূলে এই রাজ্য একটা বন্দর লাভের প্রয়াস করিতেছে।

এইখানে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর সঙ্গে সার্ভিয়ার মনোমালিন্য উপস্থিত। অষ্ট্রীয়ার সার্ভজাতীয় প্রজাপুঞ্জ রক্তের টানে স্বাধীন সার্ভিয়ার দিকেই ঝুঁকিয়াছে। কাজেই অষ্ট্রীয়া তাহার সার্ভ-প্রজাদিগকে যথাসম্ভব নির্য্যাতিত করিতেছে। ফলে স্বাধীন সার্ভিয়ার সঙ্গে ইহারা শীঘ্রই যোগ দিবে—বড় একটা সার্ভিয়ারাজ্য গড়িয়া উঠিবে। তাহার উপর হাঙ্গারী প্রদেশের সঙ্গে অষ্ট্রীয়া-রাজ্যের প্রকৃত বিরোধ ত চিরকালই আছে।

এই অবস্থার অষ্ট্রীয়ায় মধ্যে মহা অশান্তি বিরাজ করিবে—তাহা অতি স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের লোক লইয়া তাঁহাকে বসবাস করিতে হইতেছে—অথচ তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া যথাসম্ভব সন্তুষ্ট রাখিতে তিনি অসমর্থ। কারণ অষ্ট্রীয়াতে জার্ম্মাণেরা বিজেতা জাতি, জার্ম্মাণদিগের সঙ্গে সার্ভ বা অন্যান্য জাতির সমান অধিকার দিতে তাঁহারা বড়ই কুণ্ঠিত। কাজেই ভিতরকার গোলমাল মিটান বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এদিকে রাজ্যে সেনাবলের যথেষ্ট অভাব। সৈনিক বিভাগে উপযুক্ত লোক নাই—সমর-শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা নাই। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর যুদ্ধ করিবার একেবারেই কোন ক্ষমতা নাই। বিচক্ষণেরা তাহার ধাপ্পায় ভয় পাইবেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে অষ্ট্রীয়ায় সার্ভিয়ায় গোল বাধিতে বড় বেশী দিন লাগিবে না। তাহা হইলে অষ্ট্রীয়ার বিজেতা জার্ম্মাণ-জাতি আত্ম-

রক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন। তখন ইউরোপের ঘর সামলাইতে অতিশয় বেগ পাইতে হইবে।

এই সব বুঝিয়া শুনিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এখন হইতেই অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর একটা রফা করিবার পরামর্শ দিতেছেন।

প্রাচ্যচিত্রকলা-প্রদর্শনী

আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে। আমরা সকল প্রকার কলাবিদ্যা ভুলিয়াছি। আজকাল আমাদের ধন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, সুখ নাই, সম্পদ নাই। এখন জীবন নিরানন্দময়, সংসার অন্ধকারময়। সমাজে সঙ্গীতের আদর নাই—শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। কারুকার্য্য এখন অবহেলার সামগ্রী হইয়াছে। লেখা-পড়া কেবলমাত্র পুঁথি মুখস্থ করায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস-উচ্ছ্বাস—এই সকল জীবন-বত্তার লক্ষণগুলি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ভারতের সরস্বতী এখন মলিন ও শীর্ণকায়। বাগ্‌দেবীর অঙ্গে কোন আভরণ নাই—বীণাপাণির বীণায় ঝঙ্কার নাই। সঙ্গীত ও সাহিত্যের জননী এখন সঙ্গীতহীনা।

সুখের কথা—নানা দিক হইতে আমাদের এই সর্ব্বোতোমুখী অবসাদ দূর করিবার আয়োজন চলিতেছে। আমাদের স্বাধীন চিন্তা নানা দিক্ দিয়া কাটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবন নানা উপায়ে জন্মভূমিকে সুশ্রী ও সহাস্যবদনা করিতেছে। গত ফাল্গুন মাসের কলিকাতার ধর্ম্ম-সমবায়-কোম্পানী-নির্ম্মিত হিন্দুস্থান-বীমা-সমিতির বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য-চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখিয়া আমাদের মনে আশার উদ্রেক হইয়াছে। আমাদের জীবনীশক্তির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

এই প্রদর্শনীতে সর্ব্বসমেত আঠার জন চিত্রকরের কার্য্য প্রদর্শিত

হইয়াছিল। কয়েক জন নূতন লোকের নাম দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বুঝা গেল চিত্র-বিদ্যা আমাদের সমাজে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। নবীন শিল্পিগণকে এই প্রদর্শনীতে স্থান দিয়া অনুষ্ঠাতারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য কাছে।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে বাঙ্গালীর জিনিষগুলি ও হিন্দুর সুপরিচিত সামগ্রী লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার 'তুলসী গাছ'টি সকল হিন্দুর মনেই ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবে। তুলসী-মঞ্চের চারিদিকে একটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা যেন মাথান আছে, ইহাতে তরুণ শিল্পীর প্রতিভা কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের 'বাল্মীকির তপস্যা' এবং 'ননিচোরা' হিন্দু ইতিহাসের দুইটি চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই—কবিত্বের কোন পরিচয় পাইলাম না। তবে বাল্মীকির ধ্যানস্তিমিত লোচন দুইটি অতি সুন্দর হইয়াছে। 'ননিচোরা'-চিত্রে বাঙ্গালী শিশুগণ প্রীত হইবে—একটু স্বাভাবিকতা আছে। কর মহাশয়ের 'সরস্বতী' সকলেরই মন মুগ্ধ করিবে। এরূপ 'কুন্দেন্দুধবলা'র চিত্র বোধ হয় আর কখনও কেহ দেখে নাই। কিন্তু ফুলগুলি আকাশে কেন ঝুলিতেছে? শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আদর্শ রাধিকা'-কল্পনাটি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে গৃহীত। শিল্পীর রচনাও আদৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার 'প্রথম দর্শন' চিত্রে রমণীর পাশবালিশের মত পাগুলি অতি কদাকার হইয়াছে। যে কোন দর্শকের মনেই বীভৎস রসের সঞ্চার হইবে। বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের নক্‌সা করিয়া ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এইগুলি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইবেন—নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

নন্দলালের প্রতিভা

সুনিপুণ নন্দলালের 'গোকাল-ব্রত' চিত্রটি অতি মনোরম হইয়াছে। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশ, কি চিত্রিত বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা—সকল দিক্ হইতেই এই অঙ্কনটি অতি উচ্চ-শ্রেণীর কারুকার্য্য হইয়াছে। বঙ্গের গ্রাম্য জীবনে হিন্দুর পারিবারিক কার্য্যকলাপের মধ্যে গোকাল-ব্রত অনুষ্ঠানটিই কবিত্বময়—হৃদয়ের প্রসার-বর্দ্ধক। বৈশাখ মাসে হিন্দু বালিকারা দূর্ব্বা-চন্দন দ্বারা গরুর পূজা করিয়া থাকে। একটি বালিকা হাতে পূজার সামগ্রী ধরিয়া গরুর সম্মুখে বসিয়া আছে, গরুর ঢুঁ মারিবার ভয়ে বালিকা ভীত হইতেছে—অথচ বসিয়াই আছে। এই বিষয় লইয়া কবি চিত্রে যে সূক্ষ্ম ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই চিত্রের নকল চিত্র বিরাজ করুক। দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি নবজীবন লাভ করিবে—সন্তানসন্ততিরা চিত্রে জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে শিখিবে।

নন্দলালের 'রামায়ণী চিত্রগুলি' এবারও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। কবি আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে হিন্দুর আদর্শে চিত্রিত করিয়া সমগ্র জাতিকে ঋণে আবদ্ধ করিলেন। তিনি অবতার রামচন্দ্রের চরিত্র প্রত্যেকটি চিত্রে অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বীরবর, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, নবযুগের প্রবর্ত্তক রামচন্দ্র হিন্দু চিত্রকরের ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সত্য সত্যই প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। চিত্রকরের ধ্যান করিবার ক্ষমতা আছে, আধ্যাত্মিক বিষয় বুঝিবার প্রবৃত্তি আছে, আধ্যাত্মিক ভাব

ফুটাইবার শক্তি আছে, হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার দখল আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রারম্ভ কালে নন্দলালের অভ্যুদয়ে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি।

অতুলকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি

তার পর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'কালীমূর্ত্তি'। 'গোকাল-ব্রত' এবং 'কালী'—এই দুইটি চিত্রই এবারকার প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। অতুলকৃষ্ণের চিত্রে ভয়ঙ্করা কালীর তাণ্ডবনৃত্যে সমগ্র মেদিনী যেন কাঁপিতেছে। চিত্র দেখিয়াই মনে হয়, বিশ্ব ভরিয়া আলোড়ন হইতেছে—ত্রিভুবনের মধ্যে এক বিরাট্ শক্তির কার্য্য চলিতেছে। এইরূপ ভাব মনে জাগান যে-সে শিল্পীর সাধ্য নয়। মূর্ত্তিটির পশ্চাৎভাগে এক অসীম শূন্য বিরাজমান। তাহাতে গাম্ভীর্য্য বাড়িয়াছে, চিত্তে অপরূপ ভাবুকতা। সঞ্চার হইতেছে। কালী-মূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি—কিন্তু এরূপ সংহারকর্ত্রীর চিত্র এই প্রথম দেখিলাম। ভয়ঙ্কর-রসে কবির হাত আছে। কঠোরতার সৌন্দর্য্য, কষ্টের মাধুরী, শ্মশানের নিবিড় আনন্দ, বিনাশের অমৃত—চিত্রকর আস্বাদ করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে দর্শকেরাও প্রলয়ের অনন্ত সুখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অতুলকৃষ্ণের 'কালিয়-দমন'-চিত্রেও ভয়ঙ্কর রসেরই অবতারণা হইয়াছে বটে। কিন্তু তিনি সুষ্ঠুরূপে তেজস্বিতা ও শক্তির ক্রিয়া ফুটাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, অতুলকৃষ্ণ যে সকল বিষয়ে হাত দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আশা হয়। মামুলি প্রেমের জগৎ, হা-হুতাশের জগৎ ছাড়াইয়া আমরা দিন দিন কত দূরে সরিয়া আসিতেছি—সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রেও তাহার প্রমাণ পাইয়া বুক আশায় ভরিয়া গেল।

আমাদের জাতীয় জীবনে গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে। বিশ্বের গূঢ় তত্ত্বগুলি এবং জগতের সমস্যাসমূহ গভীর ভাবে বুঝিবার জন্য আমাদের

প্রয়াস হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগস্বীকার, কঠোরতা, নির্ভীকতা, বৈরাগ্য, সাধনা, ভক্তি—এই সকল ভাব লইয়া আমরা কাব্য রচনা করিতেছি, সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি, চিত্র আঁকিতেছি, মূর্ত্তি গড়িতেছি। বাঙ্গালী বাজে কথায়—ফাঁকা আওয়াজে—নিরর্থক বাক্‌বিতণ্ডায় সময় ব্যয় করিবে না, ইহাই তাহার পরিচয় ও পূর্ব্বাভাষ।

চিত্র-সমালোচনা

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের 'পলাতক'-চিত্রে ভয়-বিহ্বল বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরও চারি পাঁচটি রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে—সকল গুলিতে ভাব প্রকাশ করিবার প্রয়াস আছে, কিন্তু সফলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে 'জন্মাষ্টমী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহের 'সান্ধ্য-মেঘ' চিত্রণে নৈপুণ্য আছে। তাঁহার 'শিব-পূজা'য় সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু পূজার স্থান-নির্ব্বাচনটি তত সুবিধাজনক হয় নাই। তাঁহার 'ভগ্ন মুকুর' চিত্রে কোন বিশেষত্ব নাই। ইনি নানা বিষয়ে হাত দিয়াছেন—কোন্ বিষয়ে ঠেকিবেন বুঝা যাইতেছে না। কোন দিকেই সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ দেখিলাম না। তবে হাতের সাফাই আছে, রং ফলাইবার ক্ষমতা আছে। তিনি বাহ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু মানব-চিত্তের নিগূঢ় চিন্তারাশি লইয়া তাঁহার খেলিবার শক্তি নাই।

শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পা মান্দ্রাজী চিত্রকর। তাঁহার কেবল একটিমাত্র রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। রামচন্দ্র নিদ্রিত, ধরিত্রী রামচন্দ্রকে পাদুকা উপহার দিতেছেন—সীতা তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই চিত্রে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য ও অনাসক্তি বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু রমণীদ্বয়ের অঙ্কনে কবি বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে সীতা দেবীর ভক্তিভাবে উপহার-গ্রহণ বেশ চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ দত্তের 'তারামূর্ত্তি'তে রং ফলাইবার ক্ষমতা দেখিলাম—চণ্ডী দেবীর ঈষৎ আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু অতুল কৃষ্ণের 'কালী'র কাছে এই 'তারামূর্ত্তি' নিষ্প্রভ।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি চিত্র পাঠাইয়াছেন। কোন কোন বাঙ্গালা কবিতাকে চিত্রে ফুটাইবার প্রয়াস দেখিতে পাইলাম। কিন্তু চিত্রগুলি দেখিয়া কোন রসবোধ হয় না। কয়েকটি চিত্রের নীচে কবিতার দুই এক পংক্তি লেখা আছে, তাহাতেও চিত্র বুঝিবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। 'সান্ধ্য প্রদীপ'-চিত্রটি ভালই বুঝা যায়, কিন্তু বুঝাইবার জন্য চিত্রকর যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সার্থকতা পাই না। আর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর মহাশয় একজন ডাকওয়ালার গানকে স্থায়ী আকারে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কবির মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি লোক নির্জ্জন পার্ব্বত্য দেশের পথ বহিয়া চলিতেছে—চারিদিকে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর। এই দুইটি পথিকের পশ্চাদ্ভাগ জনপ্রাণীশূন্য—আড়ম্বরশূন্য—বিশাল ও বিস্তীর্ণ। এই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের প্রভাবে অনন্তের পথে যাত্রা—কোন এক দূর জগতের বার্ত্তা—কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইতেছে। দর্শক মাত্রেই ব্যাখ্যা ব্যতীত পথিকদ্বয়ের এই অনুসন্ধানের প্রয়াস বুঝিতে পারিবেন। 'পাণ্ডবগণের পলায়নে' বিশেষ কিছু পাইলাম না, তবে পলায়নের অবস্থাটা মন্দ চিত্রিত হয় নাই। মুকুল-চন্দ্রের 'পলাতকে'ও আমরা এই শক্তি দেখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের 'যমুনা-জলে'-চিত্রে নয়ন রঞ্জনই হয় না। তবে তাঁহার 'রোগী' এবং 'গোপিনী' এই দুইটি চিত্রে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা জীবন্তরূপে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা দেখা যায়। বিহারী চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদের 'রাগিণী মেঘ মল্লার'-চিত্রে মৌলিকতা নাই—কিন্তু কারুকার্য্যটি মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের সাতটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইঁহার আলোচ্য জগৎ এখনও অতি বিস্তীর্ণ—কোনও এক বিষয়ের জন্য সাধনা করিলে সফলকাম হইতে

পারিবেন আশা করা যায়। তাঁহার 'হর-পার্ব্বতী' না ধরাই উচিত ছিল। প্রায় চিত্রেই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার বিসদৃশ অঙ্গুলি এবং অঙ্গের সৌষ্ঠবহীনতা বর্ত্তমান। আমরা অন্যান্য যে সকল চিত্রের কবিত্ব উপভোগ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিকতা বা বৈসাদৃশ্যের প্রভাব পাই নাই।

আর একজন বিহারী শিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ কয়েকটি চিত্র দিয়াছেন। তাঁহার 'হর-গৌরী' অতি সুন্দর হইয়াছে। গৌরীর কোলে গণেশ শুইয়া আছে। গৌরীর চক্ষু মুদ্রিত, গণেশের চোখ খোলা। গণেশের শয়ন-চিত্র অতিশয় মনোহারী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হাকিম খাঁ মহাশয়ের দুইটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইটিই অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে—কিন্তু কোনটিরই বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না। একটি চিত্রে দিল্লীর রাস্তা দিয়া বন্দী দারাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রকাণ্ড দুর্গের একেবারে নিকটে দারার হাতী আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিয়াছে। এই দুইটি পদার্থ ব্যতীত আর কোন জন-প্রাণী চিত্রের মধ্যে আছে কি না দেখিবার অসুবিধা হইতেছে—তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রভাব চিত্রের উপর পড়িতে পায় না। বিশাল অট্টালিকা ও বিশাল হস্তী—এই দুই বৃহৎ চিত্রের চাপে পড়িয়া চক্ষুও নির্য্যাতিত হইতেছে, চিত্তের দুয়ারও অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর, চিত্রকর দারার মানসিক অবস্থা বুঝাইবার কোন প্রয়াস পান নাই।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের মৌলিকতা

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এবার কালীমূর্ত্তিতে হাত দিয়াছেন। তিনি শাস্ত্র-বচনের সঙ্গে মিলাইয়া চিত্র আঁকিয়াছেন। ধ্যানগুলি বুঝিবার জন্য তাঁহার যত্ন আছে—হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি চিত্রে ধর্ম্ম-তত্ত্বগুলি ফুটাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার পন্থা অনুসরণ না করিলে হিন্দুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে কোন চিত্রকর সমর্থ হইবেন না। যে সকল কবি ও শিল্পী হিন্দুর দেবদেবী লইয়া ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের সফলতার অন্য কোন উপায় নাই। অলীক ও মন-গড়া ভাবুকতার দ্বারা হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মের বিন্যাসগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গাঙ্গুলী মহাশয় চিত্রবিদ্যার সঙ্গে শাস্ত্র-চর্চ্চা যোগ করিয়াছেন দেখিয়া আশার উদ্রেক হয়।

তাঁহার চিত্রাঙ্কনেও ক্ষমতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গত বৎসরে প্রদর্শিত তাঁহার 'চৈতন্য' আমাদের মনে আছে। এবার-কার কালীমূর্ত্তিটিও প্রদর্শনীর একটি বিশেষত্ব। তিনি অতুলকৃষ্ণের ন্যায় সমগ্র বিশ্বে প্রলয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য দেখাইতে প্রয়াসী হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য—কালীর আকৃতি-গত স্বরূপটি প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতুলকৃষ্ণের চিত্রে পারিপার্শ্বিক পরিকল্পনার মধ্যে কালীর সংহার-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার কালীর বিকট মূর্ত্তিরই আরাধনা করিয়াছেন—জগতের অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে কালীর যোগ রাখেন নাই। অতুলকৃষ্ণে ধ্বংসের ছবি—প্রলয়ের চিত্র দেখিতে পাই। অর্দ্ধেন্দ্রকুমারে কালীর ব্যক্তিগত

রূপ, স্বকীয় বিশেষত্বই প্রকটিত হইয়াছে। তিনি যে ধ্যানটিকে মূর্ত্তি দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

'কালী কপালাভরণা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্রা খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥'

এই বিবরণের বিকট মূর্ত্তিটি অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের চিত্রে অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সাধারণের দৃষ্টিতে এই 'সাঁওতালী' কালী অতি কদাকার ও বিশ্রী বোধ হইবে। কিন্তু যিনি ভাবুক তিনি বুঝিবেন ইহার মধ্যে সুষমা আছে। কবি এই রাক্ষসী মূর্ত্তির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ঢালিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। সকলকেই তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতার প্রশংসা করিতে হইবে। 'অতিবিস্তারবদনা'র লাবণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া তিনি আমাদের চিত্রকর-জগতে নূতন কলার খনি—অভিনয় সৌন্দর্য্যের আকর—আবিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতায় মামুলি সৌষ্ঠবের পথ ছাড়িয়া বিভীষিকার গরিমা দেখাইতে অনেক শিল্পীই অগ্রসর হইবেন। ভারতীয় কলার ইতিহাসে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার একটা নূতন অধ্যায় খুলিবার সূত্রপাত করিলেন।

চিত্র-প্রদর্শনীর সার্থকতা

এবারকার প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে কয়েকটা সাধারণ কথা মনে আসিয়াছে।

প্রথমতঃ, বঙ্গে বিদ্যার জগতে—কলার সংসারে—সাহিত্যক্ষেত্রে পরানুবাদ ও পরানুকরণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। স্বাধীনভাবে নিজস্ব দান করিবার জন্য শিল্পী, কবি, লেখক, চিত্রকর নিজ নিজ হাতিয়ার ধরিয়াছেন। সকল দিকে ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিন্তা আধিপত্য লাভ করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার নদ-নদী, জীব-জন্তু, উৎসব-আমোদ সম্বন্ধেই চিত্র আঁকিতেছেন, গান গাহিতেছেন, কাব্য লিখিতেছেন। বঙ্গে ভারতবর্ষের সামগ্রীগুলি—হিন্দুর ঐতিহাসিক ঘটনা সকল এবং জাতীয় জীবনের বিচিত্র অনুষ্ঠানসমূহ—শিল্প, কলা ও সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হইতেছে। চিত্রের ভিতর দিয়া, কাব্যের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের স্বদেশকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি—স্বসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিতেছি।

তৃতীয়তঃ, এই সকল শিল্পকলা অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতের বিশেষত্বসমূহ—আমাদের জাতীয় জীবনের স্বতন্ত্র আদর্শগুলি—আমাদের ইতিহাসগত পার্থক্যই নূতন প্রণালীতে প্রকাশিত করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের আদর্শ, বিদেশীয় জাতীয়তার আধিপত্য আমরা ক্রমশঃ ছাড়াইয়া উঠিতেছি। আমাদের চিত্রে, সাহিত্যে, নানাবিধ কলার অনুষ্ঠানে, হিন্দুত্ব—হিন্দুজীবনের সনাতন আদর্শ—ভারতবাসীর স্বাভাবিক লক্ষ্য নব নব উপায়ে

ফুটিয়া উঠিতেছে। আদর্শের দাসত্ব—লক্ষ্যের দাসত্ব—সাধনার দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমরা আমাদের স্বধর্ম্ম খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের যে লক্ষ্য—আমাদের পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহের যে উদ্দেশ্য—সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই আমাদের চিত্রকরেরা তুলি, রং ও পেন্সিলের সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতেছেন।

চতুর্থতঃ, বিদেশীয় কলা-জগতে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার যে সকল রীতি আছে, তাহাও আমাদের শিল্পিগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। পরকীয় ভাবগুলি নিজের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করাই জীবনবত্তার লক্ষণ। আমরা যে জীবিত জাতি—এখনও যে নবযুগের অনুরূপ নূতনশক্তি দেখাইতে সমর্থ, কলা জগতের এই লক্ষণই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

পারশ্য কবিদিগের রং ফলাইবার ক্ষমতা, আমাদের চিত্রকরগণ নিজস্ব করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পুরাতন মোগল শিল্পীদিগের নিকট আমাদের চিত্রকরেরা বাস্তব জগতের বিবিধ বস্তু অতি স্পষ্ট ও বিশদরূপে চিত্রিত করিবার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছেন। আধুনিক জাপানীরা কলাজগতে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের, অতি সূক্ষ্ম সুষমার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের হাত-সাফাই ও সহজসুলভ ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাও আমাদের চিত্রজগতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, ইউরোপীয় রোমান্ ক্যাথলিকযুগের ধর্ম্ম-প্রাণ ভাবুক কবিগণ চিত্রে ও কারুকার্য্যে এক আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মপ্রবণতা ফুটাইয়াছিলেন। আমাদের শিল্পীরা এই আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইবার ক্ষমতা লাভ করিতেছেন। চিত্রের নিগূঢ় রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিবার যোগ্যতা আমাদের কলা-জগতেও আধিপত্য লাভ করিতেছে। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলা-জগতের শ্রেষ্ঠ টেকনিক্‌গুলি আমাদের নিজস্ব হইয়া যাইতেছে। অতীত

ও বর্ত্তমান যুগের শিল্পচাতুর্য্যসমূহ এবং সৌন্দর্য্য ফলাইবার কায়দাসকল আমাদের বঙ্গীয় চিত্রজগতে স্থান পাইতেছে। বিদেশের নিকট, অতীতের নিকট যাহা যাহা গ্রহণীয়, সকলই আমরা উদারভাবে গ্রহণ করিতে শিখিতেছি। এই উপায়ে আকৃতির লাবণ্যে নজর পড়িতেছে, কারুকার্য্যের বাহ্য সৌষ্ঠব পুষ্ট হইতেছে, কলানৈপুণ্য বাড়িতেছে। ফলতঃ, আমাদের সুকুমার শিল্পগুলি সম্পদ লাভ করিতেছে। জাতীয় কলা ঐশ্বর্য্যশালিনী হইতেছে।

অতএব দেখা গেল যতগুলি উপকরণ থাকিলে স্বতন্ত্র জাতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব পরিপুষ্ট হয়, সকলগুলিই বঙ্গীয় জগতে আসিয়া জুটিয়াছে। গত ছয় বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রদর্শনীগুলি উত্তরোত্তর আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল করিতেছে।

ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ

আমরা বলিলাম জাতীয় উন্নতির সর্ব্ববিধ উপাদান আমাদের চিত্র-জগতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্য, ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ, আমাদের জাতীয়তার মূলমন্ত্রগুলি আরও গভীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমাদের শিল্পিগণকে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র বিশেষরূপে শিখাইবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুত্ব বুঝিবার জন্য যথোচিত আয়াস স্বীকার আবশ্যক, সাধনা আবশ্যক।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনবাদের অভ্যন্তরে কিছু ভাবুকতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সেই ভাবুকতায় কথঞ্চিৎ তরলীকৃত হিন্দুত্বের আভাষ পাওয়া যায় মাত্র, উপনিষৎ-বেদান্তের ক্ষীণ উপদেশ শুনা যায় মাত্র। সেইটুকু কোন মতে আওড়াইতে পারিলেই হিন্দুর মূল-মন্ত্র বুঝিতে পারা যাইবে না। কারলাইল, এমার্সন, টলষ্টয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঋষিবর্গকে ছাড়িতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে স্বদেশের আবহাওয়ায় যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, এই আবহাওয়ায় যে সকল আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার জন্য কষ্ট কল্পনা প্রয়োজন—সে শিক্ষা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে—সে সাধনায় আমাদিগকে ব্রতী হইতেই হইবে।

তাহা না করিলে অনধিকার চর্চ্চার দোষে পদে পদে বিব্রত হইতে হইবে। যে কোন উপায়ে বাস্তব জগতের অপদার্থতা, অসম্পূর্ণতা ও নশ্বরতা প্রমাণ করিলেই হিন্দুসভ্যতা প্রকাশ করা হইল না। ইহ সংসারকে হীন দেখাইলেই আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হইল না। হিন্দুর শিল্প-শাস্ত্রে মাপজোকের খুঁটি-নাটি বড় কম ছিল না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর নীতিশাস্ত্রে দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠন বিষয়ে সামান্য মাত্র নিয়মভঙ্গের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। এখনও নগণ্য পল্লীগ্রামের সামান্য রমণীরাও জানেন যে, মূর্ত্তিগুলিকে বিকৃত ভাবে গড়িলে শিল্পী ও গৃহস্থের প্রতি আরাধ্য দেবদেবীগণ অসন্তুষ্ট হন। মনে রাখিবেন, অঙ্গের সৌষ্ঠব নষ্ট করিলেই, শরীরকে ক্ষীণ ও অবসন্ন ভাবে আঁকিলেই ধর্ম্মপ্রাণতা, ভাবুকতা ব্যক্ত করা হইল না। হিন্দুর বিচারে— 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'।

হিন্দু বিষয়কর্ম্মে অমনোযোগী ছিলেন না, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে উদাসীন ছিলেন না, সংসারকে বাস্তবজগৎকে, সমাজরক্ষাকে অবহেলা করেন নাই, পরিবার-পালনকে, গৃহস্থ-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করেন নাই। হিন্দু ইন্দ্রিয়ের জগৎকে বিনষ্ট করেন নাই—তাহার উপর অতীন্দ্রিয়ের ছাপ মারিয়াছিলেন; হিন্দু ভোগকে বর্জ্জন করিতেন না,—ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা ভোগবাসনাকে শান্ত সংযত নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হিন্দুর বিধানে মানবজীবনের সকল অভিব্যক্তিই—পার্থিব সকল অনুষ্ঠানই—যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। এই জন্য হিন্দুর বৈরাগ্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর পরকালবাদ অলীক ধারণামাত্র ছিল না—হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত না। পরন্তু সংসারের কার্য্যকলাপসমূহই ধর্ম্ম-ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইত, ভোগের অনুষ্ঠানগুলিই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানই বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত

হইত। ইহার ফলে হিন্দুর ভাবুকতা, সন্ন্যাসে, ব্রহ্মচর্য্যে, গার্হস্থ্যে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, পল্লীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই স্বকীয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কার্য্যতঃ সকল ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য-বিধান, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ধিস্থাপন, ইহাই হিন্দুর সনাতন সাধনা। তাই হিন্দুর আদর্শ-কবি কালিদাস হিন্দুর আদর্শ-গৃহস্থ-নরপতির জীবন চিত্রিত করিয়াছেন :—

জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ ॥

তিনি আত্মরক্ষা করিতেন—কিন্তু ভয়ের জন্য নয়। তিনি ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিতেন—কিন্তু অনুতাপের বশে নয়; তিনি ধন গ্রহণ করিতেন—কিন্তু লোভের প্রভাবে নয় ; তিনি সুখ ভোগ করিতেন—কিন্তু আসক্তির জন্য নয়।

সুতরাং হিন্দুর সনাতন আদর্শে—আত্মরক্ষা, ধর্ম্মের নিয়মপালন ও সুখভোগ—সকলেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই সকল জাগতিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যাবলী হিন্দুর বিচারে গর্হিত ও নিন্দনীয় নহে।

সুখের বিষয়—হিন্দুর এই বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে, হিন্দু সভ্যতার সাংসারিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা হিন্দুর নীতি-শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইত্যাদি সর্ব্ববিধ সমাজ-শাস্ত্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হিন্দুর পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দুর রাসায়নিক জ্ঞান সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। এই উপায়ে হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস ও অতীত গৌরব-কথার আলোচনায় বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয়

জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইতেছে। এই নবযুগের ইতিহাসালোচনায় বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সমুদয় তত্ত্ব আমাদের শিল্পে ও চিত্রকলায় ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নীতিশাস্ত্র ও মূর্ত্তিতত্ত্ব অনুসারে শিল্পিগণ স্বকীয় কারুকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। তাহার নমুনা এবার চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি। চিত্রকরেরা বাস্তব জগৎকে আর উপেক্ষা করিতেছেন না। সুখের কথা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরীরের সৌষ্ঠবকে ক্রমশঃ কম অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, বাহ্য আকৃতির লাবণ্যে ভুলিলেই অন্তঃসৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় না। শারীরিক ও বৈষয়িক লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভারতীয় কলাজগতের সম্যক্ উন্নতি হইবে না।

হিন্দুসমাজ-তত্ত্ব

এত দিনে দেখিতেছি হিন্দুরা নিজেদের সমাজকে গভীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। একচোখো সংস্কারকের দিন আর নাই। এখন শিক্ষিত লোকের মধ্যে হিন্দুসভ্যতার ইতিবৃত্ত খুঁজিবার প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

হিন্দুর রীতিনীতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সকল প্রকার সামাজিক কার্য্যকলাপ নানা বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থায় পড়িয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছে। সেই অবস্থা-সমূহ না জানিয়াই এবং সেই আকারগুলি না বুঝিয়াই আমাদের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এ যাবৎকাল মতামত প্রকাশ করিতেন। সুখের কথা—গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এইরূপ মত প্রচার অনেকটা বন্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে ধীরতা, সংযম ও নিরপেক্ষতা আসিয়াছে। এখন হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শশধর রায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি লেখকগণ নানা দিক হইতে হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশ এবং বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন।

তাঁহাদের সাধু প্রয়াসে ধন-বিজ্ঞানের সাহায্যে, শরীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞানের নানা তথ্য সংগৃহীত

কোন বিষয়ে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী মালমশলা হইতেছে। এখনও পাওয়া যায় নাই। * * * আমাদের উচ্চ-শিক্ষিতগণের একটা ভুল বিশ্বাস আছে যে, আধুনিক ‘প্রাণ-বিজ্ঞানে’র (Biology) কতকগুলি নিয়ম ভারতীয় সমাজ-জীবনের আলোচনায় প্রয়োগ করিতে পারিলেই চূড়ান্ত ‘বৈজ্ঞানিকতা’র পরিচয় দেওয়া হইল। যেন এই উপায়েই হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, বংশতত্ত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়া গেল!

পাঠকগণের নিকট আমাদের নিবেদন—(১) নব্য প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সবই সর্ব্ববাদি-সম্মত নয়। কোন একখানা পাশ্চাত্য মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, প্রায় প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক আছে। পরবর্ত্তী লেখকেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে সেই সমুদয় তর্ক-জাল হইতে মত বাছিয়া লয়েন। (২) প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়ম সমাজ-তত্ত্বের (Sociology) আলোচনায় প্রয়োগ করিতে যাইয়া পণ্ডিতেরা “নানা মুনির নানা মত” প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং কোন বাঙ্গালী লেখকের রচনায় সমাজ-বিজ্ঞানের আড়ম্বর দেখিয়া বেশী চমকাইয়া যাইবেন না, অথবা তাঁহার প্রচারিত মতগুলিকেই ‘বিজ্ঞান-সম্মত’ মনে করিয়া মাথায় তুলিতে বসিবেন না। (৩) ভারত-বর্ষের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে অতি অল্প তথ্যই ঐতিহাসিক ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলে প্রাণ-বিজ্ঞানের দুই চারিটা ‘বুকনি’ লাগাইতে পারিলেই যথার্থ, বিজ্ঞান-সম্মত, নিরপেক্ষ মত প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমাদের যে লেখকের যতখানি বিদ্যার দৌড়, তিনি ততখানি আমাদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন, এইরূপই মনে করা উচিত। এই লেখার জন্যই তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষপাতী বা বিরোধী বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সমাজ-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, রক্ত-মিশ্রণ, আবেষ্টন বা বিশ্বশক্তি (Environment), বংশতত্ত্ব (Heredity) ইত্যাদি বিষয়ক বাঙ্গালা প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে আপনারা মত গঠন করিতে অভ্যস্ত হইবেন। আমরা এই সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

---

* শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের "সঙ্কর জাতি ও তাহার বন্ধ্যাতা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আমাদের জগদীশচন্দ্র

হিন্দুর বিজ্ঞান-চর্চ্চা সার্থক হইয়াছে, বিজ্ঞান শিখিয়া হিন্দু নিজকে ভাল করিয়া চিনিয়াছে—হিন্দু আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চর্চ্চা কেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল অনুষ্ঠানই হিন্দুর স্বতন্ত্রতা-বোধকে জাগরিত ও পুষ্ট করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতের প্রভাবে হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইল না, বরং হিন্দুই পাশ্চাত্য যন্ত্র ও হাতিয়ার-গুলি হিন্দুর আদর্শে হিন্দুর জাতীয় লক্ষ্য অনুসারে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন।

যে দিন বিবেকানন্দ বিদেশে বেদান্তপ্রচার আরম্ভ করিলেন, সে দিন বুঝিলাম কালে ভারতবর্ষের প্রভাব পাশ্চাত্য জগতে বিস্তৃত হইবে। যে দিন দেখিলাম লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'বিশ্বমানব-পরিষদে'র প্রথম সভায় বাঙ্গালীর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির পদে আহুত হইয়াছেন, সে দিন বুঝিলাম হিন্দুর বাণী শুনিবার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ সত্যসত্যই ব্যগ্র। আর আজকাল রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতেছেন, তাহাতেও বুঝিতেছি—ভারতবাসী ইউরোপকে, হিন্দুসাহিত্যবীর বিজ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্য জগৎকে হিন্দুর সনাতন কথা শুনাইতেছেন। এখনও ইউরোপীয়েরা হিন্দুর নিকট অনেক নূতন বিষয় শিখিবার আশা করে।

আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্যজগতের অন্যতম গুরুরূপেই ভারতবাসীর গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, হিন্দুর গৌরব মনে করি।

তিনি অনেক স্বাধীন চিন্তার সুফল সমগ্র সংসারকে দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জগৎ তাঁহার আবিষ্কারসমূহের ফলে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী

হইয়াছে। মানব-জাতিকে তিনি ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা সকলেই তাহা স্বীকার করেন। ভারতবাসিগণও তাহা বুঝিয়া না বুঝিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকে।

কিন্তু আমরা আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিক বা আবিষ্কারক বা চিন্তাবীরমাত্র রূপে দেখি না। তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। আমরা তাঁহাকে হিন্দুর মূলমন্ত্রগুলির প্রচারক স্বরূপ মনে করি। তিনি ভারতের মর্ম্ম-কথা আধুনিক জগৎকে শুনাইতেছেন। বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার চরম উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাণী—হিন্দুর হিন্দুত্ব—তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া বিংশ শতাব্দীর নর-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ এই উপায়ে ভারতের বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা আলোকিত হইল। বৈজ্ঞানিক সংসার এই উপায়ে হিন্দুর ভাবে প্রভাবান্বিত হইল। এই উপায়ে হিন্দুর জাতীয় বিজ্ঞান বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ—সকলেই এক-ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।

এই দিগ্বিজয়ী বীরগণ তাঁহাদের নিজ নিজ উপায়ে ভারতবাসীকে কর্ম্মের পথ দেখাইয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, সাহিত্য-সেবিগণ, ও বিজ্ঞানোপাসকগণ, আর ইউরোপের 'বুলি' আওড়াইবেন না, নিজকে বুঝিতে চেষ্টা করুন—নিজের কথা প্রচার করুন। ভারতের সাধনা ও স্বধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দুর জাতীয় সভ্যতার সনাতন পথ ধরুন। তাহা হইলেই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-মণ্ডলে নবীন শক্তির আবির্ভাব

মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ এক অতি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর আধুনিক ইউরোপীয় তুরস্কজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ কনষ্টান্টিনোপল নগর দখল করেন, এবং পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য প্রভাব বিস্তারের সূত্রপাত হয়। সেই ঘটনায় বিশাল সুপ্রাচীন রোমক-সাম্রাজ্যের পূর্ববিভাগ গ্রীক-সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান সমাজের উপর মুসলমানজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার ফলে গ্রীক-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান সমাজের পণ্ডিত, সাহিত্য-সেবী, অধ্যাপক, দার্শনিক, শিল্পী, কবি, লেখক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ বিদ্যার উপাসকগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে আতিথ্য দান করিয়া দক্ষিণ ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ এবং মধ্য ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও ধনিসম্প্রদায় নিজ নিজ দেশে শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে যত্নবান্ হন।

প্রাচ্য ইউরোপের এক প্রান্তে মুসলমান-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রভাবে এসিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত খৃষ্টান জাতিপুঞ্জের ব্যবসায় ও বাণিজ্য যথেষ্ট বাধা পাইতে থাকে। এসিয়ায় আসিবার জন্য ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ আর ভূমধ্যসাগরের পথ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁহারা নূতন পথ আবিষ্কার করিতে বাধ্য হইলেন। এই পথ বাহির করিতে যাইয়া তাঁহারা একটা নূতন ভূখণ্ডই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ধারা নূতন পথে

প্রবাহিত হইতে লাগিল। এজন্য পুরাতন ব্যবসায়ী জাতিপুঞ্জের পরিবর্ত্তে ইউরোপে নূতন ব্যবসায়ী সমাজ সৃষ্ট হইল। ব্যবসায়-জগতের ভার-কেন্দ্র ভূমধ্যসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানান্তরিত হইল। ভূমধ্য-সাগরের কূলবর্ত্তী জাতিসমূহের পরিবর্ত্তে আটলান্টিক সাগরের সমীপবর্ত্তী দেশসমূহ ব্যবসায়-জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল।

ব্যবসায়ের নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়া নূতন নূতন জাতির অর্থশক্তি পুষ্ট করিয়াছিল। নূতন প্রণালীতে বিদ্যাবিস্তার ও শিক্ষাপ্রচারের প্রভাবে সমাজে নবশক্তি আসিয়াছিল। নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের জনগণের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ নূতন সাহস জাগরিত হইয়াছিল। শিল্প, কারুকার্য্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র—সর্ব্বত্র এক অভিনব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইউরোপের সকল দেশে নূতন চিন্তা-প্রণালী, নূতন শাসন-প্রণালী, নূতন রণ-প্রণালী ও নূতন ধর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্থূলজগৎ, মানসিক-জগৎ, বৈজ্ঞানিক-জগৎ, রাষ্ট্রীয়-জগৎ সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই নূতন নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নূতন নূতন বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপের মানব-জীবন নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে একটা যুগান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকল বিষয়ে নবীন ইউরোপের সূচনা হইয়াছিল।

আমরা দেখিতেছি—আমাদের সম্মুখে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এইরূপ একটা যুগান্তরের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনায় কেবলমাত্র ইউরোপখণ্ডের অভ্যন্তরে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। আমাদের সম্মুখে যে যুগান্তরের উপক্রম হইতেছে, তাহার ফলে ইউরোপ ও এসিয়া—কেবল এই দুই ভূখণ্ড কেন—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এসিয়া—সমগ্র পূর্ব্ব জগৎ এবং সমগ্র পশ্চিম জগৎ—রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনায়

আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতে যে বিপ্লব সংঘটিত হইবে তাহাতে আমেরিকা স্বয়ংই প্রধান উদ্যোক্তা। অধিকন্তু, চীন, জাপান প্রভৃতি এসিয়াখণ্ডের দেশ সকল সেই সময়ে পাশ্চাত্য জগতের নিকট নামে মাত্র পরিচিত ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু আধুনিক জগতে যে বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে চলিল, তাহাতে জাপান ও চীনের হাত অতিশয় প্রবল মাত্রায়ই থাকিবে।

আমরা নূতন-কাটা প্যানামা-খালের প্রভাবে এই যুগান্তরের সম্ভাবনা দেখিতেছি। এ খাল কাটা হইলে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগর যুক্ত হইয়া যাইবে। এই দুই মহাসাগরের উপকূলস্থ দেশসমূহ এবং অভ্যন্তরস্থ দ্বীপসমূহের অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। পৃথিবীর ব্যবসায় ও বাণিজ্য-জগৎ একেবারে ওলট্ পালট্ হইয়া যাইবে। আর্থিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় 'মণ্ডলে'র ভারকেন্দ্র নূতন স্থানে সন্নিবেশিত হইবে। তাহার ফলে মানবজাতির ইতিহাসে সকল বিষয়ে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের আবির্ভাব হইবে। নূতন বিদ্যা, নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্প, নূতন বিচারপ্রণালী, নূতন কর্ম্মপ্রণালী, নূতন জাতি-সমাবেশ, অভিনব রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ—ইত্যাদি নবজগতের সর্ব্ববিধ লক্ষণগুলি দেখা দিবে। মানবসমাজ রূপান্তর গ্রহণ করিবে।

মুসলমানগণের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল-অধিকার এবং আমেরিকাখণ্ডের প্যানামা খাল-কর্ত্তন—এই দুইটি ঘটনা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একই গোষ্ঠীভুক্ত। দুই-ই তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন, দুই-ই জগতের জীবনপ্রবাহে যুগান্তরের প্রবর্ত্তক। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল অধিকারের প্রভাব এখন ঐতিহাসিক মাত্রেই বিবৃত করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও এই

প্রভাব বিশদরূপেই উল্লেখিত হয়। প্যানামার প্রভাব এখন কেবলমাত্র দূরদর্শী রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদেরা এবং সমাজনীতিবিশারদেরাই দেখিতেছেন। এই খালের সুদূরবিস্তৃত ফলাফল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী-প্রচারকই নিঃসন্দেহে কোন কথা বলিতে অসমর্থ। আধুনিক শক্তি-পুঞ্জের সমাবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু'একটা ইঙ্গিত করা যাইতে পারে মাত্র। আমরা বারান্তরে এই প্রভাবের যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করিব।

এবার আমরা আর একটা বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। এই বিষয়টিও প্যানামা খালের প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমরা দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডে নূতন রাষ্ট্রীয় শক্তিসমাবেশের কথা বলিতেছি। এই ভূভাগের জাতিপুঞ্জ ধীরে ধীরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিকাশ লাভ করিতে করিতে বর্ত্তমান কালে অসীম শক্তি লাভ করিয়াছে। এই শক্তি অস্বীকার করিয়া আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশ আর এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারেন না।

আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে পঠিত ভূগোল হইতে দক্ষিণ আমেরিকার বিষয় খুব অল্পই জানি। আমরা সংসারের সংবাদ এত কম রাখি যে, আমেরিকা বলিলে আমরা উত্তর আমেরিকা বুঝিয়া থাকি। আবার উত্তর আমেরিকা বলিলে মার্কিণের যুক্তরাজ্যটুকু মাত্র বুঝি! সেই সব কারণেই দক্ষিণ আমেরিকা আমাদের নিকট এত দিন অবজ্ঞাত রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে নগণ্য নহে—আমরা চক্ষু খুলিলেই তাহা বুঝিতে পারিব। সর্ব্বদিকে তাহার ক্রমিক উন্নতি এবং বিপুল বিস্তৃতি সভ্যজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহার সঙ্গেও বাণিজ্যের সম্বন্ধ পাতাইবার জন্ত মার্কিণের যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী এবং অষ্ট্রীয়া অত্যধিক মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জাপান তাহার পশ্চিম

উপকূলের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য ষ্টীমারের লাইন খুলিয়াছেন। জাপান হইতে চিলিতে ষ্টীমারসহযোগে ডাকে মণিঅর্ডার যাতায়াত করিতেছে।

বাঙ্গালার জমিদারগণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বাঙ্গালার বড় লোকগুলিকে মানুষ করিবার ভার লইতেছেন। তাঁহারা অনুসন্ধানের ফলে বুঝিয়াছেন—বাঙ্গালী জমিদারগণ এখন পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর হন নাই। এজন্য ধনি-সমাজে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। তাঁহারা মনে করেন—গরীব লোকের সঙ্গে বড় লোকের ছেলেরা মিশিতে চায় না। এইজন্য সাধারণ স্কুল-কলেজে তাহারা যাইতে অনিচ্ছুক। অতএব ধনিসমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটা স্বতন্ত্র স্কুল এবং একটা স্বতন্ত্র কলেজ গঠন করা আবশ্যক। সেই সকল বিদ্যালয়ের জন্য বাছাবাছা মাষ্টার, অভিভাবক ও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন; সেই সকল বিদ্যালয়ে ধনি-সমাজের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, পোলাও-কোপ্তা, কায়দা-কানুন, আস্‌বাব, সভ্যতা ইত্যাদির আয়োজন করা হইবে। সেখানে জমিদার-পুত্রেরা মধ্যবিত্ত ও নির্ধন ছাত্রগণ হইতে পৃথক্‌ভাবে ও পৃথক্ আদর্শে লেখা-পড়া, চলা-ফেরা, সৌজন্য-শিষ্টাচার, লেন-দেন, কাজকর্ম্ম ইত্যাদি শিখিবেন। দেশের জনসাধারণ এক জাতি; এবং বড় লোকেরা আর এক জাতি—এই ধারণা ধনী ছাত্রদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রণালীতে দশ বার বৎসর কাল গড়িয়া উঠিলে তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানে বসিবার উপযুক্ত হইবেন!

আমরা মনে করি—জমিদারগণের অবস্থা ভুল বুঝা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থাও উল্টা করা হইতেছে। আমরা এবার বঙ্গীয় ধনিসমাজে বিদ্যাচর্চ্চার প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করিতেছি। বারান্তরে তাঁহাদের জন্য যথোচিত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিব।

প্রথম কথা—আমাদের ধনিসমাজ বাস্তবিকই কি অশিক্ষিত, মূর্খ, চরিত্রহীন? বাঙ্গালার জমিদারেরা কি লেখা পড়া শিখিবার, মানুষ হইবার আদৌ কোন চেষ্টা করেন না? সৎশিক্ষার প্রভাব কি বড় লোকের মধ্যে একেবারেই বিস্তৃত হয় নাই? বিষয়টা গভীরভাবে তলাইয়া দেখা আবশ্যক। এজন্য একটা গোড়ার কথার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন এই যে,—'শিক্ষিত লোক কাহাকে বলে?' 'শিক্ষিত লোকের লক্ষণ কি কি?' 'কোন্ কোন্ চিহ্ন দেখিলে একটা লোককে মানুষ বলিব?' সাধারণ হিসাবে উকীল, ব্যারিষ্টার, মাষ্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, কেরাণী, হাকিম, ইত্যাদি লোকেরা শিক্ষিত। তাঁহারা স্কুলে কলেজে পড়িয়াছেন, বিদেশে গিয়াছেন, সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে পারেন—কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আমরা জানিতে চাহি—এই সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে জমিদার-গণের প্রকৃত পার্থক্য কোথায়? কোন্ কোন্ বিষয়ে এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পয়সাওয়ালা লোক হইতে মহৎ? বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি অনেক দোষই বাঙ্গালীর আছে। এই দোষগুলি কি বড়লোকেরই একচেটিয়া? 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় কি অতিশয় সচ্চরিত্র, নির্লোভ, স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ? যদি দেখিতাম কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তাদের মধ্যে নিষ্কলঙ্কচরিত্রের বিশেষ প্রাধান্য আছে—তাহা হইলে শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'অশিক্ষিত' জনসাধারণ ও 'অর্দ্ধশিক্ষিত' জমিদার-সমাজের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম। যদি বাঙ্গালার হাকিম, উকীল, কেরাণী ও মাষ্টার-কুলের মধ্যে স্বধর্ম্মে অনুরাগ, স্বজাতিবাৎসল্য, স্বদেশপ্রেম অত্যধিক মাত্রায় দেখিতাম, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতাম—তাহা হইলে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণকে এক স্বতন্ত্র জাতি-বা-গোষ্ঠী-ভুক্ত করিতে প্রবৃত্তি জন্মিত, তাহা হইলে অন্যান্য লোকের তুলনায় বড় লোকেরা যে বাস্তবিকই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত তাহা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি দেখিতেছি? চরিত্রের হিসাবে, মনুষ্যত্বের মাপে, পাপপুণ্যের বিচারে, ধর্ম্মরাজ্যের পরীক্ষায় সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজই প্রায় একাকার। কেবল "এ পীঠ আর ও পীঠ" মাত্র। ধনী-নির্ধন, বিদ্বান্-মূর্খ, 'শিক্ষিত'-'অশিক্ষিত'—সকলেই যে বাঙ্গালী সে বাঙ্গালী, 'যে তিমিরে সে তিমিরে'। এই অবস্থায় ঊনিশ বিশ করা বড় কঠিন—এক প্রকার অসম্ভব। 'শিক্ষিত' সমাজ বড় বেশী পুণ্যবান্ নহেন এবং জমিদার-সমাজ বড় বেশী পাপাত্মা নহেন। নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে—তুলনায় বড় লোকেরা সত্যসত্যই বিশেষ পশ্চাতে পড়িয়া নাই।

বরং অনেক বিষয়ে বাঙ্গালার জমিদারেরা যথেষ্ট সৎশিক্ষার, সচ্চরিত্রতার, নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালী সমাজ, বাঙ্গালার গ্র্যাজুয়েটগণ, বঙ্গীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়, বঙ্গের নেতৃগণ বহুবিষয়ে জমিদারদিগের সাধুতা ও মহত্ত্বের নিকট ঋণী।

বড় লোকগুলিকে গালি দেওয়া, তাঁহাদিগকে মূর্খ অসৎ বলা, আজকাল একটা 'ফ্যাশন' দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশ-সেবার কোন্ অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী জমিদার অগ্রসর হন নাই? সমাজ-হিতের কোন্ কর্ম্মে বাঙ্গালার জমিদার বাধা দিয়াছেন? লেখাপড়া-শেখা কোন্ লোকের সঙ্গে 'অশিক্ষিত' জমিদারেরা ধর্ম্মের আন্দোলনে, সমাজের সংস্কারে, বিদ্যার প্রচারে, শিল্পের প্রতিষ্ঠায়, ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তনে এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানের বিস্তারে যোগ দিতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন বা কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন? বড় লোকেরা যে

কেবল সকল সময়ে ‘শিক্ষিত’ সমাজের ইঙ্গিত অনুসারে বা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা নহে। অনেক স্থলেই তাঁহারা নিজে চেষ্টা করিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান-সমাজের রীতি-নীতি, উৎসব-মেলা, কাজকর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কোন তথাকথিত জন-নায়কের অনুরোধ বা উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই অনেক স্থলে তাহারা হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিবিধ অভাব মোচন করিয়া আসিতেছেন। টোল-ও-মক্তব-প্রতিষ্ঠা, পণ্ডিতবিদায়, পুষ্করিণী-খনন, ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচার, দেবালয়-নির্ম্মাণ, পাঁজি-পুঁথি-বিতরণ, অন্নদান, ঔষধদান, জলদান বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণের সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। বাস্তবিক যখন যাহা যাহা সমাজের আবশ্যক হইয়াছে বাঙ্গালার জমিদার-সমাজ অকাতরে তাহা করিয়াছেন। তাঁহারা অনেক স্থলেই মহানুভবতার সহিত প্রকৃত গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। এইজন্য বঙ্গদেশে লোকশিক্ষার বিবিধ ব্যবস্থা, সংস্কৃত-চর্চ্চা, বিদ্যার আদর, স্বধর্ম্মে অনুরাগ এখনও রহিয়া গিয়াছে।

তাহার পর—আধুনিক যুগের নূতন আদর্শ অনুসারে কলেজ-প্রতিষ্ঠা, স্কুল-প্রতিষ্ঠা, পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা, টাউনহল-প্রতিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, তাহাতেই কি জমিদারেরা কম সাহায্য করিয়াছেন? এই যে এত বড় একটা স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার পুষ্টি-সাধনেই কি জমিদার-সমাজের হাত বড় কম? উকীলেরা ও মাষ্টারের বক্তৃতা করিয়াছেন, প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং দেশবাসীকে বুঝাইয়াছেন, স্বীকার করি। জমিদারেরাও কি এইরূপ প্রচারকের কর্ম্ম করিতেছেন না? অধিকন্তু জমিদার-সম্প্রদায় গলাবাজি করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহাদিগকে তহবিল খুলিয়া জলের মত টাকা খরচ করিতেও হইয়াছে এবং হইতেছে। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান,

সম্মিলন, প্রদর্শনী, কংগ্রেস, সংবাদপত্র, বিদেশ-প্রেরণ—কোন্ দিকে তাকাইব!—সর্ব্বত্রই জমিদারের হাত দেখিতেছি। জমিদার কি বাস্তবিকই অশিক্ষিত? জমিদার কি সত্যসত্যই চরিত্রহীন?

এখন কেতাবী-শিক্ষার বিষয় আলোচনা করা যাউক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বলিতেছেন—বঙ্গীয় জমিদারেরা আজকালকার সর্ব্বসাধারণের স্কুল-কলেজে সন্তানগণকে পাঠাইতে বড় বেশী ইচ্ছা করেন না। এইজন্য জমিদার-সমাজে লেখাপড়া বা কেতাবীশিক্ষা প্রবেশ করে নাই। কোন কোন জমিদারও এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসরের ক্যালেণ্ডারগুলি খোলা হউক,—এবং বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের সকল জেলায় যতগুলি স্কুল-পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের রেজিষ্টার-বহিগুলি বাহির করা হউক। আমরা এ বিষয়ে কোন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুমান বা স্মৃতিশক্তি বা মতের উপর নির্ভর করিতে চাহি না। হিসাব করিলে দেখিতে পাই যে, যে মতের উপর দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহার কোন ভিত্তি নাই। আমরা প্রমাণ করিতে পারি, বাঙ্গালার জমিদারেরা নিজ নিজ ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছেন—স্কুলে পাঠাইয়াছেন, কলেজে পড়াইয়াছেন। দেশের মধ্যে বই মুখস্থ করাইবার যতগুলি সুযোগ রহিয়াছে, সকল সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করিতে তাঁহারা যত্নবান্ হইয়াছেন। এমন কোন জমিদারের ঘর নাই যেখানে শিক্ষালাভ বিষয়ে অভিভাবকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন ও পরাঙ্মুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নির্ধন সমাজ লেখাপড়া শিখিবার ও মানুষ হইবার যে যে চেষ্টা করিয়াছেন—বড় লোকের সমাজও ঠিক সেই সেই চেষ্টাই করিয়াছেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জমিদারগণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় প্রকৃত ঔদাসীন্য আমরা খুঁজিয়া পাই না।

তবে—জমিদারেরা মূর্খ অশিক্ষিত, স্কুলে যায় না, কলেজে পড়ে না—এ কথাটা রটিল কেন? তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতেছি। বঙ্গীয় জমিদারগণের তালিকা বাহির করুন। এই সেদিন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের সময়ে গবর্ণমেণ্টের গেজেটে বাঙ্গালার সকল জমিদারের নাম, ধাম, আয়, সদর খাজনা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। সেই তালিকাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, পয়সাওয়ালা বড় লোক আমাদের দেশে বড় বেশী নাই। বহু ব্যক্তিকে জমিদার বলিয়া ঐ সকল তালিকা-ভুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক—বিশেষ স্বচ্ছল অবস্থার লোক নহেন। তাঁহাদিগকে বড় লোক ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে অনেক প্রকৃত বড় লোকেরা বাস্তবিকই কুণ্ঠিত হ'ন, এবং জনসাধারণও তাঁহাদিগকে বড় লোক বলিয়া বিশেষ সম্মান করে না।

যাহা হউক, আমরা যখন একেবারেই দরিদ্র নির্ধন, আমাদের হিসাবে তাঁহারা সকলেই রাজা, মহারাজা, বাবু, জমিদার। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহারা সকলেই 'বড় লোক'। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কত? গেজেট পাঠ করিলে জানা যায়—গবর্ণমেণ্টের খাতায় দুই শ্রেণীর বড় লোক আছেন। এক শ্রেণী কিছু বেশী বড় লোক—তাঁহারা বেশী খাজনা দিয়া থাকেন—তাঁহাদের বড় লাট সাহেবের ভারতীয় সভায় সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার আছে। আর এক শ্রেণী কিছু কম বড় লোক—তাঁহারা কম খাজনা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বঙ্গীয় লাটসভায় সভ্য-নির্ব্বাচনের অধিকার আছে মাত্র। বঙ্গপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এই দুই শ্রেণীর বড় লোকের দ্বারাই

নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর বড় লোকের মোট সংখ্যা প্রায় ছয় শত এবং প্রথম শ্রেণীর বড় লোকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন শত মাত্র, সুতরাং সমগ্র বঙ্গসমাজের মধ্যে জমিদারেরা একেবারেই মুষ্টিমেয়। অতএব স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বড় লোকেরা মুষ্টিমেয় থাকিবেন তাহা কি অন্যায়?

এদিকে পরীক্ষায় পাশ করার নিয়ম বড় লোক, গরীব লোক সকলের পক্ষেই একরূপ। অতএব গড়ে জনসাধারণেরা যেরূপ পাশ হয় বড় লোক সমাজেও সেই রূপ পাশ হইবে। সুতরাং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে বড় লোকের সংখ্যা অতি অল্প থাকিবে, তাহা ত স্বাভাবিক। যদি সাধারণ হিসাবে বড় লোক গরীবলোকের সংখ্যার অনুপাতকরি, তাহা হইলে বাঙ্গালার গ্র্যাজুয়েট সমাজে যদি এক জন মাত্র জমিদারের আসন থাকে তাহা হইলেও দোষের হইবে না। যদি বঙ্গদেশের লেখক, বক্তা, শিল্পী, কবি, গায়ক ইত্যাদি গুণী ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন করিয়া লোক বড়-লোকের গোষ্ঠীভুক্ত থাকেন, তাহা হইলেও অনুপাত রক্ষিত হয়। সমগ্র সমাজের কথা যখন ভাবি—তখন কেতাবী-শিক্ষিত ডিগ্রীধারী বড়লোকদিগের সংখ্যা কম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি না। চারি পাঁচ শত ঘর বড়লোকের মধ্যে কয় জন পাশ-করা লোক থাকিতে পারেন? তাঁহারা জন-সাধারণের পাশ-করা লোকের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন। তাহাতে দুঃখিত বা হতাশ হইবার কারণ কি?

এই গেল কৃতকার্য্য ছাত্রদিগের কথা। তারপর কেতাবী শিক্ষার অপর দিক্ দেখা যাউক। যাহারা অল্প বয়সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দেয়—যাহারা পাশ করিতে পারে না—যাহারা 'স্কুল পার' হয় না—যাহাদের কলেজের দুএক শ্রেণী পর্য্যন্ত দৌড়—যাহারা বি, এ-ফেল—তাহাদের

হিসাব করা যাউক। ভাল করিয়া গণিলে বুঝিতে পারিব—বড় লোক সমাজে ছাত্র, যুবক ও পৌঢ় অনেক 'ফেল্' 'বকাটে' অকর্ম্মণ্য, অকৃতকার্য্য, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে কম অভিজ্ঞ রহিয়াছেন বটে। কিন্তু লেখাপড়ার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা বড় লোকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর এবং গরীবের পক্ষে বিশেষ সুখকর নয়। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও অকর্ম্মণ্যগণের সংখ্যা বড় কম নয়। অবশ্য বেশী ত বটেই—আমরা পরস্পর তুলনায় অনুপাতের কথা বলিতেছি। মনে করুন, ৫০,০০০ সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে ১০০০ অর্থাৎ পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ধনী ছাত্র লেখা পড়া শিখিতেছে। সুতরাং ধনী ছাত্রের মধ্যে যদি ৯০০ লোক অকর্ম্মণ্য অকৃতকার্য্য, অর্দ্ধশিক্ষিত থাকেন। তাহা হইলে গরীব সমাজের মধ্যে সেই অনুপাতে অন্ততঃ ৪৫,০০০ অর্দ্ধশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য লোক থাকিবেন তাহা ত স্বাভাবিক। আমরা বলিতে চাহি—গরীবের মধ্যে এই অনুপাতের অপেক্ষা অনেক বেশী লোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অকৃতকার্য্য ছাত্রগণের তালিকায় বড় লোক অপেক্ষা গরীব লোকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণেই বেশী। চোখ খুলিয়া সমগ্র দেশটাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই জ্ঞানই জন্মিবে।

বড় লোকের সন্তানগণকে মানুষ করিবার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জন সাধারণের অভাবগুলি পূরণ করিবার প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশী। কেতাবী শিক্ষার দিক হইতে বড় লোকের ছেলেরা প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চাদপদ নাই—বরং স্কুল-কলেজে পড়াশুনা সম্বন্ধে জনসাধারণেরই বেশী অভাব।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। গরীবের ছেলেরা একবার 'ফেল্' হইলে, দুই বার ফেল্ হইলে—অনেক সময়ে দশ বার ফেল্ হইলেও হা'ল্ ছাড়ে না। তাহারা স্কুল-কলেজের

বেঞ্চগুলি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে—বিদ্যালয়ের ঘরগুলিকে ভোগ-সত্ত্বের দাবীতে অধিকার করিয়া নূতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে, এবং মাষ্টার মহাশয়গণের সঙ্গে পরামর্শদাতার সম্বন্ধ পাতাইয়া দিন কাটায়! কিন্তু বড় লোকের ছেলেদের এইরূপ অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম-স্বীকার দেখা যায় না। তাহারা দু একবার ধাক্কা খাইয়াই ঘরে আসিয়া বসে। ইহার কারণ কি আর বুঝাইতে হইবে? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রেরা ও অভিভাবকেরা জানে—তাহাদিগকে নিজে খাটিয়া অন্ন সংস্থান করিতে হইবে। সুতরাং স্বাস্থ্য নষ্ট হয় হউক, শরীর ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, চিত্ত অবসন্ন ও স্ফূর্ত্তিহীন হয় হউক—ছেলেগুলিকে পাশ করিতেই হইবে, সার্টিফিকেট আনিতেই হইবে। অতএব ভাল মানুষের মত তাহাদিগকে স্কুল-কলেজে যাওয়া আসা করিতে হয়। বড় লোকেরা ত বড় লোক—তাঁহাদের অন্নচিন্তাই যদি থাকিল তবে আর বড় লোক কিসের? সুতরাং 'ফেল্'-হওয়া ধনী ছাত্রগণের অত্যধিক স্কুল-প্রীতি দেখাইবার প্রয়োজন কৈ?

অতএব বড় বড় লোকেরা স্কুল-কলেজ ভাল বাসে না—আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা স্কুল-কলেজ খুব ভাল বাসে—এ কথাটা সকল দিক হইতেই নিতান্ত অসত্য। ধনি-সমাজ শিক্ষালাভে অমনোযোগী এবং বিদ্যার্জ্জনের সুবিধাগুলি ব্যবহার করিলেন না, এই কথা সর্ব্বাংশে মিথ্যা। আর জন সাধারণ কেতাবী শিক্ষার প্রতি বড় বেশী অনুরাগী এবং বইগুলি মুখস্থ করিবার জন্য বড় বেশী লালায়িত—এই মতও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেতাবী শিক্ষা সম্বন্ধে, বড় লোক আর গরীব লোকের মধ্যে প্রবৃত্তিগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। দুই সমাজেই ফেলও হইয়াছে। সুখ বা দুঃখ দু'এরই এক। দুই সমাজেরই এক অভাব—এক অবস্থা। সমগ্র দেশে একই ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। তাহার প্রতীকার একই

উপায়ে হইবে। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। এবার আমরা চরিত্রের তুলনা করিলাম—কৃতকার্য্য ছাত্রগণের হিসাব করিলাম—ফেল্ হওয়া লোকের সংখ্যা গণিলাম। কোন বিষয়েই বড় লোকের অবস্থা স্বতন্ত্র বুঝিলাম না। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষালাভের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী আমরা নহি।

টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কোনটীই টীচিং বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ ও পাঞ্জাব—এই সকল স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির। তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা ছাত্রদিগের উপর বৎসরান্তে বা দুই বৎসরের পর একটা করিয়া ছাপ মারিয়া দেন মাত্র। ছাত্রদের লেখা-পড়া অন্য লোকের হাতে থাকে। যাঁহারা শিক্ষকতার কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের অনেকেরই পরীক্ষার নিয়ম-কানুনের উপর হাত নাই। শিক্ষক-সমাজে ও পরীক্ষক-সমাজে বিশেষ কোন যোগ নাই।

সুতরাং যাঁহারা কেবলমাত্র কলিকাতা বা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। এই বিষয়ে আমাদের দেশে কোন আলোচনাও হয় নাই। ভারতবর্ষের ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নূতন ছাঁচে ঢালা শিক্ষা-পরিষদের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

আমাদের বিবেচনায় টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখানটা ভালই হইবার সম্ভাবনা। ইহার ব্যবস্থায় ছাত্রেরা বইগুলি ভাল করিয়া পড়িবার ও বুঝিবার সুযোগ পায়। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে 'পড়া' দিতে পারেন এবং তাহাদের পড়া নিতে পারেন। যে ছাত্র বুঝিতে পারিল না, তাহাকে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকে। যতটুকু শিখান হইল ততটুকুই পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার সময়ে ছাত্রের বিদ্যা অনুসারে

প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই কথা খাটে। ফলতঃ, বিদ্যাচর্চ্চাটা টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিলাভ করিয়াই থাকে।

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি নিয়মের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক-জন উপযুক্ত অধ্যাপক বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা দর্শন বা অন্যান্য বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধান ও স্বাধীন গবেষণার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তাহাতে বিদ্যার সীমা বাড়িতে পারে—এবং ছাত্রেরা এই সকল জ্ঞানান্বেষী অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অনুসন্ধিৎসু হইতে পারে। আমরা মনে করি ইহা টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—ইহা একটী গৌণ লাভ মাত্র।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় 'আদর্শ-শিক্ষা-পদ্ধতি' নামক একটী প্রবন্ধে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোন আলোচনা আমরা দেখি নাই। সেই প্রবন্ধে আমরা আমাদের মতের সমর্থন পাইতেছি। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:—"এই পদ্ধতিতে শিক্ষকেরাই পরীক্ষক ভাবে সমাজে গৌরব ও মর্য্যাদা লাভ করিতে থাকেন। যাঁহারা বিদ্যাদান করিতেছেন, তাঁহারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ন্তা এবং ভাগ্য-গঠনের কর্ত্তা হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ইহাতে ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র, ডিগ্রি অথবা আর কোনও সম্মানবিজ্ঞাপক লিপি প্রদানের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির না থাকিয়া প্রকৃত পাঠশালা ও শিক্ষালয়রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে।" এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রভাবে চরিত্রগঠন এবং ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে কি না তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে "বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির না রাখিয়া প্রকৃত শিক্ষা-মন্দিরে—টিচিং ইউনিভার্সিটি'তে—পরিণত করিলে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে,—ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হইবে না।

অবশ্য আমরা সাধারণ পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় হিন্দু-গৃহস্থের উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা আশা করিতেই পারি না। সুতরাং টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে কি না, অথবা দেশের আর্থিক ও অন্যান্য অভাব মোচন হইবে কি না এ যাত্রায় তাহা আলোচনা করিব না। বিদ্যাদানের প্রণালীর উন্নতি হইতে পারে, এবং পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার হইতে পারে—এই দুই কারণেই আমরা টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাতী। সাধারণের অবগতির জন্য টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার নিয়ম সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের 'শিক্ষা-সমালোচনা' গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে পরীক্ষার পদ্ধতি একটী প্রধান জিনিষ। পরীক্ষার নিয়মের ভাল-মন্দের উপর সুশিক্ষা-কুশিক্ষা নির্ভর করে। যদি এইরূপ হয় যে সমস্ত বৎসর লেখা পড়া না করিয়াও শেষ কয়েক মাস অত্যন্ত পরিশ্রম করিলেই বেশ সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহা হইলে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিকে সহায়তা করা হয়।"

"প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষার্থীরা বৎসরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই গৌরব প্রাপ্ত হয়। বৎসরের প্রতিদিন বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী না হইলেও ছাত্রদিগের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এই রীতি বর্জ্জন করা উচিত।"

"যাহাতে ছাত্রেরা প্রতিদিনই প্রতিদিনকার পাঠ সমাধা করিয়া

ফেলিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগকে দৈনিক কার্য্যে মনোযোগী হইতে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তাহাদের চরিত্রের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার অভ্যাস ও স্থির জ্ঞান-পিপাসা সৃষ্টি করিবার জন্য দৈনিক পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।"

"প্রতিদিন ছাত্রদিগের পাঠের ফল নির্দ্ধারণ করিয়া একটী পুস্তকে লিখিয়া রাখা উচিত। বৎসরান্তে এই দৈনিক পরীক্ষার ফলসমূহ যোগ করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। শেষ পরীক্ষায় নিম্ন স্থান অধিকার করিয়াও যদি কোন ছাত্রের সমগ্র বৎসরের কার্য্যফল সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইবার অধিকার দেওয়া উচিত।"

টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে আর একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে।

যে সকল দেশে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেই সকল দেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। কোনও এক নিয়মে সকল বিদ্যালয়ের কাজ চলে না। স্থানীয় সুবিধা-অসুবিধা অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্ব্বাচিত হইতে পারে, এবং ছাত্রগণের বুদ্ধিশক্তি অনুসারে শিখাইবার প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়গুলিকে সকল বিষয়ে শাসন করিবার প্রয়োজন হয় না। টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বকীয় আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলীর নিয়ন্তা মাত্র থাকেন। দেশের আদ্য ও মধ্য পাঠশালাগুলি আপন আপন নিয়মে গড়িয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সাধারণ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে কাশী, আলিগড়, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি টিচিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। আমরা আশা করি, এখন

হইতে বিভিন্ন জেলার নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে যথাসম্ভব স্ব স্ব-প্রধান ভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহার ফলে কোন বিদ্যালয়ে হয় ত শিল্প-শিক্ষার প্রাধান্য থাকিবে—কোন বিদ্যালয়ে হয়ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের প্রাধান্য থাকিবে। টোল, মক্তব, গুরুগৃহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শিক্ষালয় হইতেও ছাত্রগণ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবে। সকল বিদ্যালয়ে একই পুস্তক পড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। ছাত্রেরা গুরুগৃহে বা পাঠশালায় কোন্ নিয়মে কি বিষয় শিখিতেছে—তাহার অনুসন্ধানেরও আবশ্যকতা থাকিবে না; তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হইল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শাসন ও পরিচালনা সম্বন্ধে এই সকল সুবিধা না দিলে নাম মাত্র টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

দেশের লোকেরা আজকাল শিক্ষা-সমস্যা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা বিষয়টা মনোযোগ দিয়া গভীর ভাবে আলোচনা করিবেন। এজন্য সকল সভ্যদেশে ডে-স্কুল, বোর্ডিং-স্কুল, গ্রামার-স্কুল ইত্যাদি পাঠশালাগুলি কত নূতন নূতন 'টাইপ' বা ছাঁচে গড়া হইয়া থাকে তাহার হিসাব করিয়া দেখিবেন।

দোল পূর্ণিমায় সমাজসেবা

বড় দিনের ছুটির পর আর একটা বড় ছুটি সেদিন চৈত্র মাসে পড়িয়াছিল। এক দিকে হিন্দুর দোলপূর্ণিমা আর এক দিকে ইষ্টার। দুই উৎসবের যোগ এক সঙ্গে ঘটিয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের উকীল, হাকীম ইত্যাদি চাকরীজীবী মহলে নিশ্বাস ছাড়িবার অবসর আসিয়াছিল। এই সুযোগে ভারতের স্বদেশ-সেবকগণ তাঁহাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলি সারিয়া লইলেন। ছুটির দিনে লোকে বেড়াইতে যায়—বাহিরে হাওয়া খাইতে যায়—ছেলেরা বন-ভোজনের ব্যবস্থা করে। সকলেই যথাসম্ভব কাজে ঢিল দেয়। আমাদের এরূপ দুরবস্থা যে আমরা সেই খেলিবার দিনগুলিকেই মাতৃপূজার একমাত্র অবসর ভাবে গ্রহণ করি। আমাদের পঞ্জিকায় দেশসেবার আর কোন দিন নাই। আমাদের ধর্ম্মে বার মাসে তের পার্ব্বণ নাই। বৎসরে এক উৎসব, তাহাতেও কোন মতে 'নমো নমো' করিয়া কয়েকটা দুই তিন মিনিট ব্যাপী প্রস্তাব পাঠ। ইহাই আমাদের দেশচর্য্যার একমাত্র অনুষ্ঠান। আর সারা বৎসর স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ আমাদের চিন্তারাজ্যের বহির্ভূত থাকে।

জননী জন্মভূমির প্রতি এরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া, শিক্ষিত ভারতবাসী, আর কতদিন কাটাইবে? এত অর্থসঞ্চয় করিলে, এতবিদ্যা অর্জ্জন করিলে, এত বক্তৃতা করিলে, এত নামদার লোক হইলে—এখনও কি ভোগবাসনা তৃপ্ত হইল না? ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল না? শাস্ত্রে আছে 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে বনগমন করিবে—সংসারত্যাগ করিবে। কিন্তু কৈ? সুখ-শান্তি, মান-মর্য্যাদা সবই ত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ভোগ করিলে।

এখনও কি বিষয়ে অনাসক্তির কাল, বৈরাগ্য ও মুনিবৃত্তি অবলম্বনের সময় আসে নাই ? আপনাদের কেহ কেহ অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিত্ত হইয়া সমাজের সেবায় লাগিয়া যাউন না। বৎসরব্যাপী লোক-সেবা, বৎসরব্যাপী সাহিত্যচর্চ্চা, বৎসরব্যাপী ধর্ম্মপ্রচার, বৎসরব্যাপী শিল্পকর্ম্ম—ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কয়েকজন ভারতবাসী সমগ্র জীবন, সমগ্র উৎসাহ, সমগ্র শক্তি নিয়োগ করুন না।

যাহা হউক—নিতান্ত হতাশ হইবার কারণ নাই। 'শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্'। এ দুঃখের দিনেও একটা সুখের কথা বলিতেছি। আজকালকার ছুটিগুলিতে একটা দুইটা বা দশটা মাত্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়সম্বন্ধে, সাহিত্যসেবীরা সাহিত্যের উন্নতিসম্বন্ধে, রাষ্ট্রনীতির প্রচারকেরা রাষ্ট্রীয় আলোচনায়—এইরূপে নানা শ্রেণীর লোক নানা বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, সাহিত্য, জাতি, রাষ্ট্র, শিল্প, ব্যবসায়,—ইত্যাদি সকল বিষয়েই বহুস্থানে বহুবিধ আন্দোলন এক সঙ্গে চলিতে থাকে। প্রদর্শনী, মেলা, সম্মিলনী, কংগ্রেস, কনফারেন্স, সভা, বক্তৃতা, ইত্যাদি লোক-শিক্ষাবিস্তারোপযোগী অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতের হিন্দু, মুসলমান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন নিজ নিজ অভাব আলোচনা করেন এবং অভাব-পূরণের ব্যবস্থা করেন। জাতীয় জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মময় ও ঘটনাবহুল হইয়াছে।

এবারকার ছুটিতে ভারতবর্ষে অনেকগুলি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। আমরা কয়েকটির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। প্রথমে একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাহি। আমরা হিন্দু—হিন্দুর সংস্কারগুলি আমাদের মজ্জাগত। তাই একটা সংস্কার এই সুযোগে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। সেটা এই। প্রায় সাড়ে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে এই দোল-

পূর্ণিমার মত আর একটি শুভযোগ বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। সেই যোগে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বঙ্গসমাজকে প্রেমের ভাবুকতায় আপ্লুত করিয়াছিলেন। জ্যোতিষীরা বলিতেছেন—সমগ্র হিন্দু নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশ্বাস করেন—এবারকার এই শুভ পূর্ণিমায় সেই মহেন্দ্রক্ষণের পুনরাবর্ত্তনে ভারতসমাজে বিংশ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা আমাদের সংস্কার—আমাদের জাতীয় ধারণা।

সমগ্র হিন্দুসমাজ এখন এক নবভাবে প্রফুল্ল। আন্তরিকতার সহিত বিংশ শতাব্দীর প্রেমাবতার বিজ্ঞানাবতার গৌরাঙ্গের সঙ্গ লইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইতেছে—তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। হিন্দুসমাজের ধুরন্ধরগণ, সমাজ হইতে শীঘ্র শীঘ্র হৃদয়ের আবিলতা এবং চিত্তের সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিবার ব্যবস্থা করুন। সেই জন্য দেশের সর্ব্বত্র সাধু অভিলাষ মাত্রের সম্মান বাড়াইবার আয়োজন করুন—যে অনুষ্ঠানে মহৎ উদ্দেশ্যের কণিকা মাত্র থাকিবে সেই খানেই মস্তক অবনত করিতে সকলকে অভ্যস্ত করুন, সৎপ্রয়াসের নগণ্য আরম্ভকেও শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিন। অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মজীবনের প্রথম সাধন।

আমরা প্রথমে লক্ষ্ণৌ নগরে অনুষ্ঠিত সমগ্র ভারতীয় মোস্‌লেম লীগের কার্য্যের উল্লেখ করিব। মোস্‌লেম লীগ এতদিন ভারতের জাতীয়-মহাসমিতি কংগ্রেসের আদর্শকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এবারকার বৈঠকে তাঁহাদের মতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকেই ভারতীয় মুসলমানগণেরও আদর্শ এবং লক্ষ্য ভাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন

এক্ষণে বাঙ্গালার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এবারকার ঢাকার অনুষ্ঠানটীতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা মাঘ সংখ্যায় বাঁকিপুরের কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলাম :— "কংগ্রেসকে রক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজন। যাঁহারা কিছু কাল হইতে বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা আবার যোগদান করুন এবং নূতন জীবন অর্পণ করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। এই প্রতিষ্ঠানটি তিন দিনের গল্প-গুজবের স্থান বটে, কিন্তু ইহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।"

ভারতীয় কংগ্রেসের বাঙ্গালী সংস্করণ ঢাকার কন্‌ফারেন্সে আমাদের এই ইচ্ছা অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে দেখিতে পাই। কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন স্বনামধন্য স্বদেশসেবক স্বয়ং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত। সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—সমগ্র বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের স্বার্থ-ত্যাগী কর্ম্মোপাসক সমাজসেবকগণ। তাঁহাদের মিলনে ঢাকার বৈঠকটি অতিশয় সফল হইয়াছে। তাহার উপর ঢাকার প্রবীণ উকীল ব্যারিষ্টার ডাক্তার মহাশয়গণ নিজেরা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া সমবেত প্রতিনিধিগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। অতএব একটা বক্তৃতার আসরে এবং কথা-বার্ত্তার বৈঠকে যতদূর সম্ভব,—সকল দিক হইতেই ঢাকার অনুষ্ঠানটিতে আন্তরিকতা, হৃদ্যতা এবং সরস জীবনবত্তা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অধিকন্তু, সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় মামুলি কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণের অংশ বেশী ছিল না। তিনি কতকগুলি কথা মাত্র বলেন নাই। প্রায় সকল কথাই কাজের কথা—কর্ম্মপ্রণালীর কথা। তিনি নিজে যাহা করিতে-ছেন—ভারতবর্ষের অন্যান্য কর্ম্মীরা যাহা করিতেছেন—সেই সমুদয় বিষয়ই স্পষ্টভাবে বিশদরূপে তাঁহার বক্তৃতায় আলোচিত হইয়াছে।

তিনি স্বদেশসেবকগণের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণের ব্রত-উদ্‌যাপনের পন্থাও দেখাইয়া দিয়াছেন। কতকগুলি ফাঁপা অসার ভাবুকতায় তাঁহার বক্তৃতা পূর্ণ নহে। প্রকৃত কর্ম্মীরা তাঁহার উপদেশে অনেক সঙ্কেত পাইবেন। আমরা সকলকে অশ্বিনী বাবুর অভিভাষণটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া কতক অংশ জনসাধারণের গোচর করিতেছি।

আমরা আশা করিয়াছিলাম অশ্বিনী বাবু মাতৃভাষায় তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। তবে তিনি ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় খানিকটা বলিয়াছিলেন। তাহাতেই সমগ্র বক্তৃতার সার কথা নিহিত ছিল—তাহাতেই তিনি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা গত তিন চারি মাস ধরিয়া দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের বিশেষ পরিতোষের কথা এই যে, দেশনায়ক অশ্বিনীকুমারও সেই সকল বিষয়ে আমাদের মতগুলিই সমর্থন করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সম্মিলনগুলির সার্থকতা কিসে বাড়িতে পারে, তাহার আলোচনা তিনি মুখ্যতঃ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা যে সকল কাজের কথায় পরিপূর্ণ তাহা হইতেই সকলে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সগুলির সার্থকতা ও উপকারিতা বাড়াইবার উপায় বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই বিষয়ে আগামী বারে বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

একদিনে এক সঙ্গে নানাস্থানে এতগুলি আন্দোলন—অনেকে এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। তাঁহারা সম্মিলনে সম্মিলনে প্রতিযোগিতা ও

প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া দুঃখিত—তাহাতে প্রত্যেক সম্মিলনের ক্ষতি আশঙ্কা করিতেছেন। আমরা বিবেচনা করি, দেশের সমস্যাগুলি ক্রমশঃ এত গভীর, জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে এখন নানাবিধ সম্মিলন এক সঙ্গে হইতে থাকিবেই। দিনক্ষণ হিসাব করিয়া প্রত্যেক বড় বড় সম্মিলনের জন্য স্বতন্ত্র দিন নির্দ্ধারিত করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

অনেকে বলেন—রাষ্ট্রীয় সম্মিলন আর সাহিত্যসম্মিলন একই স্থানে হওয়া উচিত। অনেকে বলেন—বড় বঙ্গের সাহিত্যসম্মিলন এবং উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের বিভাগীয় সাহিত্য-সম্মিলন একদিনে হওয়া উচিত নয়। আমরা এরূপ মনে করি না। আমরা মনে করি যাঁহারা এরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন তাঁহারা সমাজের সমস্যা ও অভাবগুলি অতি ক্ষুদ্রভাবে দেখিতেছেন—এই পরামর্শ অনুসারে কর্ম্ম করিলে দেশকে ছোট করিয়া রাখা হইবে। শিক্ষা-সম্মিলন, ব্যবসায়-সম্মিলন, শিল্প-সম্মিলন, জাতি বা গোষ্ঠী গত সম্মিলন ইত্যাদি কত বড় বড় অনুষ্ঠান বঙ্গদেশে হইতেছে ও হইবে। সেইগুলির মধ্যে কোন একটির প্রতি বিশেষ সম্মান দেখান বা তাহার জন্য কয়েকটা বড় ছুটি নির্দ্দিষ্ট রাখা এবং সেই দিনে অন্যান্য অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিতে পরামর্শ দেওয়া প্রকৃত দেশহিতৈষীর কার্য্য নয়। আমরা মনে করি, তিলি-সম্মিলনই হউক বা সাহিত্য-সভাই হউক, শিক্ষক-সম্মিলনই হউক বা শিল্প-সম্মিলনই হউক—সকলেরই কেন্দ্র দেশ। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা—সকলেরই গোড়ার কথা দেশ। সুতরাং সকল আন্দোলনই সমান প্রয়োজনীয়—সকলেরই সমান মর্য্যাদা এবং সকলকেই সমান সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। অতএব প্রয়োজন হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে বিভিন্ন সম্মিলন হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইহাতে নানা স্থানে দেশের কর্ম্মকরী শক্তি অতি সত্বরই নানা ভাবে বাড়িতে থাকিবে। আশা করি বিচক্ষণগণ দেশের মুখ চাহিয়া

সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিবেন না—সকল অনুষ্ঠানগুলিকে এক স্থানে একত্রীকৃত করিবার উপদেশ দিবেন না এবং এক সঙ্গে বহু স্থানে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজনে আপত্তি করিবেন না।

এবারকার দৃষ্টান্তে অনেকেরই চোখ ফুটিবে আশা করি। ঢাকার বৈঠক এবং চট্টগ্রামের বৈঠক কোন অংশেই অসম্পূর্ণ হয় নাই—উভয়েই আশাতীত প্রতিনিধি সমাগম হইয়াছিল। অবশ্য অনেকে দুই তীর্থেরই যাত্রী—তাঁহারা একটাতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু ক্ষতি কি? একাধিক তীর্থের যাত্রী অনেকেই থাকিবেন। কিন্তু—সকল তীর্থেরই সমান ফল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সকলেরই কেন্দ্র দেশ। সুতরাং দুঃখের কোন কারণ নাই।

তারপর দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্মিলন এবার বন্ধ রাখা হইল। কর্ত্তারা যে বড় বেশী মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। উত্তরবঙ্গ হইতে একজনমাত্র চট্টগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন—মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির একজন প্রতিনিধি। আর একজন রঙ্গপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে না পাঠাইলে শাখা-পরিষদের মুখ রক্ষা হইত না তাই। কিন্তু সমগ্র উত্তরবঙ্গ একেবারেই যোগ দিতে পারিল না, পশ্চিমবঙ্গই বা কি করিল? কলিকাতার অধিবাসী বা প্রবাসী লোকেরা সর্ব্বত্রই যাইয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা না ধরিলাম। রাঢ় অঞ্চল এবং মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে কয়জন চট্টগ্রামে যাইতে পারিয়াছিলেন? এই সব হইতেই বুঝা উচিত—বড় বঙ্গের সম্মিলনই হউক বা ছোট বঙ্গের সম্মিলনই হউক, যখন যে অঞ্চলে অনুষ্ঠান হইবে তখন সেই অঞ্চলের লোকই বেশী জুটিবে। ইহা স্বাভাবিক। পারিবারিক সুবিধা, অসুবিধা, অর্থব্যয় সবই ভাবা উচিত। তবে কেন অন্যান্য বিভাগীয় অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখি?

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য আমরা সুখী। বিজ্ঞান-সভাটাকে যে কয়েকজন তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞে'র একটা ক্ষুদ্র বৈঠকে পরিণত করা হয় নাই—এজন্য আমরা আরও আনন্দিত। শিল্প, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নানা স্বাধীন অনুসন্ধানের ফল সভাস্থলে বিবৃত হইয়াছিল। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেরই উপকার হইয়াছে—আশা করি প্রবন্ধলেখকগণ শীঘ্রই সেগুলি দেশীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত করিয়া সমস্ত বঙ্গের পাঠকগণকে শিক্ষিত করিবেন। রাজসাহী হইতে অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী চট্টগ্রামের বিজ্ঞান-সভায় কোন প্রবন্ধাদি পাঠাইলেন না কেন? কলিকাতা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সদলবলে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইবেন শুনিয়াছিলাম। তাঁহাদেরই বা আসা হইল না কেন? তাঁহারাও শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদিগের কার্য্যফলগুলি পাইলে বাঙ্গালীর উপকারই হইবে।

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক বৈঠকে হিন্দুর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়াছিলেন। আমরা পদার্থবিজ্ঞানের সভায় রাধাকুমুদ বাবুর বক্তৃতা সমীচিন মনে করিলাম না। যদি ভিন্ন ভিন্ন বৈঠক করিতে হয়,—ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—এই সকল বিজ্ঞানের আলোচনার জন্যও স্বতন্ত্র সময় নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। এবার পদার্থবিজ্ঞানের চাপে—ইতিহাস ও মানব-বিষয়ক সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানই কাণা হইয়াছিল। এজন্য অনেকে দুঃখিত। বিজ্ঞান আমরা চাই, কিন্তু বৈঠকে বৈঠকে দলাদলি চাই না। যখন দিন আসিবে তখ বৈজ্ঞানিক সম্মিলন, ঐতিহাসিক সম্মিলন, সমালোচক সম্মিলন ইত্যাদি

নানাবিধ সম্মিলন হইতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখা, ইতিহাস-শাখা, ইত্যাদি শাখাবিভাগের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রবন্ধগুলি শাখা হিসাবে পড়া উচিত নহে—অন্য কোন নিয়মানুসারে পাঠ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সকল প্রবন্ধই সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে পঠিত হওয়া উচিত। আশা করি কথাটায় সকলে কাণ দিবেন।

তার পর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম্, এ ক্লাস পর্য্যন্ত বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি

সকল বিষয়ই বাঙ্গালা ভাষায় শিখাইবার কথা

আমাদের আশা—অল্প কালের মধ্যেই বাঙ্গালার ছাত্রগণ বঙ্গদেশের উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে যাহা কিছু শিখিবেন—সবই মাতৃভাষায়। অবশ্য আমাদের মাতৃভাষায় এখনও বি এ, বি, এস্‌সি, এম্ এ, এম, এস্‌সি, ক্লাসের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রণীত হয় নাই। কিন্তু এই বইগুলি লেখা বা লেখান বড় বেশী কঠিন ব্যাপার নয়। পরিভাষিক শব্দ লইয়া গোলযোগের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে এখন অনেক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমালোচক, ঐতিহাসিক আছেন—যাঁহারা অন্নবস্ত্রের সুবিধা পাইলে, নিশ্চিন্তভাবে সাহিত্যসেবার সুযোগ পাইলে বৎসরে দুই তিন খানা করিয়া উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে পারেন। আমরা ইহা পূর্ণ অন্তঃকরণে বিশ্বাস করি। অতি অল্প কালের ভিতরই বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদেশীয় ভাষার একাধিপত্য চলিয়া যাইবে—এই আশাও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। এই আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, আশা ও বিশ্বাস সকল সাহিত্য সেবীর অন্তঃকরণে সংক্রামিত করা আবশ্যক। এজন্য আমরা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের "সুযোগ-সৃষ্টি"-নীতি বা 'যোগ্য ব্যক্তিগণের'

অন্নবস্ত্রের অভাবপূরণ করিবার প্রস্তাব গত সংখ্যায় অনুমোদন করিয়াছিলাম। অধ্যাপক সরকার মহাশয় ইহাকে 'সংরক্ষণ'-নীতি বলিয়াছেন। আমরা সুখী হইলাম আমাদের অনুমোদিত প্রস্তাব চট্টগ্রামের সম্মিলনে আলোচিত হইয়াছে। সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ও নিজের বক্তৃতায় এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বিশদরূপে বিবৃত করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অভিভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"বঙ্গসাহিত্য এতকাল কেবল অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান্ লেখক বা কবিসঙ্ঘেই যে কিছু উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের পরিসর, এবং বাঙ্গালীর সংখ্যা তুলনায় এই প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য। * * * আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং পঞ্চাশ বৎসরের কালানুপাতে, এই উন্নতি সামান্য না হইতে পারে—কিন্তু অন্য সভ্য সাহিত্যের তুলনায় যথেষ্ট নহে বলিয়াই মনে করিতে হয়। * * *

আমাদের সন্তানগণের শিক্ষাব্যাপার জাতীয় ভাষার সাহায্যে সংসাধিত হয় না বলিয়া, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি মাতৃভাষার আধার মধ্যে এবং উহার সাহায্যে বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া, আমাদের বাক্-দেবতা এবং জ্ঞান-দেবতা এক নহে বলিয়াই হয় ত, এই নিদারুণ শৈথিল্য এবং বিক্লবতা উপজাত হইতেছে। হয় ত কেন, ইহা নিশ্চিত যে, এই উপসর্গের গতিকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন ইংরাজীভাষার মধ্যে সমর্থ ভাবে চলিতে জানিয়াও; মাতৃভাষার মধ্যে আসিয়া কৌতুককর শিশুতা এবং পঙ্গুতার আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে; এবং আমাদের সাহিত্য-সেবকগণের অধিকাংশ যৌবন-উপযোগী সবলতা এবং সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহা নিদারুণ দুর্দ্দশা এবং দুর্ভাগ্যের

বিষয়। আমরা দিগ্বিজয়ী হইতে জানিয়াও মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া, চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজের সমতুল্য! আমাদের সৌভাগ্য গতিকে এখন এই অভাব নিরাকৃত হইতে চলিয়াছে, বঙ্গভাষা এদেশের উন্নত শিক্ষা-ব্যাপারে রাজকীয় শিক্ষাপরিষদ্ কর্ত্তৃক অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্য এখনো উক্ত নির্দ্ধারণের উপযুক্ত যোগ্যতা দেখাইতে সর্ব্বাংশে সমর্থ নহে—এন্ট্রেন্স কিংবা ইণ্টারমিডিয়েট কিংবা বি-এ ক্লাসের শিক্ষার্থীর উপযোগী গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট নহে! ইংরাজী গ্রন্থনিচয়ের সহিত এক্ষেত্রে তুলনা করিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত! এখন, এই সমস্যা কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? সকল বাঙ্গালীর সমক্ষেই এই সমস্যা উপস্থিত। এই অবস্থায় কেবল মৌলিক প্রতিভার উপরে নির্ভর করিতে যাওয়া, আর আকাশের আকস্মিক হাওয়ার প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকা একই কথা! কবে কোন দৈবানুগৃহীত ব্যক্তি আসিয়া আমাদের এই অভাব পূরণ করিয়া দিবেন—এইরূপ প্রত্যাশা দুরাশা বই নহে! * * *

এই ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালী কেবল একটি মাত্র কার্য্য করিতে পারি, আমাদের ভাষাটীকে অন্ততঃ সমবেত চেষ্টায় অনুশীলন পূর্ব্বক তাহার শক্তিসামর্থ্য এবং যোগ্যতা প্রসারিত করিয়া উন্নত প্রতিভার সহজ-সিদ্ধ কর্ম্ম-ভূমিরূপে পরিণত করিতে পারি। এই সমবেত চেষ্টা-চর্চ্চা এবং সবল সহানুভূতির অভাবে আমাদের সাহিত্য নানাদিকে কাহিল থাকিয়া আসিয়াছে। * * * আমাদের একটা বিশেষ অভাব আছে; মনে হয়, উহাই বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অভাব, সুতরাং এই সম্মিলনের পক্ষে বিশেষ ভাবেই চিন্তনীয়। সম্মিলিত চেষ্টা সহানুভূতি এবং অর্থ সাহায্য ব্যতীত, এই অভাব, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকগণের স্বতঃ-প্রণোদনা হইতে আরও একশত বৎসরে নিরাকৃত হইবার কিছুমাত্র

সম্ভাবনা নাই। * * * এখন পরিষদ্ অন্য দিকেও মনোযোগী হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাহা অনুবাদ। সভ্যসাহিত্যসমূহের বিশিষ্ট ভাব এবং জ্ঞানসম্পত্তির যথাযথ অনুবাদ-গ্রন্থ আমাদের ভাষায় একেবারে নাই। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান শক্তি ইউরোপীয় সাধারণ ভাব-চিন্তার গ্রহণেও কিছুমাত্র যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেছে না—এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মন আপনা আপনি অগ্রগামী হইতেছে না; * * * কোন কালে হইবার সম্ভাবনাও নাই। আমাদের কবি প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ নিজের হৃদয়ের আনন্দ-প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াই চলিবার জন্য বাধ্য; * * * অপরাপর লেখকগণ, প্রায় সকলেই, দেশের প্রচলিত অভিরুচির পরিপোষণ করিয়াই চলিতেছেন। দেশের সাধারণ অভিরুচি কস্মিন্ কালেও অভিনবতা পছন্দ করে না। * * *

এই ক্ষেত্রে কতিপয় যোগ্য ব্যক্তি ব্রতবদ্ধ না হইলে, আপনাদের লেখনীকে সাধারণের রুচিপরিচর্য্যা হইতে স্বাধীন করিয়া চালাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর না হইলে, উন্নত ভাব, চিন্তা কিংবা দেশবিদেশের উন্নত সাহিত্য-আদর্শকে কথায় কার্য্যে (আপাততঃ অরুচিজনক ঔষধের স্বরূপেও) প্রয়োগ করিতে আরম্ভ না করিলে, আমাদের সাহিত্যের ধাত্ কখনো বিশ্বসাহিত্যের সমতা লাভ করার সম্ভাবনা নাই, এই কথা শতবার বলিব। * * অনুবাদ করিতে—, পরকীয় ভাষার ভাব এবং জ্ঞানসম্পত্তিকে অক্ষুণ্ন ভাবে ভাষান্তরিত করিতে হইলেও, এক শ্রেণীর প্রতিভার আবশ্যক। এই প্রতিভার উদ্বোধন এবং উদ্দীপনা করাই আমাদের সমবেত শক্তির কর্ত্তব্য হইবে। * * পরম আবশ্যকীয় যাহা, পুনর্ব্বার বলিব, তাহা অনুবাদ —ইউরোপীয় সদ্গ্রন্থনিচয়ের প্রকৃত শক্তি বঙ্গভাষার মধ্যে গ্রহণ। এই বিষয়ে আপনাদের সমক্ষে স্বতন্ত্র প্রস্তাব উপস্থিত হইবে আশা করি; আমি এই পরিব্যাপক অভিযোগের উল্লেখ মাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হইতেছি।”

মাতৃভাষার অকপট সেবক এবং পরিপোষক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতির আসন হইতে এই "সংরক্ষণ-নীতি"-অবলম্বনবিষয়ক প্রস্তাবেরই মর্ম্মকথা অতি স্পষ্টরূপে সকলকে শুনাইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার বিজ্ঞান-সাহিত্যের অভাব দূর করিবার জন্য বিষয়টা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার প্রবর্ত্তনসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থাতে বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এদেশের লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দশ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করে। তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় চারি আনা আন্দাজ অর্থাৎ লাখের মধ্যে ২৷৷০ জনের বেশী বিজ্ঞানের ধার ধারে না। কাজেই অবশিষ্ট অগণ্য লোকের পক্ষে বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে যদি বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা হইত, তাহা হইলে এতদিনে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে কত ভাল ভাল পুস্তক লিখিত হইত। সেই সকল পুস্তকের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত আরও অনেক লোকে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিত। * * * যদি ইংলণ্ডে সমুদয় বিজ্ঞানচর্চ্চা জাপানীভাষায় হইত, তাহা হইলে সেখানে কি ফ্যারাডে বা ডেভি জন্মিতে পারিত?

যাঁহারা ইংরাজী-ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করেন তাঁহাদের ক্ষতি সামান্য নহে। * * *

যে সকল ভারতীয় ছাত্রের বাল্যকাল ভাষাশিক্ষাতেই অতিবাহিত হয়, পরবর্ত্তীকালে তাহারা মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জাপানী ছাত্রগণকেও ত বিদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিতে হয়। ইহার উত্তরে এই

বলা যায় যে, জাপানীরা আজিও মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। আর জাপানীদের বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালী-দের ইংরাজী শিক্ষা অপেক্ষা অনেক সহজ। তাহারা ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ ও Idiomএর বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। শুধু ইংরাজী ও জার্ম্মান্ ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িয়া তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। * * *

যদি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতবাদ গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া জানিতে হইত, তাহা হইলে ইউরোপের শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা কয়জন লোক সে দিকে অগ্রসর হইতেন? যদি হিব্রু শিখিয়া বাইবেল পড়িতে হইত, তবে পৃথিবীর লক্ষ লোকের মধ্যে কয়জনমাত্র তদ্বিষয়ে সফলকাম হইতেন? আমাদের দেশেও যদি সংস্কৃত না পড়িয়া রামায়ণ ও মহাভারত পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে দেশের কি দারুণ দুর্গতিই না হইত। * * *

যাহা হউক, সম্প্রতি প্রকাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত "তর্কবিজ্ঞান"কে আই, এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পৃথিবীর অপরাপর জাতিগণ কি প্রকারে আপনাদের ভাষার উন্নতি বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমে রুশিয়ার কথা ধরা যাক। রুশিয়ার ভাষা অনার্য্য ভাষা; সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আর্য্যভাষাসমূহের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই, সেই জন্য রুশিয়ার ভাষা শব্দসম্পদে বড়ই দীনা। বেশী দিনের কথা নহে, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়ানগণ মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষার ব্যবহার করিতেন এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রধানতঃ জার্ম্মান্

ভাষা অবলম্বন করিতেন। এমন কি মেণ্ডেলিয়েফ-প্রমুখ মনীষিবর্গ জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় আপনাদের গবেষণার ফলসমূহ প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান প্রচার না করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। এইজন্য মেণ্ডেলিয়েফ তাঁহার অমূল্য রসায়ন-শাস্ত্রের গ্রন্থ রুশিয়ান ভাষায় লিখিলেন। তাহার পর হইতে রুশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ যাবতীয় মৌলিক গবেষণা মাতৃভাষায় প্রচার করিয়া আসিতেছেন;

এসিয়া খণ্ডে যে জাতি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, আমাদের যে তাঁহাদের পথ অনুসরণ করা উচিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জাপানী ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্য জাপানীরা উচ্চ অঙ্গের মৌলিক গবেষণা ইংরাজী ও জার্ম্মান্ ভাষায় প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি কলেজের লেক্‌চার পর্য্যন্ত জাপানী ভাষায় দিতেছেন। জাপানীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদেশীয় ভাষা অবলম্বনপূর্ব্বক বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রথমতঃ অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশীয় ভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চ্চা সমধিক বাঞ্ছনীয়। আশার কথা, হাওয়া ফিরিয়াছে। * *

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেগি প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে শত শত যুবক অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিজ্ঞান-সেবায় ও গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন। আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থার বোধ হয় সময় আসিয়াছে।”

সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি-অবলম্বন-বিষয়ক প্রস্তাব দুই বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত হইয়াছিল :—

"বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।"

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ; সমর্থক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার), শ্রীযুক্ত জলধর সেন (নদীয়া), সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ (বরিশাল)। অনুমোদক— শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ (কলিকাতা)।

ইতিমধ্যে 'রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সমিতি' কবিবর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষোৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ এই সংরক্ষণ-নীতির উদ্দেশ্য অনুসারে বঙ্গভাষায় উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবারকার সম্মিলনে একটা 'সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডার' ও 'সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে 'সাহিত্য-সংরক্ষণ-নীতি' অবলম্বনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও যথাযথ অনুমোদিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের শক্তিবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনোদ্দেশ্যে 'সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডার' নামে একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতেই ইহার জন্য তত্রত্য যোগ্য কৃতী ব্যক্তিগণের সাহায্য লইয়া অনুষ্ঠান আরব্ধ হউক।"

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল্ (চট্টগ্রাম)

সমর্থক— ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)
,, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্, এ, (বরিশাল)
,, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্, এ, বি, এল্ (ফরিদপুর)
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ (বহরমপুর)

'সংরক্ষণ' শব্দটার অর্থ বুঝিতে গোল হইয়াছিল। এজন্য অধ্যাপক সরকার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন—সংরক্ষণের অর্থ কেবল মাত্র রক্ষা করা বা যাহা আছে তাহা বাঁচাইয়া রাখা, জমাইয়া রাখা, উদ্ধার করা বা সংস্কার করিয়া রাখা নহে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির মুদ্রণ ও প্রকাশ, পুরাতন কীর্ত্তির উদ্ধার বা সংস্কার—এই সংরক্ষণের অর্থ নহে। এই 'সংরক্ষণ'-শব্দটি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সুপ্রচলিত protection-নীতির প্রতিশব্দ। অল্প সময়ের ভিতর ছোটকে বড় করিবার উপায়, অনুন্নতকে উন্নতিশীল করিবার প্রণালী, শিশুকে বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট করিবার পন্থা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিয়া নূতন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে বড় হইবার সুযোগ দেওয়া এবং তদুপযোগী করা এই protection-নীতি বা সংরক্ষনীতির অঙ্গীভূত।

যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করা বা যাহা সামান্য ভাবে আছে তাহাকে বিশেষ ভাবে বাড়াইয়া তোলাই সংরক্ষকগণের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য—ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়, বৈষয়িক ও আর্থিক অনুষ্ঠানে এই নীতির ব্যবহার ন্যূনাধিক পরিমাণে পৃথিবীতে অহরহ চলিতেছে। যাঁহারাই স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাকিলে বা ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক সৎপ্রয়াসের উপর নির্ভর করিলে, বা কোন একটা অনুষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দিয়া দেখিতে থাকিলে কার্য্য প্রায়ই অগ্রসর হয় না। এই জন্য সমাজে 'সংরক্ষক' আবির্ভূত হন। তাঁহারা দশজনকে নিজের মতে আনিয়া এবং তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের সাহায্য করিয়া নিজের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম্ম করান। এজন্য সংরক্ষকগণ সেই কর্ম্মীদিগের মানসম্ভ্রম, সুযোগ-সুবিধা, বিষয়-সম্পত্তি, উপাধি, খেতাব ইত্যাদি নানাবিধ অভাব মোচন করিবার ব্যবস্থা

করেন। তাহার ফলে একটা ছোট-খাটো সমাজও অল্পকালের ভিতরেই জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে।

আমাদের বাঙ্গালাসাহিত্যের জন্য এখন এইরূপ ভাবা ও করা প্রয়োজন। বঙ্গভাষায় ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই উচ্চ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রচার করা এবং নানা উপায়ে নানা স্থানে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা এখন সকল সাহিত্য-সেবীরই এক মাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চক্ষু রাখিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সৎপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বা ঐতিহাসিকেরা যাহা যাহা করিতেছেন, কেবল সেইগুলি দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলেও চলিবে না। এখন ধনবান্ সংরক্ষকের প্রয়োজন—যাঁহারা দশজন সাহিত্যসেবীকে অন্য সকল কাজ ছাড়াইতে পারেন; এবং তাঁহাদের সকল উৎসাহ ও শক্তি বাঙ্গালাসাহিত্যের চরম উন্নতির জন্য নিয়োগ করাইতে পারেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য এইরূপে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হইলে, প্রথমতঃ বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণ সাহিত্যসেবার নানাবিধ সুযোগ পাইবেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের শক্তি, সময় ও সাধনা অর্থাভাবে কতকগুলি বাজে কাজে বিক্ষিপ্ত না হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য 'সংরক্ষিত' হইতে পারিবে।

এবারকার সভাপতির অভিভাষণ, পরিশিষ্টাংশ বাদ দিলে, অনেক দিক্ হইতে অতীব মূল্যবান্। জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ সরলস্বভাব অক্ষয়চন্দ্র, বঙ্কিম, ভূদেব, নবীনচন্দ্রের সাহিত্যবন্ধু, রামেন্দ্রসুন্দর, বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যগুরু, আধুনিক নব্যসাহিত্যসেবিগণের পিতামহস্থানীয়। তাঁহার বক্তৃতায় প্রবীণের গাম্ভীর্য্য ও নবীনের ভাবুকতার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়া-ছিল। নবীনেরা আজকাল যাহা ভাবিতেছে তিনি তাহাতেই সায় দিয়া-

ছেন। নব্যবঙ্গের চিন্তা ও কর্ম্মরাশির প্রভাব কদমতলার মৌনী সাহিত্যাচার্য্যকেও আক্রমণ করিয়াছে। আশার কথা বটে। ইহার দ্বারা বঙ্গসমাজের সকল স্তরেই আদর্শের সমতা ও লক্ষ্যের ঐক্য বুঝিতে পারিতেছি। তবে অক্ষয়চন্দ্র অশ্বিনীকুমারের ন্যায় আবার যুবা হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারেন নাই। অশ্বিনীকুমার ঢাকায় যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়—তিনি একজন কর্ম্মী, তিনি অনেকের মধ্যে একজন—তিনি দশজন কর্ম্মবীরের সঙ্গে একত্র যোগে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন—কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তিনি শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিবেন না, নব্য বঙ্গকে—উদীয়মান কর্ম্মিবৃন্দকে—আরও বহুকাল তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবেন। এজন্য তাঁহার অভিভাষণে দৃঢ়তা আছে—কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্কেত-নির্দ্দেশে স্পষ্টতা আছে—বাধাবিঘ্ন দুর্য্যোগ অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার তেজ ও সাহস আছে। অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণে সেই ভবিষ্যতে জ্বলন্ত বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে প্রগাঢ় নির্ভরতা, কার্য্যোপযোগী পাণ্ডিত্য এবং জননায়কোচিত ভার বহন করিবার ক্ষমতা নাই।

তথাপি বলিব—অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণ বাঙ্গালা-সাহিত্যে সবিশেষ আদৃত হইবার যোগ্য। অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতা পাঠ করিলে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার কথা এতই স্পষ্ট ও বিশদ।

তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের কি এই আকাঙ্ক্ষা নহে যে, পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের মধ্যে আমরাও একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইব? কিন্তু আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বর্দ্ধিত করিতে হইবে, আমাদের পরমুখাপেক্ষী থাকিলে চলিবে না। আমরা একটি জাতিতে পরিণত হইবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইব। * * * বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা বঙ্গবিভাগ এবং স্বদেশী আন্দোলনে এমন

শক্তির পরিচয় দিয়াছি যাহা জাতিগঠনেরই সহায়ক। আমরা দেখাইয়াছি, আমাদের মধ্যে—এই বাঙ্গালীর মধ্যে—জীবন আছে, শক্তি আছে, উদ্যম আছে। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, ইচ্ছা করিলে আমরা আমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিব। তাহার জন্য দেবতার সাহায্য আমাদিগকে ভিক্ষা করিতে হইবে না—আমাদের অন্তর-নিহিত দেবত্বকে জাগাইয়া তুলিলেই চলিবে। ইচ্ছাশক্তির বলেই আমরা সমস্ত সামর্থ্য একটি কর্ম্মের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। আমাদের গৌরব আছে—আমরা শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসাগরের বংশধর। সেই জন্যই আমরা কিছু উচ্ছ্বাসপ্রবণ। এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে এখন মাতৃভূমির প্রতি আমাদের অনুরাগের ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়াছে। এই ইচ্ছাশক্তিকেই জাগাইতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহদিগের অন্তর-বহ্নি আমাদের মধ্যে ধূমায়িত হইয়া আছে। একবার তাহা আমরা জ্বালাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ভস্মাকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আবার তাহাই আমাদিগকে জ্বালাইতে হইবে, নিবিতে দিলে চলিবে না। ইহারই উত্তাপে আমরা শৈত্য নিবারণ করিব—ইহারই প্রোজ্জ্বল শিখায় বহু বৎসরের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে! আসুন আমরা আবার আর একটি দীর্ঘ কর্ম্মে ব্রতী হই। কেহ কেহ বলেন আমাদের দেশহিতৈষিণী বৃত্তি এখন মন্দীভূত—আমরা বিগত কর্ম্ম-ক্লান্তিতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। আমি এ কথা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করি না। শৃঙ্খলিত কোন বড় কার্য্যে আমরা এখনও হস্তক্ষেপ করি নাই বলিয়াই আমাদের অকর্ম্মণ্যতা অনুমিত হইতেছে। কিন্তু কার্য্য স্থির হইয়া গেলেই আমরা তাহা গ্রহণ করিব, আমরা তাহা পালন করিব। তখন সকলে দেখিবে আমাদের কার্য্যের ফল কত দূর সন্তোষজনক হইয়াছে।”

কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের বক্তৃতা বুঝিতে হইলে একটু ধীরতা ও চিন্তাশীলতা আবশ্যক। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন নাই। তিনি যে আমাদের পিতামহ-স্থানীয়—তাঁহার বয়সের চাপ যে তিনি অশ্বিনীকুমারের ন্যায় ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সোজা ভাবে ভিতরকার কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিলে প্রবন্ধ জমাট বাঁধিত—কিছু বাজে কথা কমান যাইত, লোকে সহজে বুঝিত—তিনি ধন্য হইতেন—বঙ্গসাহিত্যকে কতদিনে কোন্ দিকে কি উপায়ে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে সে সব কথা সাহিত্যসেবিগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন গোল বাধিত না।

ইহার কারণ বলিতেছি। তাঁহার বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতার আরম্ভকালে বলিয়াছেন "আমি বলিব সাহিত্য সম্বন্ধে, ভাষা সম্বন্ধে, আর আমার চিরদিনের কথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে"। এই ভাবে কথাটা একেবারেই শুষ্ক, নীরস, আবেগশূন্য সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় তিনি যদি গৌরচন্দ্রিকায় বলিতেন,—'আমি বলিব দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে" তাহা হইলে সমস্ত বক্তৃতার মর্ম্মকথাটা বলা হইয়া যাইত, বক্তব্যের সকল অংশের মধ্যে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য বুঝিতে কাহারও কষ্ট কল্পনা করিতে হইত না। কারণ তিনি সত্যসত্যই আগাগোড়া 'দেশে'র কথা প্রচার করিয়াছেন—সমাজের 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা'র উপায় আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রাণের কথা, জীবনবত্তার কথা, সরস সজীবতার কথা, জীবনীশক্তিবিকাশের কথা বাঙ্গালাসাহিত্যে বড় বেশী নাই। এজন্যই আমরা অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণকে এত আদর করিতেছি। এজন্যই আমরা সকলকে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরা ভারতবর্ষে এখন প্রাণের আলোচনা চাই। যাঁহারা হাতে কলমে কাজ করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় বাহির করিতেছেন এবং

যাঁহারা এই বিষয়ে প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি লিখিয়া বাঙ্গালার বৈষয়িক সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম ও চিন্তা প্রাণবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে পরিচালিত হউক। যাঁহারা দেশের অতীত ইতিহাস এবং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা প্রাণবিজ্ঞানের নিয়মগুলি আলোচনা করুন। ইতিহাস-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান প্রাণবিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। যাঁহারা দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য চেষ্টিত, তাঁহারা জীবনীশক্তির ক্রমবিকাশ এবং জীবনীশক্তির রূপপরিবর্ত্তনগুলি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করুন। আর যাঁহারা সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভাবুন কি উপায়ে সাহিত্য গড়িয়া উঠে—সাহিত্যের সঙ্গে কর্ম্মজীবনের কি সম্বন্ধ, সমাজ সাহিত্যকে কতটা নিয়মিত করে। মোট কথা প্রাণের নিয়ম, জীবনবত্তার লক্ষণ, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উপায়, এবং জীবনীশক্তি ঢালিবার প্রণালীগুলি এখন আমাদের সাহিত্যসেবী, শিল্পী, রাষ্ট্র-সেবক, ধর্ম্ম-প্রচারক, ইত্যাদি সকল প্রকার চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরই একমাত্র আবশ্যক হইয়াছে। ইহাই আমাদের বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য।

দেশের অতীত প্রাণ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন—

"এক সময়ে ভারতবর্ষে ঋষিমুনিদের, ব্রাহ্মণদের প্রাণ ছিল। সেই প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহারা দেবভাষায় মন্ত্রশক্তিবলে প্রাণের দেবতার সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এক সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ ছিল। সূর্য্যচন্দ্র-বংশীয়েরা সেই প্রাণের বলে পুরাণ-ইতিহাসে অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। এক সময়ে বৈশ্যের বা পণিকের বা বণিকের প্রাণ ছিল। তাঁহারা সমুদ্র-পথে পোতারোহণে একদিকে ফিনিসিয়া ও বিনিস্ অন্যদিকে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলি বর্ণীয়, চীন, জাপান—এমন কি কাহারও মতে, সুদূর

আমেরিকা পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'তে তে হি নো দিবসা গতাঃ'। সে দিন আর নাই। * * *

"জঙ্গলে, বাঁধে, রেলের পথে যখন দেশের জল বন্ধ হয় নাই, যখন দেশের ছোট বড় সকল লোকে পল্লীগ্রাম প্রিয়তর বলিয়া জানিত, নদীগুলি যখন ভরাট হইয়া উঠে নাই,—তখন দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা মনে করিতে গেলেও চক্ষে জল আসে। তখন দেশে অন্ন ছিল,—দুই বেলা দুই মুঠা মোটাভাত সকলেই খাইতে পাইত; দেশে বিস্তর তন্তুবায় ও জোলা ছিল,—মোটা কাপড় সকলেই পরিতে পাইত। আর ছিল—যাত্রা-গান, কবি, পাঁচালি, কথকতা; কৃত্তিবাসী কাশীদাসী পাঠ হইত। চণ্ডীর গান, পীরের গান গীত হইত, আর হইত পূজা, অর্চ্চনা, আরাধনা, আজান; মেলামহোৎসব নিত্যই হইত; বারয়ারিতে হিন্দু-মুসলমানের সমান উৎসাহ; সর্ব্বত্রই হাসিখুসি, গল্পগুজব, গান-বাজনা। পূর্ব্বাঞ্চলে নদীর উপর সারিগান ও ভাটিয়াল-গান পদ্মার মত ভীষণ নদীর প্রবাহ ছাইয়া রাখিত। * *"

আর এখন?

"এখন দেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে ঐ সকল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, সে উদ্যোগ নাই, সে উৎসাহ নাই; সে প্রাণ নাই; সে স্ফূর্ত্তি নাই; সে প্রফুল্লতা নাই; সে রস নাই—সে সব কিছুই নাই। আছে কেবল জ্ঞানের মায়া; বিজ্ঞানের ছায়া, সভার আড়ম্বর, আর বক্তৃতার বিড়ম্বনা; আছেন—উকীল, মোক্তার, কৌন্‌সিলি ও ডাক্তার। আর আছে বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজের সংবাদপত্র এবং ইংরাজের নকলে দেশের ইতিহাস। অতি বিনীতভাবে কাতরে জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল খোয়াইয়া, এই সকল ছায়া লইয়া কি বাঁচিয়া থাকা যায়? আপনারাই বলুন, এই জরাজীর্ণ দেহে এই বিষম চিন্তার দুরূহ ভার আর কতকাল বহন করিব?

"* * * আপনারা অপূর্ব্ব বাঙ্গালাসাহিত্যের সেবক। সাহিত্য-সেবার উপকরণস্বরূপ হৃদয়ে প্রফুল্লতা আবার আনিতেই হইবে, বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতেই হইবে; আপনারা এই বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন, আমি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া ভগবতী ভারতীর এই পীঠমধ্যে, তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়া আপনাদের জয়গান করি। প্রসীদ ভারতি! ভারত-সন্তানে। * * *

"ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটির পাঁচটিতেই আমরা সাধারণ ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটিতে বাস করিতে পাই না; স্নান, পান ও রন্ধনের জন্য পরিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে, কাজেই প্রচুর সূর্য্যালোক পাই না; মাটি পচায়, গাছ-পচায়, জল-পচায়, পাট-পচায় বায়ু অনেক স্থানে বিষম দূষিত হইয়াছে—বিশুদ্ধ বায়ু আমরা সেবন করিতে পাই না; রোগগ্রস্ত, অন্নাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ কোটি কোটি নরনারীর আর্ত্তরবে আকাশ পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছে, শূন্যপ্রাণে শূন্যপানে চাহিয়াও আমরা সান্ত্বনা পাই না।"

সুতরাং এখনকার কর্ত্তব্য নানা উপায়ে দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা। "দেশে প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে প্রথমে দেশের পরিচয় জানা প্রয়োজন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের পরিচয় পাইয়া তাহার পর দেশের সাধারণ লোকের ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার পর সেই ভাষায় আপনাদের ভাষার শক্তি মিলাইতে পারিলে, তবে দেশে প্রাণ বাড়িবে।" অক্ষয় বাবু আজীবন সাহিত্যসেবী। সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থায় ভাষা ও সাহিত্যের কথাই বেশী শুনিব। ভাষায় কি উপায়ে প্রাণ আসিবে তাহার আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন—

"প্যারীচাঁদের গ্রন্থ-সমালোচনা অবসরে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন,

সেই কথাগুলি ব্যতীত আমি আর একটি কথা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিঃ—সে কথাটি এই যে, ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষার কথিত ভাষার অধিকতর সংস্রব রাখিতে হইবে। সকল বিষয়েই আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, যদি ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ রাখিতে পারি বা আনিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ পাইতে পারি। * * *

"ভাষাও একটি জীবন্ত জিনিষ। কুম্ভকারের প্রতিমার মত বা গৌরীপুরের কলের মত গড়াপেটা পদার্থ নহে। ইহার প্রবাহ বুঝিতে হইবে, গতি বুঝিতে হইবে। স্রোতে স্রোত মিলাইয়া খাল কাটিয়া জল আনিতে পার ভালই, কিন্তু প্রবাহ একটানা গন্তব্য পথে যাইবেই, কোন খানেই দক্ষিণবাহিনীকে উত্তরবাহিনী করিতে পার না। পৃথক বঙ্গলিপি যদি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও ছিল এমন বোধ হয়, তাহা হইলে পৃথক ভাষা তখন ছিল না, মনে করিতে হইবে কি? না, এমন মনে করিতে হইবে যে, সে সময়ে অবশ্য একটি পৃথক বঙ্গভাষা ছিল। তা যদি থাকে, আমরা ত সহস্র বর্ষের পূর্ব্বের বঙ্গভাষার নমুনা পাইয়াছি। প্রবাহ বুঝিবার মত আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে। * * *

"পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ভাষা একটি প্রবাহ। তাহার গতি আছে, বেগ আছে। তাহাতে আবর্ত্ত আছে, প্রপাত আছে; আবার প্রবাহের ধারে ধারে চড়া আছে, শস্য-শ্যামলা ভূমি আছে, কর্কশ-কঠিন পর্ব্বতমালা আছে। ইহার জলরাশি কমে বাড়ে বটে, কিন্তু নিয়তই চলিতেছে—কখন কুলুকুলু রবে, কখন বা গভীর গর্জ্জনে। * * *

"প্রাণ নিম্নস্তরে; নিম্নস্তরের ভাষা আমাদিগকে লইতেই হইবে। লিখিত ভাষা যত কথিত ভাষার সহিত কাছাকাছি থাকিবে, তত লিখিত

ভাষায় জীবন পাওয়া যাইবে। লিখিত ভাষা কথিত ভাষাকে যত দূরে ফেলিয়া রাখিবে, ততই আপনি জীবন হারাইবে, সংস্কৃত, ল্যাটীন, গ্রীকের মত হইবে, নানা গুণ থাকিলেও জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে। এখনও যে সংস্কৃত ভাষায় একটু একটু প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে, সে কেবল দেবারাধনা কোথাও কোথাও একটু জীবিত আছে বলিয়া। ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক; আর ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস সংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার। * * *

"ভারতের প্রাণ—বাঙ্গালার ক্ষীণ প্রাণ—এখন কেবল শস্যোৎপাদক কৃষকের হস্তে। এইজন্য ইংরেজেরা বলেন, ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ঠিক কথা। বিদ্যা সাহেবদের কাছে; ক্ষত্রিয়ত্ব গোরার আছে; কলকারখানা, রেলগাড়ী, ষ্টিমার—সকলই সাহেবদের কাছে। ভারতবাসীর কোন দিকে কিছু যদি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা থাকে ত সে কেবল চাষে। চাষেই আমাদের প্রাণ বাঁচে, চাষেই আমাদের প্রাণ আছে। * *

"সে প্রাণে আড়ম্বর নাই, জয়ডঙ্কা-নাই, সভা নাই, বক্তৃতা নাই, আস্ফালন নাই—এ সকল কিছুই নাই, তবু প্রাণ আছে, উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে; তোমার আমার কাহারও তাহা নাই। ম্লেচ্ছর্ষি জন্ ব্রাইটের মহদ্বাক্য স্মরণ করুন—A nation lives in the cottage কুটীরবাসীকে লইয়াই দেশ বা জাতি।

"ঐ কথা ইংলণ্ডের মনীষি-মুখে। যে ইংলণ্ড প্রতাপে অদ্বিতীয়, শৌর্য্যে বীর্য্যে অসামান্য, সেনাসজ্জে রণতরীসাকল্যে জগতে দুর্দ্ধর্ষ—সেই ইংলণ্ডের জন ব্রাইট বলিতেছেন,—কুটীরবাসী লইয়াই দেশ। আর আমাদের উপরিস্তরে কিছুই নাই বলিলেও চলে, অথচ আমরা নিম্নস্তরের

গৌরব বুঝি না; যেখানে সমাজের প্রাণ, সেখানকার গৌরব বুঝি না। নিম্নস্তরকে অবহেলা করিলে দেশের প্রাণে অবহেলা করা হয়। নিম্নস্তরের ভাষায় অবহেলা, অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা করিলে আমরা সকলেই প্রাণ হারাইব।”

আমাদের প্রাণ যে এখন নিম্নস্তরেই আছে—এ কথা নবীনেরা আজকাল মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত আছেন। সমাজসেবকেরা এবং লোক-শিক্ষাপ্রচারকেরা তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্মের অনুকূল একটা অভিনব যুক্তি পাইলেন। কারণ যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা বুঝিবেন—অক্ষয় বাবু নব্যভারতের লক্ষ্যপ্রচারক বিবেকানন্দের কথাই আর এক ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর অধিকার ঘোষণা এত জোরের সহিত খুব কমই হইয়াছে! এজন্যই বলিতেছিলাম—নবীনে প্রবীণে জীবনের আদর্শ এক হইয়া গিয়াছে। বঙ্গসমাজের সকলে এক কথাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্য সাহিত্যের আসর হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণকে দেশের মাটির দিকে তাকাইবার উপদেশ দিলেন। তাঁহার অভিভাষণের ইহাই বিশেষত্ব।

দেশে প্রাণপ্রতিষ্ঠার আর এক উপায় জাতীয় সাহিত্য। এ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর মত চিরপ্রসিদ্ধ। ‘সনাতনী’র গ্রন্থকার অভিভাষণেও হিন্দুর সনাতন আদর্শেরই প্রচার করিয়াছেন। কথাটা বহুদিন হইতেই প্রচলিত—কিন্তু এখনও বহুকাল প্রচার করিতে হইবে। “আমাদের দুর্দ্দশাই এই—আমরা দূরে পশ্চিম দিকে নিয়তই নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছি, কখন আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের গৃহস্থালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। * * * প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ-ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের আদর্শ যদি সাহিত্যে

প্রতিফলিত না হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে। আমাদের গৃহস্থালির মধ্যে যে শান্তি, যে প্রীতি, দয়ামায়া, দেবভক্তি, আতিথ্য, গুরুজনে ভক্তি আছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হইবে—আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব।”

সুখের কথা—সম্প্রতি আমরা ঘরমুখো হইয়াছি—নিজেদের অতীতকে না ভুলিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। শিক্ষা, শিল্প, সমাজ, ধর্ম্ম—সকল বিষয়েই আমরা নিজেদের বিশেষত্ব ও জাতিগত পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছি। সুতরাং অক্ষয় বাবুর অরণ্যে রোদন হইবে না।

আমরা সাহিত্য-সম্মিলন লইয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। আমাদিগকে এখন সাহিত্য লইয়াই থাকিতে হইবে। অক্ষয়চন্দ্রও অভিভাষণে তাহাই বলিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার যুক্তি সম্পূর্ণরূপে আমাদের যুক্তি নয়। তিনি সাহিত্য-জিনিষটাকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সেরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আমরা সাহিত্যকে আবদ্ধ রাখি না। তবে তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে :—

“সাহিত্য ছাড়া আমাদের আর কি আছে বলুন? আমাদের প্রকৃত পুরাতন সনাতন সমাজ, অসাড়, অনড়, নিষ্কম্প, বিরাট দেহে বিশাল বক্ষে ভর করিয়া জমি লইয়া পড়িয়াছে; আর সেই দেহের উপর তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, নাচিতেছেন—নীতি-সংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক। সংস্কার লইয়া সম্মিলন হয় না। ভাঙ্গার পর গড়া হইলে সংস্কার হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে আমরা ভাঙ্গিতে মজবুত, গঠনে অপটু। সুতরাং সংস্কারক সম্মিলন আমাদের মধ্যে হইতেই পারে না। রাজনীতির আলোচনা দিল্লী প্রভৃতি পীঠস্থান ছাড়া, নির্ব্বাচিত পুরোহিতগণ মধ্যে ব্যতীত সাধারণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। তাহার

পর বিজ্ঞান। আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান-রত্ন আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনের সময় এখনও হয় নাই। আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের একচালার পরচালা হইয়া বিজ্ঞান গত বৎসর হইতে কথঞ্চিৎরূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। সুতরাং এক সাহিত্য-সম্মিলনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।"—

আশা করি, এই কথা গভীর ভাবে বুঝিয়া বাঙ্গালী সুধীগণ বঙ্গসমাজে সাহিত্যসেবার জন্য অসংখ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন; এবং নানা ভাবে বঙ্গজননীর বাণীমূর্ত্তির আরাধনায় ব্যাপৃত হইবেন:—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

আধুনিক চীন

চীনদেশে প্রধানতঃ পাঁচটী জাতির বাস। যাহাদিগকে চীনা বলি, তাহারা দেশের আদিম অধিবাসী নহে। কোথা হইতে তাহারা সর্ব্ব-প্রথম আসে, বলা সুকঠিন। তবে এ কথা ঠিক—তাহারাই সর্ব্বপ্রথম দেশে সুশাসন-প্রণালী, কৃষিকার্য্য, রেশম-প্রস্তুত-করণ প্রভৃতির জ্ঞান আনয়ন করে। চুলের রং কালো ছিল বলিয়া অন্যান্য জাতি তাহাদিগকে 'কৃষ্ণকেশ' বলিয়া অভিহিত করিত। এই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, শ্রমশীল এবং ব্যবসায়ী। রাজনীতি-বিদ্যায়ও এই জাতি অধিকতর অভিজ্ঞ।

দ্বিতীয় জাতি—মাঞ্চু বা পূর্ব্বতাতারী। ইহারা ১৬৪৩ খৃঃ অব্দ হইতে বিগত ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত চীনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের আক্রমণ ও অত্যাচারে চীনারা বহুদিন ধরিয়া বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছে। ইহাদেরই জন্য চীনের সেই প্রসিদ্ধ প্রাচীর। ইহাদের জন্যই চীনের বিগত রাষ্ট্রবিপ্লব।

তৃতীয় জাতি—মঙ্গোলীয়গণ অথবা পশ্চিমতাতারী। কুবলা খাঁর নেতৃত্বে ইহারা চীন দেশ জয় করে। পেকিং নগরে ইহাদের দ্বারাই প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। কুবলা খাঁ বৌদ্ধধর্ম্ম বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে মঙ্গোলীয়গণের আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে উন্নতি লাভ করে। মঙ্গোলীয়গণ আশী বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিল। শেষে বিলাসিতা এবং নানা প্রকার দোষে ১৩৬৬ খৃঃ অব্দে চীনাদিগের দ্বারা সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হয়। এই সময় তাহারা পলাইয়া মাঞ্চুদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তথায় পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান করিতে থাকে।

চতুর্থ জাতি—তিব্বতীয়গণ। হিন্দুদিগের নিকটে যেমন কাশী, মুসলমানদিগের নিকটে যেমন মক্কা, খৃষ্টানদিগের নিকটে যেমন রোম, চীনাদিগের কাছেও লাসা তেমনি। এইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের শিরোমণি বড় লামা বাস করেন। অনুর্ব্বর তিব্বত দেশ সেই জন্যই তাহারা ছাড়িতে চায় না।

পঞ্চম জাতি—মুসলমান। যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া চীনদেশে ইহারা খুব বিখ্যাত। মঙ্গোলীয়গণের দ্বারা ইহাদের ভাগ্য বহুবার বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহু বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, বিভিন্ন সমাজ চীনে বর্ত্তমান। সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

চীনের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের পতাকায় পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচটী জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ পাঁচটী রং গ্রহণ করা হইয়াছে।

সর্ব্বোপরি লাল রং—আঠারটি প্রদেশের অধিবাসী চীনা।

তারপর হলুদ রং —মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী মাঞ্চু বা পূর্ব্বতাতারী।

তারপর নীল রং =মঙ্গোলীয় বা পশ্চিমতাতারী।

তারপর সাদা রং —তিব্বতীয়।

তারপর কালো রং=মুসলমান।

ভারত-রত্ন

১। সমাজসেবক কার্ব্বে

দক্ষিণভারতের কর্ম্মকেন্দ্রসমূহের মধ্যে পুণার 'দাক্ষিণাত্য-শিক্ষা-সমাজ' সুপ্রসিদ্ধ। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, শ্রীযুক্ত বাল্ গঙ্গাধর তিলক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পারঞ্জপ্যে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের জননায়কগণ এই সমাজের সভ্য। ইঁহাদের কীর্ত্তি সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবার আমরা এই শিক্ষা-সমিতির এক জন প্রধান কর্ম্মীকে বঙ্গবাসীর নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছি। তিনি পুণানগরের বিখ্যাত ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক কার্ব্বে। গণিতশাস্ত্র ইঁহার আলোচ্য বিষয়। ফার্গুসন কলেজকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষালয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

বহুকাল হইতে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত যুবক এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অধ্যাপক কার্ব্বে এই স্বার্থত্যাগী শিক্ষকগণের অন্যতম। কলেজে ছাত্র পড়ানই তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। তিনি মহারাষ্ট্রের জন্য বিবিধ পরোপকারবিধায়ক কর্ম্মেও যোগদান করিয়াছেন। কয়েকটী সেবাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরূপেই তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রের লোকেরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে পরোপকারী ব্রাহ্মণ ভাবেই স্মরণ রাখিবে। সম্প্রতি তিনি পুণানগরীর সন্নিকটে একটী "নিষ্কাম-কর্ম্ম-মঠ" স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "হিন্দুবিধবাশ্রম" তাঁহার সাধুজীবনের আর একটী নিদর্শন। আমরা ইহার বিশদ বিবরণ দিতেছি।

উপযুক্ত শিক্ষাদানে হিন্দু বিধবাগণের মানসিক উন্নতি বিধান করা এবং তাহাদিগকে স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে জীবিকা-উপার্জ্জনে সক্ষম করাই "হিন্দু বিধবা-সমিতির" উদ্দেশ্য। যে সমস্ত হিন্দু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদিগের বিধবাগণকেই এই সমিতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, জনসাধারণ ও দানবীর ব্যক্তিবর্গের সাহায্যেই ইহা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গদেশের মহাকালী পাঠশালা বা ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যেরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, এই সমিতির শিক্ষা-প্রণালীও প্রায় তদ্রূপ। ছাত্রীদিগের দৈনন্দিন জীবন কিরূপ ভাবে চলে নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া গেল।

বয়স্কা ছাত্রীরা প্রতিদিন সকালে ৬টার সময়, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কারা ৬½ ঘটিকার সময় শয্যা হইতে উঠে। তার পর প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে নিজের নিজের কিছু গৃহকর্ম্ম সমাধা করে। তদনন্তর স্নান ও বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া প্রত্যেকেই কিছু সময় ধ্যান অথবা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে মন দেয়। তার পর সকালবেলার অবশিষ্ট সময়ে নিজের নিজের পাঠাভ্যাস করে। আহারান্তে বেলা ১১টার সময় স্কুলে যায়। স্কুল বসিবার অগ্রে ১৫ মিনিট কাল ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়—শ্রীমদ্ভাগবৎ, গীতা, অথবা মারাঠী সাধুদিগের জীবন-চরিত হইতে কিছু অংশ পাঠ এবং ব্যাখ্যা করা হয়। বৈকালে অর্দ্ধ ঘণ্টা জলখাবার সময় নির্দ্ধারিত আছে। অপরাহ্ণ ৫টার সময় স্কুল বন্ধ হইলে ছাত্রীগণ কিছু গৃহকার্য্য করিয়া বিশ্রাম করে। তারপর ৬½টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত আশ্রমের মধ্যে ভ্রমণাদি করে। ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে রত থাকে। তার পর তাহারা গীতা-মন্দিরে সমবেত হয়। সেখানে ধর্ম্মসঙ্গীত, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ অথবা ধর্ম্ম-বা-নীতি বিষয়ে বক্তৃতাদি শ্রবণে অতিবাহিত করিয়া রাত্রি ১০টার মধ্যেই

শয়ন করে। স্কুলে প্রথম দুই এক বৎসর লেখাপড়া এবং কিছু অঙ্ক-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রীরা যখন মাতৃভাষায় লিখিত চতুর্থ-ভাগ পুস্তক পড়িতে সক্ষম, তখন তাহাদিগকে কবিতা, ব্যাকরণ এবং কিছু ইতিহাস ও ভূগোল শেখান হয়। উচ্চশ্রেণীতে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রী কিছু কম বুদ্ধিমতী, তাহাদিগকে এমন কোন শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, যাহাতে তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে।

এখানকার গৃহকার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তটী মন্দ নহে। রন্ধন, বয়ন, ধান-ভাঙ্গা, ডাল-ভাঙ্গা, গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রায় সমস্ত কর্ম্মই পর্য্যায়ক্রমে বয়স ও সামর্থ্য অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রীদিগকে শিখিতে হয়।

রবিবারে স্কুল বন্ধ থাকে, এবং সপ্তাহে একদিন অধিকবয়স্কা ছাত্রীরা লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে ডিবেটিং সভায় আলোচনা করেন। ছাত্রীদিগের মধ্যেই একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই স্কুলে শিক্ষা করিয়া ছাত্রীরা মারাঠী সপ্তম মান পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয়। কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা আছে—কালে এখানে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়াইবার বন্দোবস্ত করিবেন। বহুছাত্রী এই স্থান হইতে শিক্ষা করিয়া শিক্ষয়িত্রী বা ধাত্রীর কার্য্য করিতেছেন।

ব্রহ্মচর্য্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দুবিধবাগণকে যতই দেশের কল্যাণকার্য্যে ব্রতী করিয়া তোলা যাইবে, ততই আমরা সবল হইব, ইহা সহজেই অনুমেয়।

২। সাহিত্যপ্রচারক সত্যদেব

বিদেশপ্রত্যাগত যুবকগণ এত দিনে প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের সেবায় নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অনেক স্থলেই

স্বার্থান্বেষীরূপে দেখিয়া আসিতেছি। নিজের মূল্যের কথা না ভাবিয়া পরার্থে জীবন যাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মধ্যে বড় বেশী দেখি নাই। এবারকার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা এক জন স্বার্থত্যাগী প্রকৃত সাহিত্যপ্রচারকের সংবাদ পাইয়াছি। তিনি পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত সত্যদেব।

ইনি আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী গ্র্যাজুয়েট। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি অতি সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তিনি দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ নিতান্তই সামান্য রকমের—স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করেন। সাহিত্যের হিতকল্পে তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ বঙ্গদেশে অনেকেরই অনুকরণীয়। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে তিনি পঞ্জাবে হিন্দী-সাহিত্যের প্রচার করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এক জন সুলেখক ও সুবক্তা। আমেরিকার শিক্ষালয়, সেখানকার শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে ইহার কয়েকখানি হিন্দী পুস্তিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। নিঃস্বার্থ সাহিত্য-সেবার জয় হউক। ভগবানের কৃপায় সত্যদেবের মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

৩। অধ্যাপক শেষাদ্রি

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি মহাশয় ইংরেজীতে কতকগুলি শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুলি মাসে মাসে কলিকাতার 'কলেজিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রবন্ধে স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ও পাঠ্য-

তালিকা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তাশীল প্রবন্ধরাজি দ্বারা আন্ধ্রপ্রদেশের শিক্ষা-জগতে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করিয়া একটি সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবাসীকে সকল বিষয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু তিনি বিবেচনা করেন—হিন্দুর দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রতি ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই—এই জন্য ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষা সরস ও সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সর্ব্বতোভাবে জাতীয় সভ্যতার অনুকূল ও উপযোগী না করিতে পারিলে ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের সুফল ফলিবে না। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে চাহেন।

৪। ব্যবসায়ী চিন্তামণি ঘোষ

প্রয়াগের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস বাঙ্গালীর একটী প্রধান কীর্ত্তি। গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ "পায়োনিয়ার" (The Pioneer) প্রেসের পরেই প্রয়াগে ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের স্থান। ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ বাঙ্গালী এবং প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। এই প্রেস উত্তর ভারতে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রাঙ্কণের জন্য খ্যাত। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই রাজা রবিবর্ম্মার চিত্র আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বহুব্যক্তি, সর্ব্বথা মনোমত না হইলেও, উৎকৃষ্টতরের অভাবে, রবিবর্ম্মার চিত্রই যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করিতেছেন। নীরব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বাবু প্রভূত অর্থব্যয়ে সেই অভাব পরিপূরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি এতদর্থে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড হইতে একজন জার্ম্মান্ চিত্রকর ও একজন জার্ম্মান্ মুদ্রাকর মাসিক সাত

শত টাকা বেতনে আনয়ন করিয়াছেন। ইহারা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পিগণের উৎকৃষ্ট চিত্রনিচয় মুদ্রিত করিতেছেন। এদেশীয় কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত অন্য কোন প্রেসে এমন উচ্চ অঙ্গের মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য হয় কি না সন্দেহ। এই ১৯১৩খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত সুচারু চিত্রাবলী বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়।

"পাণিনি" আফিসের "Sacred Books of the Hindus Series"-এর অমূল্য গ্রন্থরাজি সমস্তই এই প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। বহু-চিত্রশোভিত হিন্দী মাসিক "সরস্বতী" এই প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মেজর বামন দাস বসু মহাশয় গত ১৯১১ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে "Indian Medicinal Plants" নামক ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদাবলীর বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রীয় আলোচনা-মূলক গ্রন্থের জন্য তেরশত চিত্র মুদ্রিত করিতে দিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বাবু স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে এমন দ্রুত কার্য্য চলিতেছে যে, ইতিমধ্যেই অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক চিত্র মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

৫। গণিত-রত্ন গৌরীশঙ্কর

বঙ্গীয় শিক্ষা-জগতের ধুরন্ধর ভারতবিখ্যাত অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে এম্, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রায় ৫০ বৎসর কাল একভাবে জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহার সরলতা, ছাত্র-হিতৈষণা এবং চরিত্রের মহত্ত্বে বঙ্গসমাজ পঞ্চাশ বৎসর গৌরবান্বিত রহিয়াছে। তাঁহার স্বার্থত্যাগ প্রশংসনীয়। যাঁহারা বাঙ্গালীকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দিবার জন্য মহারাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেন, তাঁহারা ঘরের মহাপুরুষগণকে ভুলিয়া

যান। তাঁহাদিগকে অনেক বাঙ্গালী শিক্ষা-প্রচারকের নাম শুনাইতে পারি। আমাদের পরলোকগত শিক্ষাব্রতধারী অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর তাঁহাদের অন্যতম। গৌরীশঙ্কর বাবু অতিশয় নীরবকর্ম্মী ছিলেন। সমাজের কোন আন্দোলনে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায় নাই। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, তাঁহার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসরের ভিতর তিনি একবারও কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য রেলগাড়ীতে চড়েন নাই। তথাপি তিনি জাতীয় উন্নতির আন্দোলনে বিশেষরূপেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ ভারতবর্ষে যে নবযুগের নূতন শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পুষ্টিসাধনের জন্য তাঁহার অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইয়াছিল। তিনি নানাভাবে এই শিক্ষাপরিষদের লালন-পালনে যত্ন করিয়াছেন। বঙ্গজননীর এই নীরব সাধকের মৃত্যুতে বাঙ্গালী একজন প্রকৃত চরিত্রবান্ মনস্বী পুরুষ হারাইলেন।

৬। ছাত্রবন্ধু বিনয়েন্দ্র সেন

একজন চরিত্রবান্ অধ্যাপক তরুণ বয়সে বঙ্গসমাজকে লোকবলে খর্ব্ব করিয়াছেন। তিনি আমাদের ছাত্রবন্ধু দেশহিতৈষী সরলস্বভাব বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। তিনি শেষ বয়সে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু নানাভাবে নানা কর্ম্ম ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া তিনি বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং যুবকসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। নিজ চরিত্রবলে সকলকে তিনি মোহিত করিয়া অনেকের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিলেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

৭। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল

ভগবান্ আমাদের জাতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কেও পরলোকে টানিয়া লইলেন। কবিবর বাঙ্গালীর মায়া কাটিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু

বাঙ্গালী তাঁহাকে ভুলিবে না। বরং বর্ত্তমান সমাজের বংশধরগণ ক্রমশঃ যত বড় হইতে থাকিবে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তত অধিক সম্মান লাভ করিতে থাকিবেন। তিনি বঙ্কিম, ভূদেব, বিবেকানন্দের ন্যায় অমর হইয়াছেন—এই সকল জাতিসংগঠন-কর্ত্তাদের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। 'আমার দেশ' ও 'জন্মভূমি' গীতের রচয়িতা বাঙ্গালাসাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চির প্রসিদ্ধ থাকিবেন—একথা সাহস করিয়া বলিতে বিশেষ ভাবুকতার আবশ্যক হয় না। আমরা বাঙ্গালী জাতিকে গড়িয়া তুলিবার উপকরণ তাঁহার কাব্যনাট্যহাস্য হইতে কতখানি পাইয়াছি তাহা ওজন করা অসম্ভব। এই সকল ব্যাপার গণিয়া মানিয়া স্থির করা যায় না। তবে যে কয়জন চিন্তাবীর আধুনিক বঙ্গসমাজকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীর অন্যতম। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৮। শিক্ষা-প্রচারক মহেন্দ্রপ্রতাপ

হাত্রাসের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর ১৯০৯ সালে বৃন্দাবনে একটী জাতীয়-শিল্প-ও-সাহিত্য-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহার নাম "প্রেম-মহাবিদ্যালয়।"

প্রথমেই বিদ্যালয়টীকে অবৈতনিক দেখিয়া আমাদের মন ভরিয়া গেল। দেশে এরূপ বিদ্যালয় একেবারেই নাই এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। মূল্য-গ্রহণে বিদ্যাদান হিন্দুর সনাতন রীতি নহে—কিন্তু নানা কারণে সেই রীতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পুনরায় সেই রীতির প্রচলন হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এই জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র এবং দেশীয় ধনিসমাজের অনুকরণ-স্থল। তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় সর্ব্বস্ব দান করিয়া

স্বয়ং অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। আধুনিক যুগে এরূপ বৈরাগ্য বিরল।

এই বিদ্যালয় আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায় ইহার আরম্ভ সামান্য ও নগণ্য নহে—ইহার উন্নতিতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ হিন্দুস্থান-বাসীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাকার্য্য যথাসম্ভব মাতৃ-ভাষার সাহায্যেই হইয়া থাকে—(১) সূত্রধরের কাজ, (২) কর্ম্মকারের কাজ, (৩) কুম্ভকারের কাজ, (৪) কার্পেট বুননের কাজ, (৫) ব্যবসায় ও বাণিজ্য, (৬) জরিপ, (৭) অঙ্কন, (৮) রসায়ন-বিজ্ঞান, (৯) অঙ্কশাস্ত্র, (১০) ইতিহাস ও ভূগোল।

বিদ্যালয়ের সম্পর্কে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং প্রেস আছে। এই দুইটীর কাজও মন্দ চলিতেছে না। ইহারা "প্রেম" নামক একখানি দাশাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় নানা প্রবন্ধ থাকে এবং তৎসঙ্গে বিদ্যালয়ে যাহা হইতেছে তাহাও সাধারণেও প্রচার করা হয়। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর স্বয়ং এই পত্রিকার সম্পাদক।

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতির জন্য নানা খেলার বন্দোবস্ত আছে। তাহাদিগের নৈতিক উন্নতি যাহাতে হয় তাহারও চেষ্টা করা হইয়া থাকে। নৈতিক শিক্ষা এমন উদার ভাবে দেওয়া হয়, যাহাতে কোন ধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ না ঘটে।

১৯১১ সালে গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে যুক্তপ্রদেশের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টার উইলসন্ সাহেব এই বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসেন, এবং ইহার কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক বিষয়ে উপদেশ প্রদান

করেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে এই বিদ্যালয়ে কার্পেট-বুননবিভাগ খোলা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালীর নাম দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহাদের একজন আমাদের দানশীল মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত। মহারাজা নিজেও এই বিদ্যালয় দেখিয়া আসিয়াছেন।

বহু বদান্য ব্যক্তির চাঁদা ও এককালীন দানে বিদ্যালয়টী পরিপুষ্ট হইতেছে। কিন্তু এখনও ইহার সম্যক্ উন্নতির জন্য বহু অর্থ চাই। বিজ্ঞানাগার, কারখানা, ছাত্রাবাস, পুস্তকালয়, প্রেস ইত্যাদি বিভাগের আরও উন্নতি করিতে হইবে। এখন দেশের লোকের ইহার দিকে স্নেহ-দৃষ্টি না করিলে চলিবে না। হিন্দীভাষাভাষিগণের পক্ষে এই বিদ্যালয়টী আমাদের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ-স্বরূপ।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ইহাকে শুধু অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন না। ইহার জন্য তিনি দেশে বিদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা জ্ঞান আহরণ করিতেছেন। শিক্ষিত এবং ধনবান্ সকলেরই তাঁহার এই উদার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। আমরা ভগবানের কাছে তাঁহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

৯। বিজ্ঞানবীর ঈশ্বর গুহ

আমরা অবনত জাতি। এজন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে আমরা আবদ্ধ থাকি, নিজের বিদ্যা ও কর্ম্ম-পাণ্ডিত্যের বড়াই করিয়া কাল কাটাই। অপরের মহত্ত্ব স্বীকার করিতে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আমরা একেবারেই অপারগ। উন্নত জাতির চরিত্রে উদারতা ও গুণগ্রাহিতা যথেষ্ট থাকে। আমরা যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই না তাঁহারা সেখানে বীরত্ব, অলোকসামান্য প্রতিভা, ক্রিয়াশক্তির অদ্ভুত

সদ্ব্যবহার লক্ষ্য করিতে পারেন। তাঁহাদের চোখ আছে—আমাদের চোখ নাই।

চোখ থাকিলে আমরা বঙ্গসমাজে অনেক কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরের পরিচয় পাইতাম—বাঙ্গালার নগণ্য পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বল হইতে বহু উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসেবী, বিজ্ঞানসেবী, ব্যবসায়বিৎ, শিল্পকলাবিৎ, পরোপকারী, উন্নতচরিত্র লোককে জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারিতাম। তাহাতে দেশের "লোক"-সংখ্যা সত্যসত্যই বাড়িত—বাঙ্গালী সমাজ মহনীয় হইত—আমরাও ধন্য হইতাম।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর নগরের মোক্তার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ মহাশয়কে আমরা বঙ্গজননীর এইরূপ একটী সুসন্তান মনে করি। বিজ্ঞানের আলোচনায়, ব্যবসারক্ষেত্রে, অধ্যবসায়ে ও কঠোর পরিশ্রম স্বীকারের হিসাবে পৃথিবীর কোন দেশ তাঁহাকে লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারে। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের তিনি একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি একজন যথার্থ পল্লীসেবক। আমরা আমাদের সমাজের জন্য যেরূপ গৃহস্থ চাই তিনি তাহার আদর্শস্বরূপ।

তিনি বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কৃষিকর্ম্মের জন্য ও উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের জন্য অসাধারণ অধ্যবসায়, কষ্টস্বীকার এবং অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাহা দেখিলে অন্যদেশের লোকেরা তাঁহাকে "Martyrs" "Heroes of Science" বা বীজ্ঞান-বীরগণের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহার উদ্ভিদালয়কে বিজ্ঞানসেবীদিগের তীর্থক্ষেত্ররূপে বিবেচনা করিত। উদ্ভিদনিচয় তাঁহার নিকট কেবলমাত্র ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জনের সামগ্রী নহে এই সমুদয়ই তাঁহার ধ্যান আরাধনার বিষয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে হাতে কলমে কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থাকারে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ

করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি মামুলি ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ নহে—স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ-মূলক, স্বাধীন গবেষণাপ্রসূত প্রকৃত মৌলিকগ্রন্থ। আমরা নিম্নে এইগ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

গ্রন্থকার ইউরোপ, আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, মরিশশ, ম্যাডাগাস্কার, সিসেলস, সিংহল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, ট্যাসমাণিয়া, বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভা, নিউকেলিডোনিয়া, পিনাং ও আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপ সমূহ এবং রুষিয়া, তুরস্ক, পারশ্য, আরব, আফগানিস্থান, তিব্বত, চীন, মালয় এবং জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে ন্যূনাধিক বিংশতি-বর্ষকাল পর্য্যন্ত বীজ ও উদ্ভিদাদি আনয়ন ও নিজ উদ্যানে তাহাদের চাষ করিয়া যে ফললাভ এবং উক্ত সকল দেশজ উদ্ভিদ্-সমূহের তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই সারমর্ম্ম হইতে 'উদ্যানতত্ত্ব-বারিধি ও উদ্ভিদের বিশ্বকোষের' পাণ্ডুলেখ্য লিখিত হইয়াছে। লোকে কথায় বলে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই কথাটি সর্ব্বথা প্রযোজ্য অর্থাৎ উদ্যান ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যে তত্ত্ব এ গ্রন্থে নাই, তাহা অন্য কোনও গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে।

এ বিরাট গ্রন্থে উদ্যানকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল উদ্ভিদের আবিষ্কার হইয়াছে, উহাদের প্রায় সকলেরই জন্মস্থান, প্রকৃতি, গুণ, ব্যবহার ও চাষ-প্রণালী সরলভাষায় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, যে সকল উদ্ভিদ-মনুষ্য বা মনুষ্যেতর কোনও প্রাণীর বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতে অসমর্থ এবং কেবল উদ্ভিদের তত্ত্বানুশীলনের জন্যই প্রয়োজনীয়, তাহাদের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তদ্ভিন্ন বিশ্বের যাবতীয় উদ্ভিদেরই চাষ-প্রণালী এবং তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ 'উদ্ভিদের বিশ্বকোষে' স্থান লাভ করিয়াছে।

ফলের বাগানের, ফুলের বাগানের, উদ্যান-শোভাকর ও মূলজ যাবতীয় বৃক্ষাদি এবং বর্ণপ্রদ, সূত্রপ্রদ, মধুপ্রদ, সুগন্ধপ্রদ, কাগজ-প্রস্তুতোপযোগী, তৈলপ্রদ, সাবানপ্রদ, নির্য্যাস ও রবারপ্রসূ, চর্ম্ম পরিষ্কারক এবং খাদ্যপ্রদ সমস্ত উদ্ভিদের বিবরণই উক্ত বিরাটগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাঠজ ফলসমূহের, রেশম কীটের এবং মৎস্য ও মধুমক্ষিকার চাষ-প্রণালীও ইহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও বৈদেশিক ভেষজাদির প্রকৃতি, গুণ, ব্যবহার ও চাষ-প্রণালী সম্বন্ধেও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গো-পালন ও গবাদি পশুর চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যক কোন কথাই বাদ পড়ে নাই।

১০। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ

বঙ্গে হিন্দুসাহিত্যের প্রচার ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা আমাদের এই জাতীয় সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য এখনও সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুবাদ-ব্যাখ্যা-ভাষ্যের যুগই চলিবে। পরে গভীর ও ব্যাপক ভাবে আলোচনা করিবার সময় আসিবে।

হিন্দুর আবিষ্কৃত জ্ঞানগুলি আমাদের প্রাচীন সমাজকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিত, এবং এখন কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কেহ দেখেন নাই। সমগ্র জগতের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান কোন্ স্থান অধিকার করিবে তাহা কেহ দেখেন নাই; এমন কি, বর্ত্তমান কলকারখানা-প্লাবিত যুগে সেই দর্শন-প্রতিষ্ঠিত সমাজ কোন্ আকার ধারণ করিয়া ভবিষ্যতে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার আলোচনায়ও কেহ অগ্রসর হন নাই।

বিবেকানন্দ এ পথ কিছু কিছু দেখাইতেছিলেন—তাঁহার তিরো-ভাবের পর সে পথ কেহ ধরেন নাই।

একজন ধরিতে সমর্থ। তিনি আমাদের ভাবুকশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-বীর দার্শনিকপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আমরা বহুবার বলিয়াছি—"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।"

আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যোন্নতি কামনা করি। আমাদের ভরসা আছে—তিনি বিশ্বচিন্তায় ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের যথার্থ স্থান প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ মনীষিগণের জন্য রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

১১। হিন্দু সাহিত্য প্রচারক শ্রীশচন্দ্র

যে সকল বাঙ্গালী আপনাপন কর্ম্ম শক্তি দ্বারা উত্তর ভারতের জাতীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু তন্মধ্যে একজন। যুক্ত প্রদেশের বহু লোক-হিতকর কর্ম্ম তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া পুষ্ট। সম্প্রতি এলাহাবাদের পাইওনিয়ার নামক ইংরাজ পরিচালিত দৈনিক পত্রিকায় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালী পাঠককে তাঁহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ বাবুর পিতা স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বসু মহাশয় লাহোরে, আমেরিকান মিশন নামক খৃষ্টীয় সমাজ পরিচালিত ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক হইয়া গমন করেন। স্বর্গীয় বসু মহাশয় জীবিতাবস্থায় পাঞ্জাবের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং পাঞ্জাবে লোকহিতকর বহু কীর্ত্তির সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে গঠিত আঞ্জুমান-ই-পাঞ্জাব নামক বিদ্যানুশীলন সমিতি বসু মহাশয় এবং তদানীন্তন লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ লেটনারের (Dr. Leitner) যত্নে ও চেষ্টায়

প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধিবেশন সমূহে বসু মহাশয় গভীর গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইহাকে লোকচক্ষুর গোচর করিয়া তুলিতে বিশেষ সাহায্য করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপনেও বসু মহাশয়ের কম কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই। রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২০এ মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়ক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, তাঁহার শিক্ষার ভার তদীয় মাতার হস্তে পতিত হয়। শ্রীশ বাবুর ছাত্রাবস্থা সবিশেষ উজ্জ্বল ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সসম্মানে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি দুই বৎসর কাল লাহোর জিলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন, এবং এই কর্ম্ম করিতে করিতেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই বৎসরই উক্ত-শিক্ষকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিরাটে ওকালতী করিবার জন্য গমন-করেন। এই স্থানে তিন বৎসর কাল ওকালতী করার পর তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দান করেন। এই সময়ে হিন্দু আইনে পারদর্শিতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরিত হয়। অনেকে ইংরাজী অনুবাদ পাঠেই এ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করেন, কিন্তু শ্রীশ বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি মূল শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সংস্কৃতে জ্ঞানের অল্পতা তাঁহাকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিল। শ্রীশচন্দ্রও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পানিনি ব্যাকরণে বিশেষরূপ বুৎপত্তিলাভ না করিলে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ লাভ দুষ্কর দেখিয়া তিনি পাণিনি ব্যাকরণ পাঠে মনোযোগী হইলেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় ইংরাজীতে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ওকালতী ব্যবসায় পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে দেখিয়া

তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাহা ত্যাগ করিয়া মুন্‌সেফী পদগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট অবসর ছিল না। পাণিনির অনুবাদ কার্য্য অতি মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি কাশীতে আগমন করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পাণিনি ব্যাকরণের সম্পাদন ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ইহার এক অংশ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীশ বাবু একে একে সিদ্ধান্ত কৌমুদী, বেদান্তসূত্র, এবং হিন্দু ধর্ম্ম এবং যোগ সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ ও রচনা করেন। সম্প্রতি পাণিনি আফিস হইতে ইঁহারই সম্পাদনে 'Sacred Books of the Hindus' নামক গ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-পথ সুগম করিয়া দিতেছে। এই গ্রন্থমালায় তিনি ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক্য, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। 'Folk Tales of Hindusthan' নামক রহস্যপূর্ণ পুস্তকের প্রণেতা সেখ চিলি শ্রীশ বাবু ব্যতীত আর কেহই নহেন। 'রিভিউ অফ্ রিভিউজে'র সুবিখ্যাত সম্পাদক মিঃ ষ্টেড এই পুস্তকের সমালোচনা কালে তাহাকে আরব্য উপন্যাসের সমশ্রেণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ বাবুর অপর কীর্ত্তি এলাহাবাদের বালিকাবিদ্যালয়। শ্রীশ বাবুর এলাহাবাদ অবস্থান কালে খৃষ্টীয় মিশন পরিচালিত একটি বালিকাবিদ্যালয় ছিল। বিদ্যাদান অপেক্ষা খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাদের মুখ্য ছিল। ইহা দেখিয়া শ্রীশ বাবু ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেরেলীর সবজজিয়তী কালে তিনি তথায় একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন। না খুঁজিয়া সাধারণের নিকট সম্মানলাভ করা দুর্ঘট, কিন্তু শ্রীশবাবুর বেলা ইহার একটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ১৯০০ সালে গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচন করেন, এবং দিল্লি দরবারে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়া যোগ্য জনের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

দারিদ্র্যনিবারণের উপায়

আমরা দেখিতেছি—ক্রমশঃ আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থার গোড়ার কথাটা ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে কেন? আমাদের ব্যবসায় লুপ্ত হইল কেন? আমাদের কৃষি আর বিশেষ লাভজনক নয় কেন? আমরা আমাদের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যে ও দেশীয় শিল্পে মোচন করিতে পারিতেছি না কেন? আমাদের বৈষয়িক জীবন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে কেন?

আমরা একটা শিশু জাতি নহি। আমাদিগকে ওস্তাদি চালে নাবালক বলিয়া উড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারই নাই, নিতান্ত নির্লজ্জ না হইলে পৃথিবীর কোন লোকই আমাদিগের মুরুব্বি সাজিয়া গায়ে হাত বুলাইতে পারেন না। হস্তপদবিশিষ্ট মানুষের যাহা যাহা থাকা সম্ভব, আমাদের সে সবই ছিল। সেগুলি এখন নাই কেন? ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্র এখন দেখা যায় না কেন? দারিদ্র্যই আমাদের চিরসহায় রহিয়া যাইতেছে কেন?

আমাদের জননায়কগণ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার বেশী চেষ্টা করেন না। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এজন্য ভাবিবারই সময় পান না। শিল্প-সম্মিলন, শিল্প-প্রদর্শনী, সমবায়-ঋণদান-সমিতি, ব্যবসায়-শিক্ষা, ছাত্রগণকে বিদেশে প্রেরণ—ইত্যাদি কতকগুলি জগদ্বিখ্যাত ভাল জিনিষের মধ্যে যাহা কিছু হাতের কাছে আসে তাহাতেই সাময়িক উত্তেজনায় মাতিয়া যাওয়া আমাদের স্বভাব হইয়া পড়িতেছে। সব দিক ভাবিবার বা দূরভবিষ্যৎ বুঝিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার শক্তি আমাদের একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাহিরের

লোকেরা একটা ধুঁয়া ধরাইতেছেন, আমরা অমনি তাহাতে তন্ময় হইয়া যোগ দিতেছি। এজন্যই দুঃখ করিতেছিলাম—বুঝি বা আমরা আমাদের স্বদেশের জাতীয় স্বার্থের প্রতি ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া পড়ি।

পণ্ডিতেরা ধন-বিজ্ঞানের সূত্র আওড়াইয়া যাহাই বলুন না কেন, আমরা বলিব আমাদের আধুনিক দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ এক। সেটি এই যে, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যব্যাপারে আমরা সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। আমরা চীন দেশে মাল পাঠাইব কি সুইজর্লণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ পাতাইব, তাহা আমাদের দেশীয় ব্যবসায়িগণ এবং মহাজনেরা নিজ নিজ প্রকৃত স্বার্থ বুঝিয়া স্থির করিতে পারেন না। আমরা ইংলণ্ড হইতে আমাদের অভাব মোচন করিবার জন্য দ্রব্য আমদানী করিব কি যবদ্বীপ হইতে জিনিষপত্র আনিব, তাহাও আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা করিতে পারি না। কেবল আমদানী-রপ্তানীই নহে—সকল বিষয়েই ভারতবাসীর বৈষয়িক প্রচেষ্টাগুলি নানা ভাবে বাধাবিঘ্ন পাইয়া থাকে। সেই গুলি ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন। সেরূপ অসাধ্যসাধন আমরা করিতে পারি নাই। এজন্যই আমাদের শিল্প-ব্যবসায়গুলি পরহস্তগত। এজন্যই আজ আমাদের কাপড় যোগাইতেছেন বিদেশের তাঁতীরা, ঔষধ দিতেছেন বিদেশের চিকিৎসকগণ, রেশম রঙাইতেছেন বিদেশের রংরেজেরা। এজন্যই আমাদের দেশে কৃষি ছাড়া আর কোন সম্বল নাই। আর যতটুকু কৃষিকার্য্য হয়, তাহাতেও আমাদের জনগণের পেট ভরিবার জন্য শস্য উৎপন্ন হয় না। আমাদের কৃষকেরা বিদেশীয় শিল্পের জন্য "কাঁচা মাল" তৈয়ারী করে মাত্র। বিদেশীয় সমাজগুলির ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতবর্ষ একটা বারোয়ারী কৃষি-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ভারত-

বাসীর নিজের কোন লক্ষ্য নাই। বিদেশীয় সমাজসমূহ ভারতবাসীকে নানা ভাবে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে।

সুতরাং বিদেশের বণিক্-সমাজগুলির আধিপত্য কমানই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বিদেশের তাঁতে কাপড় প্রস্তুত হইবার জন্যই এদেশে পাট প্রস্তুত করিব, ততদিন আমাদের আর্থিক উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যতদিন আমরা বিদেশীয় ডাক্তারখানা ও ভৈষজ্যালয়গুলির ইঙ্গিতক্রমে আমাদের গাছগাছড়ার চাষ করিব, ততদিন আমাদের পেট দু'বেলা না ভরিলেও ভরিতে পারে।

এই আধিপত্য কি উপায়ে কাটাইয়া উঠা যায় তাহাই সকল দেশহিতেচ্ছুর একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। আমাদের অর্থ-শক্তি, ব্যবসায়-শক্তি ও শিল্প-নৈপুণ্য কি উপায়ে বিদেশীয় শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং ধনকুবের-গণের প্রভাব হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনাই সকল সুধীজনের একমাত্র কর্ত্তব্য। ব্যাপার বড় সহজ নয়। বহুকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী-সমাজগুলি আমাদের দেশের নগণ্য পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের প্রভাব কমাইতে হইবে—তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে—তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়া আমাদের বৈষয়িক প্রচেষ্টাগুলি চালাইতে হইবে। অঘটন ঘটাইবার উপযুক্ত শক্তি না থাকিলে এ কার্য্য সাধিত হইবে না। সুতরাং সাধারণ ধন-বিজ্ঞানের নিয়মে আর এ সমস্যার কিনারা পাওয়া যাইবে না।

তথাকথিত ধন-বিজ্ঞান

মামুলি ধন-বিজ্ঞানের নিয়ম দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় খাটে। অস্বাভাবিক অবস্থায়, ব্যাধির অবস্থায় অন্যবিধ নিয়ম-কানুনের আবশ্যক। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় বা জার্ম্মাণিতে জনগণ এবং গণপতিগণ অন্যান্য

দেশের বাজারগুলি করতলগত করিবার জন্যই চেষ্টিত। পৃথিবীর কত অংশ তাঁহাদের বাণিজ্যবশে আসিবে এই হিসাবই তাঁহাদের প্রধান হিসাব। আমাদের ত সর্ব্ব অঙ্গেই ঘা—আমরা নিজের অভাবই কোন মতে মোচন করিতে পারিতেছি না—দেশবিদেশের বাণিজ্য দখল করা ত দূরের কথা। আমরা চাই—কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে, আত্মরক্ষা করিতে। আত্মরক্ষার ধন-বিজ্ঞান এক জিনিষ, দিগ্বিজয়ের ধন-বিজ্ঞান আর এক জিনিষ; তাহা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? কাজেই 'অবাধ বাণিজ্যে'র পক্ষে কয়টা অনুকুল কথা বলা যায়, সেগুলি আমরা শুনিয়া ও বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বড় বেশী কিছু করিতে পারিব না। সমবায়-ঋণ-দানমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া জার্ম্মাণির রাইফিসন মহোদয় তাঁহাদের কৃষককুলের এবং শ্রমজীবিগণের রং ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাহা জানিয়া আমরা কি করিব? কারণ তাহাদের চাষের উন্নতি করিয়া তাহারা স্বদেশের শিল্পকেই আত্মনির্ভর করিতেছে। নিজেদের অভাব ও অসম্পূর্ণতা বুঝিয়া সেগুলি নিবারণের জন্য কৃষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় বল,—সকল বিষয়ের যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছে। অন্য কোন দেশকে বড় করিবার জন্য অথবা অন্য কোন সমাজের ঋণ শোধ করিবার জন্য তাহারা লাঙ্গল ধরে না, জমিতে উন্নত সার লাগায় না, দলবদ্ধভাবে কেনা বেচা করে না বা চরকা ব্যবহার করে না। কাজেই তাহাদের পণ্ডিতেরা ও চিন্তাশীল লোকেরা নিজ অবস্থার উপযোগী আর্থিক নিয়ম, শিল্পপ্রতিষ্ঠার নিয়ম, ধার দেওয়া ও ধার লওয়ার নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তোতাপাখীর মত সেগুলি মুখস্থ করিয়া মরি কেন? *সেই নিয়মগুলিকে ঋগ্বেদের সূত্রস্বরূপ সকল ব্যাধি-নিবারণের একমাত্র ঔষধ মনে করি কেন?*

আমরা যদি আমাদের ঘরের শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য কৃষি-ক্ষেত্রে

কর্ম্ম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কৃষকগণের জন্য এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদের রং বদলাইয়া ফেলিতে পারিতাম। ঘোড়াকে বেশী হৃষ্ট পুষ্ট না করিলে সে বেশী ভার বহিতে পারে না। এই জন্যই তাহার খোরাকের দিকে প্রভুর দৃষ্টি থাকে। ঘোড়ার তাহাতে সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধ হইল বটে—কিন্তু অন্যান্য ভারবাহী জীবের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন জাতিগত পার্থক্য সৃষ্ট হইল না। আমরাও না হয় আমাদের দু'চার ঘর কৃষককে অন্নবস্ত্রের সাহায্য করিয়া, অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া, তাহাদের মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিয়া চাষ-আবাদের সহায় হইলাম। কিন্তু তাহাদের এই সাময়িক সুখভোগ এবং স্বচ্ছলতার চরম লক্ষ্য কি ? আমরা এই উপায়ে প্রকৃতপক্ষে বিদেশীয় শিল্পেরই উন্নতি-বিধানে সহায় হইতেছি, বিদেশীয় সমাজগুলিকেই অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিবার চেষ্টা করিতেছি।

এই জন্য জার্ম্মাণিতে যে নিয়মে সমাজে আশার কথা প্রচারিত হয় এবং জীবনবত্তার লক্ষণ দেখা যায়, সেই নিয়মে আমাদের সমাজে বড় বেশী উন্নতি দেখা যায় না। কোন কোন অঙ্গের সাময়িক কিছু উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ীজীবন-বিকাশের সুযোগ সৃষ্ট হয় না।

বৈষয়িক জীবনের গোড়ার কথা—সংরক্ষণ

এইরূপে অনেক তথাকথিত ভাল ব্যবস্থাও আমাদের প্রয়োজনানুসারে অনুকূল না হইতে পারে। লোকে যাহাকে সাধারণতঃ সস্তা বলে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের হিসাবে মহার্ঘ বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই ধন-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আমাদের লাভ নাই। আমাদিগকে এখন অন্য বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। খাঁটি ধন-বিজ্ঞানের স্থান এ স্থলে বড় সঙ্কীর্ণ। হাতের তাঁত ভাল কি এঞ্জিন-

পরিচালিত কলকারখানা ভাল, এ সব আলোচনা এখন বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবেই চলিতে থাকুক। শিল্প-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা এবং যৌথ-ঋণদানমণ্ডলীর উপকারিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিগণের মহলে আলোচিত হউক। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ কি শিল্পপ্রধান দেশ,—ভারতবর্ষ বিদেশের নিকট অনেক ধন ধার লইয়াছে—এজন্য তাহাকে বহুকাল ধার শোধ করিবার জন্য আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী করিতে হইবে—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় প্রকৃত কর্ম্মীদের কার্য্য বেশী অগ্রসর হইবে না। মামুলি ধন-বিজ্ঞানের উপদেশে আমাদিগকে হতাশ করিয়া তুলিবে মাত্র। তবে আমাদের আর এক প্রকার ধন-বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে বটে—তাহা ব্যাধিগ্রস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, সমাজের উদ্ধারোপযোগী ধন-বিজ্ঞান। সুতরাং ধন-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মের উপর নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখন অন্যবিধ নিয়ম পালন করিতে হইবে। সে সকল নিয়ম আর একটা বড় বিজ্ঞানের এলাকাধীন। ধন-বিজ্ঞানকে তাহার অন্যতম সহযোগিরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে মাত্র।

সেটি শক্তি-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, জাতি-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান। এখন আমাদিগকে কতকগুলি বনিয়াদি শক্তির স্থানে নূতন নূতন কতকগুলি শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্রে অল্পমাত্র জীবনীশক্তির স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। তাহাকে তাহার প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া নানা উপায়ে জাগাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

একটা ক্ষুদ্র স্বল্পপ্রাণ ব্যবসায়ী জাতিকে জগতের বৈষয়িক ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিতে হইবে। সুতরাং এখন সকল প্রকার বিপক্ষ শক্তিসমূহ হইতে স্বদেশীয় কৃষি ও শিল্পের প্রাণ রক্ষা করা,

আমাদের নিজ নিজ শক্তিগুলিকে বাড়াইবার জন্য যথাসম্ভব সুযোগ সৃষ্টি করা, বিদেশীয় প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া স্বকীয় বৈষয়িক জীবনের স্বাধীন বিকাশের জন্য পথ খুলিয়া দেওয়াই আমাদের শিল্প-প্রচারকগণের একমাত্র সাধনা হওয়া কর্ত্তব্য। ধন-বিজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার নিয়ম আলোচনা করাই আমাদের একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। ধনের কথা না ভাবিয়া প্রাণের কথা ভাব। তাহা হইলেই সকল কথা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে। ইহাই আমাদের গোড়ার কথা।

বিলাস-বর্জ্জন

আমাদের সন্দেহ এই যে, আমরা প্রাণের কথা এবং শক্তিবিকাশের কথা আজকাল যেন কিছু কম আলোচনা করিতেছি। এজন্য আমাদের বৈষয়িক আন্দোলনের অভ্যন্তরে জীবন রক্ষা করিবার প্রণালী এবং শিল্পসংরক্ষণ-নীতির কার্য্য কম হইতেছে। বিদেশীয় বণিক্‌সমাজগুলির আধিপত্য খর্ব্ব করা এবং স্বদেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়গুলির জন্য নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার কথা আমরা আজকাল যেন কিছু কিছু ভুলিয়া যাইতেছি। সংরক্ষণ-নীতির ভিতরকার কথাটা আমরা ভাল করিয়া বুঝি নাই মনে হইতেছে। কারণ যদি বিদেশীয় বণিক্-ও-শিল্পি-সমাজসমূহের একচেটিয়া প্রভাব হইতে স্বকীয় সমাজের প্রাণরক্ষা এবং স্বদেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের 'সংরক্ষণ' আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা হইলে এই সাত আট বৎসরে আমাদের জাতীয় চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। যদি পুরা দমে শিল্প ও ব্যবসায়ের সংরক্ষণ-নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে অবুঝ হইয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র সুফলের আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হইয়া উঠিতাম না। যদি কোন মতে প্রাণে বাঁচিবার ইচ্ছা অত্যধিক মাত্রায় থাকিত, তাহা হইলে এই সর্ব্বনাশের সময়ে "অর্দ্ধং

ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ” এই নিয়মানুসারে সংসার-যাত্রায় বহু অনাবশ্যক অভাব বর্দ্ধন করিতে উৎসাহী হইতাম না।

যদি বিদেশীয় ব্যবসায়ী সমাজগুলির আধিপত্য সকল দিক হইতে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস থাকিত, তাহা হইলে দূরদর্শী বিচক্ষণ গৃহস্থের ন্যায় কিছুকালের জন্য আমাদের অভাব ও বিলাসের মাত্রা যথেষ্ট কমাইতে পারিতাম। তাহা হইলে সামান্য দু’একটা লোভনীয় বস্তু ভোগ করিবার জন্য বিদেশীয় দ্রব্যভাণ্ডারগুলির শরণাপন্ন হইতে প্রবৃত্তি জন্মিত না। তাহা হইলে “মায়ের দেয়া মোটা কাপড়” পরিয়াই ভদ্রসমাজে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিতাম না; বরং তাহাতে এই বুঝিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে রিতাম যে “দীনদুঃখিনী মা যে মোদের এর বেশী আর সাধ্য নাই।” তাহা হইলে নূতন নূতন আরব্ধ বহু শিশু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচিয়া যাইত। তাহা হইলে সকল বিষয়ে ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা-বর্জ্জন এবং প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণগুলি চরিত্রের বিশেষত্ব হইয়া পড়িত। তাহা হইলে ভবিষ্যতের চরম উন্নতির ইচ্ছা প্রবল হইয়া বর্ত্তমানের নগণ্য আরম্ভের মধ্যে কর্ম্মিবৃন্দকে আনন্দি করিয়া রাখিত। তাহা হইলে জনগণ স্থায়ী জাতিগত ইষ্টলাভের জন্য সাময়িক সুখভোগ এবং ব্যক্তিগত-স্বার্থ-সিদ্ধির প্রবৃত্তি জলাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইত।

অবশ্য আমাদের বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে এইরূপ বৈরাগ্য এবং স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা বিলাস-বর্জ্জন এবং অভাব-দমনের দিকে বিশেষ অগ্রসর হই নাই। বহু বিষয়ে ভোগের ইচ্ছা এখন কিছুকাল আমাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে হইবে। ভাল পরা, ভাল খাওয়া, ভাল সাজা, ভাল আসবাবে ঘর ভরা এ সকল আদর্শ

এখন সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন—এ সব সৌখীন জিনিষ জোগাইবার ক্ষমতা এখন ভারত-মাতার নাই। ভারতবর্ষের শিল্পে ও কৃষিতে এখন নানাবিধ উচ্চশ্রেণীর বিলাস-দ্রব্য তৈয়ারী হইতেই পারে না। সুতরাং যাঁহারাই এই সকল পদার্থ আবশ্যক মনে করিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন তাঁহারাই স্বদেশের শিল্প-ও-ব্যবসায়-জগতে "বাণের জল" ঢুকাইবার সাহায্য করিবেন, তাঁহারাই স্বসমাজের উন্নতি-সাপেক্ষ শিল্প-সংরক্ষণ-নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবেন।

প্রকৃত কথা এই যে—বৈদেশিক প্রভাব এড়াইতে হইলে নিজ নিজ ভোগের বাসনা আগে কমাইতে হইবে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ-গুলির ফর্দ্দ ছোট না করিতে পারিলে আমাদিগকে বিদেশের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় যতদিন অভাবের সংখ্যা অত্যধিক থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতেই হইবে। সুতরাং নানা উপায়ে অভাব কমাইবার জন্য এখন দেশে নৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা আবশ্যক। যাঁহারা সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা এই ত্যাগের কথা, বিলাস-বর্জ্জনের কথা, অভাব কমাইবার কথা প্রচার করিতে হইবে। আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ স্থান না পাইলে আমরা সাংসারিক সুখভোগের ইচ্ছা দমন করিতে পারিব না। আর সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা না কমাইলে প্রতিকূল শক্তিগুলির হাত কোন মতেই এড়াইতে পারিব না। দেশকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—বিলাস-বর্জ্জন ও অভাব-দমন। এই কথাটা যেন গোঁজামিল দিয়া না বুঝি।

অভাবের কথা কম ভাবানই সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'সর্ব্বমাত্মবশং সুখং' এবং 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্'—বৈষয়িক জগতের

সংরক্ষণ-নীতি-প্রচারকদিগেরও ইহাই বাণী। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মামুলি ধনবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের উপকার-লাভের আশা বড় অল্প। আমাদের এখন প্রয়োজন নীতি-বিজ্ঞান বা ধর্ম্মবিজ্ঞান বা সহজ কথায় চরিত্র-বিজ্ঞান। চরিত্রের উন্নতিবিধান—হৃদয়ের আন্তরিকতা,—প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা—চিত্তের আত্মবশতা—এই সমুদয় এখন আমাদের আবশ্যক। এইরূপ চরিত্রগঠনই শিল্প-সংরক্ষণ-নীতির মূল মন্ত্র।

স্বদেশী আন্দোলন

সুতরাং আমাদের প্রথম কথা—বিদেশীয় বৈষয়িক শক্তিপুঞ্জ হইতে আত্মরক্ষা। দ্বিতীয় কথা—এ জন্য অভাবের মাত্রা কিছু কমান। তৃতীয় কথা—তাহার জন্য উৎকট ভাবে, দেশের দুঃখ বুঝিতে চেষ্টা করা।

অভাব কমাইবার কথা বলা হইল বটে, কিন্তু সকল অভাবই বর্জ্জন করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের চতুর্থ কথা—অত্যাবশ্যক অভাবগুলি দেশীয় কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে পূরণ করা—অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন।

লোকে বলে স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের শৈথিল্য জন্মিয়াছে। লোকে বলে আমরা হুজুগে পড়িয়া স্বদেশী করিয়াছিলাম। সে সকল কথায় কাণ দিবার আমাদের অবসর নাই। কারণ আমাদিগকে স্বদেশী আন্দোলনের পুষ্টির জন্যই যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে হইবে। এ কথাটা অনেকবার অনেক উপায়ে বলা হইয়াছে ও শুনান হইয়াছে। এতদনুসারে কাজও যে কিছু হয় নাই তাহা নহে।— বরং চারিদিকে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষে যে বিপুল বৈষয়িক জাগরণ দেখিতেছি, তাহা মুখ্যতঃ স্বদেশী আন্দোলনেরই সৃষ্ট। তথাপি কথাটা নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া এখনও বহুকাল প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমাদের সকল চেষ্টা এখন এই স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠা-কল্পেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমরা যেন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া না যাই। সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে আপাত-মধুর অনেক জিনিষই ভাল বলিয়া বোধ হয়। অমঙ্গলও মঙ্গলের আকারে অনেক সময়ে আসিয়া দেখা দেয়। স্বদেশীর প্রচেষ্টায়ও অনেক অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা, অর্থের অপব্যয়, সময় ও পরিশ্রমের অযথা অপব্যবহার হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা নিবারণ করিয়া দৃঢ়ভাবে স্বদেশী ব্রত উদ্যাপনের জন্য আমাদিগকে নিত্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাজে কাজ এবং আনুষঙ্গিক ও গৌণলক্ষ্যগুলি আসিয়া যেন আমাদের বৈষয়িক জীবনের ধ্রুবতারাকে মলিন করিয়া না ফেলে। তাহার জন্য আমাদিগকে লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া স্বদেশী মন্ত্র পুরাতন হইলেও সকলকে শুনাইতে হইবে। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে আবার স্বদেশী-প্রচারকগণের নানা ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে।

স্বদেশীর মূলমন্ত্রটা আমরা এখনও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। যখন দেখি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কৃষি শিল্পের সংবাদ রাখিতে ঘৃণা বোধ করে, তখন বুঝিতে পারি—স্বদেশী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয় নাই। যখন দেখিতে পাই বাঙ্গালার যুবকগণ একটা সামান্য কেতাবী শিক্ষার ফলাফলে অধীর হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে পারি প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য যে সাধনা, যে উৎসাহ আবশ্যক সে সাধনা ও উৎসাহের বিন্দুমাত্র তাহাদের হৃদয়ে বিকাশ লাভ করিতেছে না। যখন দেখি নূতন নূতন অনিশ্চিত পথে বিচরণ করিয়া অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বাঙ্গালী ভয় পাইতেছে, তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারি যে বঙ্গসমাজের সকল স্তরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত দীক্ষামন্ত্র সুবিস্তৃতি লাভ করে নাই।

দেশের অধিকসংখ্যক লোক চাকরী, মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, উকীলী ছাড়িয়া দোকানদারীতে, কৃষিকর্ম্মে, গোষ্ঠ-প্রতিষ্ঠায় এবং গাছগাছড়ার

ব্যবসায়ে লাগিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে পারিব দেশে স্বদেশী আন্দোলনের কাজ হইতেছে। বিদ্যালয়ের 'ফেল' হওয়া ছাত্রেরা যেদিন লেখাপড়ার অকৃতকার্য্যতায় হতাশ না হইয়া দেশের ভিতর নানাবিধ শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইবেন তখন বুঝিব যে মামুলি আদর্শের মাপকাঠি ছাড়াইয়া আমরা জীবনের উচ্চতর আদর্শ ও লক্ষ্য ধরিয়াছি।

আমরা হতাশ হই নাই। আমাদের অতীতের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুঃখিত হইবার কারণ নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালার বৈষয়িক জীবনে যে নবশক্তি জাগিয়াছে তাহা উপেক্ষা করিবার সামগ্রী নহে। বারান্তরে আমরা তাহার যথোচিত পরিচয় দিব। তাহা হইতেই বুঝিবেন বঙ্গে প্রবীণে নবীনে মিলিয়া, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ একত্র কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীর জন্য স্বাধীন জীবিকার উপায় কতভাবে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমরা প্রয়াস চাহি—চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে ইচ্ছা করি—সার্থকতা, সফলতা, কৃতকার্য্যতার ধার ধারি না। এই প্রয়াসগুলির বিবরণে সকলেই বুঝিবেন আমাদের সর্ব্বত্র আশার কারণই আছে—নৈরাশ্যের কোন হেতু নাই।

তথাপি আমাদের অধিকতর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। চাকরীতে যেন আমাদের কাহারও মন না যায়। স্বাধীন ভাবে ৪০।৫০৲ টাকার আয়ের সুবিধা-সৃষ্টির নিমিত্ত যথোচিত কষ্ট স্বীকার না করিয়া কেহ যেন মাষ্টারীতে না ঢুকি। উকিল মহাশয়গণ নিজেদের আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া সন্তানগণকে আর যেন উকীল-ঘরের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে না দেন। ওকালতীতে ৫০।৭৫৲ মাত্র আয় হয়। এরূপ উকীলের সংখ্যা প্রত্যেক জেলায় কত জন? এই সামান্য আয়ে হিন্দু-গৃহস্থের

যৌথ-পরিবারের ব্যয় কি চলিতে পারে? এইরূপ কষ্টে তাঁহারা সমাজকে নিরানন্দময় করিয়া তুলিতেছেন। বাঁধা পথে যে বড় সুখ আছে তাহা ত দেখি না। তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি নূতন নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য নিয়োগ করিতেছেন না কেন? অনিশ্চিত পথে না হয় আর কয়েক বৎসর বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। প্রতিবৎসর হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছেন। হইয়াই হতাশ! তাঁহাদের শতকরা দশ জন প্রত্যেকবার স্বাধীন অন্নের পথ বাহির করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের নদী-জঙ্গল, গাছ-গাছড়া, কৃষি, পশু ইত্যাদি ধনাগমের উপায় সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের ভিতরই কেরাণী ও মাষ্টারীগিরি অপেক্ষা শত গুণ আরামদায়ক জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িতে পারে। কেবল একবার সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ভাসিয়া পড়া প্রয়োজন—একটা নূতন পথে চলিবার জন্য উৎসাহ প্রয়োজন।

এই সকল দিকে শক্তি-প্রয়োগকেই আমরা স্বদেশী আন্দোলনের কার্য্য মনে করি। স্বদেশী প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ কর্ম্মযোগই আবশ্যক। এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আরও বিশেষরূপে পড়া প্রয়োজন। এই সকল কর্ম্ম করিতে করিতেই বাঙ্গালীর শিল্পশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, ও ব্যবসায়-শিক্ষা হাতে কলমে হইতে থাকিবে। কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে, গোচারণ-মাঠে, কৃষিক্ষেত্রে শাগরেদী করিতে করিতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবে। মামুলি বিদ্যালয়ের দু'চার পাতা ধন-বিজ্ঞান পাঠ করিয়া অথবা তথাকথিত টেক্নিক্যাল স্কুলের ওভারসিয়ারি পাশ করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিবার প্রণালী শিক্ষা হইবে না।

শিল্প-প্রদর্শনীর আর এক দিক্

আমাদের শিক্ষিত জনগণ কথাটা বেশ শক্ত ভাবে ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা বৎসর বৎসর নানা জেলায় বহু অর্থ ব্যয়ে কৃষি-প্রদর্শনী খুলিতেছেন। কৃষি-প্রদর্শনীর, শিল্প-প্রদর্শনীর উপকারিতা অস্বীকার কেহই করিবেন না। আমরা শিক্ষাপ্রচারের জন্য, শিল্প-প্রচারের জন্য, বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য প্রদর্শনী, সম্মিলনী, বক্তৃতা ইত্যাদি সবই চাই। কিন্তু প্রচার করিব কোন্ জিনিষ্? লোককে শিখাইবার স্বাধীন কর্ম্মের কোন্ অনুষ্ঠান, কোন্ শিল্প, ব্যবসায় বা কৃষিকর্ম্ম দশ জনের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব? আর তাহার জন্য প্রতিবৎসরই কি সকল জেলায় একটা করিয়া প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান না করিলে চলে না? আমাদের বাঙ্গালা দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সুফলও যথেষ্ট ফলিয়াছে সত্য। কিন্তু আনুষঙ্গিক ভাবে অর্থের অপব্যয় এবং শক্তির অপব্যবহার হইয়াছে কত বেশী? তাহাতেই মনে হয় আমরা আমাদের মুখ্য আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলিয়া বাজে জিনিষে মাতিয়া যাইতেছি। যত টাকা বঙ্গদেশে প্রদর্শনী উপলক্ষে খরচ হইল তাহার অর্দ্ধাংশ দ্বারা শিল্প ও ব্যবসায়বিষয়ক বহু সদনুষ্ঠান চলিত। প্রকৃত শিল্প-বিদ্যালয় খোলা হইতে পারিত—জাতীয় বিদ্যালয়গুলির শিল্প-বিভাগের উন্নতি সাধিত হইতে পারিত—কৃষিকর্ম্মে, তাঁতের কাজে, গো-পালনে, ঔষধ-প্রস্তুত-করণে অনেকে মূলধনের অভাবে উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারিত। অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবককে ২০০।৩০০৲ অগ্রিম মূলধন যোগাইয়া তাহাদের দ্বারা নানা স্বদেশীভাণ্ডার খোলা হইতে পারিত। বিদেশ হইতে যে সকল ছাত্র শিল্প ও বিজ্ঞান শিখিয়া স্বদেশে কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে হতাশ প্রাণে

চাকরীতে ঢুকিতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম বজায় রাখা যাইত—তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইত। এইরূপ স্থায়ী কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ বৎসর পর একটা করিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত। আর বাস্তবিক তখন প্রদর্শনীর প্রয়োজনই কমিয়া যাইত।

তাহার পরিবর্ত্তে কি দেখিতেছি? প্রত্যেক বৎসর অজস্র অর্থ-ব্যয়, আমোদ-প্রমোদ আর দুই চারিটা মামুলি বক্তৃতা। এইজন্যই মনে হয় আমাদের জননায়কগণ জাতীয় স্বার্থ ভুলিয়া অন্ধভাবে গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন। অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতেছে না। প্রদর্শনী কিছু কাল বন্ধ রাখিলে কোন ক্ষতি হইবে না, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা প্রদর্শন বা প্রচার করা কর্ত্তব্য তাহারই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যদি জননায়কগণ টাকা তুলিতে পারেন, যুবকগণকে নানাবিধ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে সাহায্য করুন। ছাত্রদিগকে অর্থকরী উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, অর্থকরী প্রাণিবিদ্যা, অর্থকরী ভূতত্ত্ব শিখাইবার জন্য প্রত্যেক জেলায় ছোটখাট কারখানা, কামারশালা, বিজ্ঞানালয় ও ব্যবসায়-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করুন। এই উপায়ে কয়েক বৎসর প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের নানা কার্য্য চলিবে। তখন আপনা আপনিই প্রচারকার্য্য অগ্রসর হইতে থাকিবে। তখন হাটে, বাজারে, মেলায়, উৎসবে, পূজার শোভাযাত্রায়—নানা উপলক্ষ্যে হাজার হাজার প্রদর্শনীর কার্য্য হইবে। দেশ উন্নত হইবে—সমাজ নবীন শক্তির অভ্যুদয়ে সঞ্জীবিত হইবে—জননায়কগণ ও গণপতিগণ ধন্য হইবেন। আর যদি আমোদ-প্রমোদের লোভ না দেখাইয়া—স্বীয় চরিত্র-বলে এবং দেশভক্তির প্রভাবে জনগণের অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিতে না পারেন তাহা হইলে চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকুন। বাজারে দাঁড়াইয়া চিন্তাহীনতার ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলে সমাজের অনিষ্ট হইবে।

আমরা অনেক কথা অবান্তরভাবে বলিলাম। মোটা কথা এই যে—বাঙ্গালা দেশে আর যেন শীঘ্র শিল্প-প্রদর্শনী খোলা না হয়। তাহার পরিবর্ত্তে স্বাধীনজীবিকা বাহির করিবার জন্য নানা কর্ম্মীকে নানা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা হউক। প্রদর্শনীতে মাতিয়া আমরা জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য ভুলিয়া যাইতেছি। সাময়িক উত্তেজনায় আমরা প্রকৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের টাকা অনর্থক ব্যয় করিবার অধিকার কাহারও নাই। গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে—গত ৫।৬ বৎসরে সমাজের অবস্থা যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেশে এখন কিছু কাল প্রদর্শনীর কোন প্রয়োজন নাই। এখন সময়োপযোগী নূতন নূতন বৈষয়িক কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

প্রদর্শনী ও প্রচারক

আর একটা দিক হইতেও আমরা প্রদর্শনীগুলির অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিতেছি। বিগত দুই তিন মাসে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় নানা প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই মামুলি অনুষ্ঠানের কোনই ত্রুটি হয় নাই। সেই সভা, সেই সমিতি, জিনিষগুলির সেই ক্ষণিক পর্য্যবেক্ষণ, সামান্য কৌতুক এবং তারপর সম্পূর্ণ বিস্মৃতি! কিন্তু এইরূপ সাময়িক প্রদর্শনীগুলিকে চিরস্থায়ী করিবার কোন আয়োজন দেখি না। এই সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ সার্থকতার উপায় আমরা একেবারেই ভাবি না। ইহাদের সুফলকে চিরস্থায়ী করিতে হইবে—নানা স্থানে বিস্তৃত করিতে হইবে সে চিন্তা আমাদের নাই। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য—প্রচার ও লোকশিক্ষা। কিন্তু প্রচারক ভিন্ন সে সব কার্য্য সহজে হইবার নহে। তবে প্রচারক শুনিলেই আমরা যেন সভা-সমিতি-বক্তৃতার কথা মনে না করি। আমাদের হিন্দুর কাছে প্রচারকের প্রকৃতি অন্য প্রকার। আমাদের তীর্থস্থানের পাণ্ডারা কি কম প্রচারক? তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ তীর্থস্থানের মহিমা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন। দূরতম পল্লীবাসীর সম্মুখেও তাঁহারা প্রসাদ, বিল্বপত্র, সিঁদূর প্রভৃতি প্রদান করিয়া নিজের তীর্থস্থানকে কেমন জীবন্তভাবে ধারণ করেন। প্রচার-কার্য্য ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুরূপে আর কি উপায়ে হইতে পারে?

আমাদের শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্য এবং ব্যবসা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা রকম শিক্ষা এইরূপ ভাবেই নানা স্থানে প্রচার করিতে হইবে। আমাদের এখন বৈজ্ঞানিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিল্প ও ব্যবসায়ে কৃতবিদ্য পাণ্ডার প্রয়োজন হইয়াছে। এই সকল বৈষয়িক ও শিল্প জগতের নিয়ম-প্রচারক

পাণ্ডারা গ্রামবাসী চাষা, তাঁতী, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রমজীবীদিগের সহিত মিশিবেন। আজ কাল Specialist বা বিশেষজ্ঞ মহাশয়গণের ন্যায় কেবল দু'চারটা মৌখিক সদুপদেশ দিবার জন্য নহে। শিল্প-বিদ্যা এবং বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ে পারদর্শী ধুরন্ধরেরা তাহাদের সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করিয়া তাহাদের ঘরের লোক হইবার চেষ্টা করিবেন। হয় ত তাহার জন্য কখন কখন কৃষকের সঙ্গে এই উচ্চ-শিক্ষিত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণকে লাঙ্গল ধরিতে হইবে, তাঁতীর সঙ্গে তাঁত বুনিতে হইবে, সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতিকে সাহায্য করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই নিম্নশ্রেণীদিগের আমোদ-প্রমোদ, বিবাদ-বিসম্বাদ, সুখ-দুঃখের সহিত প্রচারকগণের সহানুভূতি কেবল মাত্র মৌখিক রহিবে না—আন্তরিক হইয়া উঠিবে। তখন তাঁহারা অবসর মত তাঁহাদের "ঝুলি" হইতে কখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, কল-কব্জা, কখন কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজ-পদার্থ, কখন মানচিত্র, ফটো-ক্যামেরা, কখন ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবিওয়ালা কাচ, জীব-জন্তুর অস্থি-পঞ্জর, চিত্র, গাছগাছড়া প্রভৃতি বাহির করিয়া দেখাইবেন, বুঝাইবেন—প্রত্যেকটির বিশেষত্ব কি, উপকারিতা কি, প্রত্যেকটি কেমন করিয়া উৎপন্ন, কেমন করিয়া গঠিত।

আমরা আশা করি, এইরূপে যদি শ্রমজীবী কারিগরদিগের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত 'বিশেষজ্ঞ' ওস্তাদ মহাশয়গণ কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের কারখানায় কিছুকাল মান-সম্ভ্রম ও অহঙ্কার ভুলিয়া কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে একদিকে শিল্প-প্রচারকদিগের চরিত্র-গঠন—অন্যদিকে সমাজের মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠা-প্রচার-কার্য্য খুব সুন্দররূপে চলিতে থাকিবে। নিম্নশ্রেণীরা তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক নূতন আধুনিক তথ্য, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী, বহু নব নব আবিষ্কার খুব সহজে জানিতে পারিবে—জানিয়া সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে। বলা বাহুল্য,

এই সময়ে প্রচারকগণ যে ভাষা ব্যবহার করিবেন তাহা যেন নিম্নশ্রেণীরা তাহাদের ঘরের ভাষা বলিয়াই বুঝিতে পারে।

হে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পাদি-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জননী জন্মভূমি এইরূপ প্রচার-কার্য্যই আপনাদের কাছে আশা করেন। আপনারা একবার নিজের Prospect ও বেতনের কথা ভুলিয়া সমাজের সেবায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলেই আপনাদের শিক্ষার্থে ব্যয়িত সমস্ত অর্থ সার্থক হইবে।

প্রাচীন চীন-সভ্যতায় ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ অনেক বিষয়ে সমগ্র এশিয়ার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। ব্যবসায়, শিল্প, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, বিদ্যাচর্চ্চা ইত্যাদি মানব-সভ্যতার সকল বিভাগেই ভারতবাসী এশিয়ার জাতিসমূহকে ঋণে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই সকল কথা নানা দিক হইতে প্রচারিত হইতেছে। আজকাল যাঁহারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়ার শিল্পবাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন, শিক্ষাবিস্তার এবং ধর্ম্মপ্রচার ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সমগ্র প্রাচ্যজগতে ভারতবর্ষের আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত বাহির করিতেছেন। আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কয়েক বৎসর হইল জাপানী পণ্ডিত অধ্যাপক বুনিয়ো নায়জিয়ো (Bunyiu Naiyio) ইংরাজী ভাষায় একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবিগণ চীনদেশের সম্রাট্ ও সামন্তগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে কিরূপে স্বদেশীয় বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রচার করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতবর্ষের বৌদ্ধত্রিপিটকশাস্ত্রগুলি প্রাচীনকালে চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। আধুনিককালে জাপানী পুরোহিত বুনিয়ো নায়জিয়ো সেই অনুবাদ-গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন। সেই তালিকা বিদ্বৎসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব চীনে কিরূপ বিস্তার ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভারতের কত কত বিদ্বান্ চীনে গমন করিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতীয় সাহিত্যের নানারূপে প্রচার

করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মূল পুস্তক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিবরণ লিখিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বা তাহাদের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন বিভিন্ন রাজ-বংশের আশ্রয় লাভ করিয়া এক একজন ক্ষুদ্র বৃহৎ ৭০, ৮০, ৯০খানি পর্য্যন্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া জীবনের কার্য্যযোগ্য সমস্ত দিনযামিনী তাহাতেই ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহারা ঐরূপ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই, ভাষান্তরিত হইলেও, অদ্যাপি ভারতের বহু বহু প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবী হইতে মূলগ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুপম পরিশ্রম প্রভাবে জনগণ তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই।

ভারত যখন দেশান্তরে উপস্থিত হইয়া নিজের সাহিত্য-সম্পৎ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তখন তাহার সেই সম্পৎ কতদূর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, কতদূর অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই অতীত ও বর্ত্তমানে বহু প্রভেদ; এখন যাহা সুগম, ঐ সময়ে তাহা অতি দুর্গম ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল সাহিত্যসেবী নির্ভীক হৃদয়ে সেই দেশে গমন করিয়াছেন, বাস করিয়াছেন, এবং সমগ্র জীবন ঐ বিদ্যাপ্রচারকার্য্যেই বিনিয়োগ করিয়াছেন। আজ চীনের সহিত ভারতের বিভিন্ন সম্বন্ধ, তখন ইহার তাহার সহিত বিদ্যার সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সম্বন্ধই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এবং সেই সম্বন্ধ বর্ত্তমানের সম্বন্ধ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়াই, চীনীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠদিক্‌কে ভারত সমুজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে সাহিত্যে ভারতের প্রধান-অপ্রধান শত শত গ্রন্থ গৌরবাই স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাকে যে ঐ সকল গ্রন্থ স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া বহুলাংশে নিজাভিমুখ করিয়া প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে আলোচিত বিষয়

হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন কাশীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সম্মিলন বসিয়াছিল প্রয়াগে। এই দুই সম্মিলনে যতগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবিগণের সেদিকে দৃষ্টি পড়া আবশ্যক। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমাদিগকে হিন্দী ও আরবীভাষায় রচিত সাহিত্য হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই দুইটি উত্তরভারতের সাহিত্য ক্রমেই সম্পদ লাভ করিতেছে। বঙ্গসাহিত্যে হিন্দী ও মারাটী সাহিত্য হইতে অনুবাদ ও সঙ্কলন প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ এদিকে তাঁহাদের যত্ন প্রয়োগ করিলে সদুপায়ে সময় কাটাইতে পারিবেন।

প্রথম হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় সভাপতি ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল:— (১) বর্ত্তমান নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি, (২) হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের ভাষা, (৩) হিন্দী সাহিত্য, (৪) হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস, (৫) ব্রজভাষা, (৬) দাদু দয়াল এবং সুন্দর দাস, (৭) রাষ্ট্রভাষা এবং রাষ্ট্রলিপি, (৮) মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দীর অবস্থা, (৯) স্বাধীন করদ রাজ্যে নাগরী অক্ষরের প্রচার, (১০) নাটক ও উপন্যাস, (১১) ভাষা ও সাহিত্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের কার্য্যাবলী, (১২) নাগরী-প্রচারই দেশের উন্নতির উপায়, (১৩) হিন্দী ভাষা, (১৪) হিন্দীর বর্ত্তমান

অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায়, (১৫) পঞ্জাবের হিন্দী, (১৬) বুঁদেল খণ্ডের হিন্দী, (১৭) দেবনাগরী অক্ষর।

দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি ছিলেন—কলিকাতার প্রসিদ্ধ হিন্দী-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোবিন্দনারায়ণ মিশ্র। এই সম্মিলনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

(ক) ঐতিহাসিক অনুসন্ধানবিষয়ক

(১) নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি, (২) রাজপুতনায় হিন্দী গ্রন্থের অনুসন্ধান, (৩) হিন্দী পুঁথির অনুসন্ধান, (৪) হিন্দী ভাষা ও মুসলমান-সমাজ, (৫) হিন্দী সাহিত্যে মুসলমান কবি, (৬) বুন্দেলখণ্ডের কবি, (৭) গোরমপুর বিভাগের কবি, (৮) নাট্টশাস্ত্রাচার্য্য ভরতমুনি, (৯) চন্দ বরদাই।

(খ) আধুনিক অবস্থা বিষয়ক

(১) হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা, (২) হিন্দীর বর্ত্তমান অবস্থা, (৩) বঙ্গ ও বিহারে হিন্দী, (৪) মধ্য-প্রদেশে হিন্দীর অবস্থা, (৫) মধ্য-প্রদেশে হিন্দী সাহিত্য, (৬) মধ্য-প্রদেশে হিন্দীর অবস্থা, (৭) পঞ্জাবের হিন্দী।

(গ) সাহিত্য-বিষয়ক

(১) হিন্দী সাহিত্য, (২) হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের ভাষা, (৩) সমালোচনা, (৪) নাটক, (৫) হিন্দী এবং ব্রজভাষা।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা

(১) প্রাথমিক শিক্ষায় হিন্দী পুস্তক, (২) প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তু পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা।

(ঙ) ব্যাকরণ

(১) হিন্দী ব্যাকরণ, (২) হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ, (৩) হিন্দীর ব্যাকরণ।

(চ) বিবিধ

(১) হিন্দী ভাষা এবং দৈনিকপত্র, (২) হিন্দীকে জাতীয় ভাষা করিবার সুবিধা, (৩) স্ত্রীসমাজ এবং হিন্দী সাহিত্য, (৪) রেলওয়ে ষ্টেশনে এবং অন্যান্য স্থানে নাগরী অক্ষর ব্যবহারের আবশ্যকতা।

বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে কয়েক জনের নাম তিন সম্মিলনেই যুক্ত দেখিলাম। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রথম হিন্দী-সম্মিলনে 'রাষ্ট্রভাষা এবং রাষ্ট্রলিপি' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সম্মিলনে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার ঘোষ 'সমালোচনা' প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত শৈলজাকুমার ঘোষ 'প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তু-পরিচয়ের আবশ্যকতা' প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। এবারকার কলিকাতার সম্মিলনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 'হিন্দু-সাহিত্য-প্রচারক' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দীতে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বঙ্গসমাজে হিন্দীর আদর বাস্তবিক বাড়ে নাই। এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

যবদ্বীপে হিন্দুটোলা

নিজস্ব বজায় রাখা মানুষ মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। নিজের আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবৃত্তি মানবের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। জাতিগত চরিত্রের সর্ব্বনাশ করিতে এবং স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে কোন সমাজই প্রস্তুত নয়। আধুনিক হিন্দুশাস্ত্র বিদেশগমন ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে নিষেধবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার মূলে এই গূঢ়তত্ত্বই অবস্থিত। পরাধীন সমাজের চরিত্রহানি এবং জাতীয় ধর্ম্মনাশ অতি সহজেই ঘটিয়া থাকে। জগতের অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতির তুলনায় পরাধীন জাতি নিজকে ক্ষুদ্র ও অকর্ম্মণ্য মনে করে এবং সকল বিষয়ে অপরের অনুকরণ করিয়া জীবন গঠন করে। পরাধীনতার যুগে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ এই স্বভাবসিদ্ধ এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সত্যের উপলব্ধি করিয়া ভারতবাসীর গতিবিধি, কাজকর্ম্ম, আহার-বিহারের নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা এবং মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য। আমাদের জাতীয় জীবন তাঁহাদের আটঘাট-বাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলিত ছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রগত বিশেষত্বগুলি বাঁচিয়া রহিয়াছে। বহুবিধ রাষ্ট্রীয় অধীনতায়ও আমরা চিন্তার স্বাধীনতা ও আদর্শের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলি নাই।

এই জন্য আজকাল যখনই হিন্দুর বিদেশ-গমনের কথা উঠে, তখনই আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয়—আমরা অখণ্ড বিশ্বাসের সহিত কোন কথা বলিতে সাহস করি না। বিদেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের নিজ আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ কিছুই পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা এখানেও খাঁটি স্বদেশী থাকিয়া যান।

আমরাও যদি বিদেশী আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, কায়দা-সভ্যতা, ধর্ম্মকর্ম্ম, ইত্যাদি সকল বিষয়ে খাঁটি স্বদেশী থাকিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিলাম। সুতরাং আমাদের বিবেচ্য এক মাত্র প্রশ্ন এই যে, বিদেশগামী ব্যক্তিরা স্বকীয় বিশেষত্ব নষ্ট করিবার জন্য বিদেশে যাইতেছেন? না, নানা উপায়ে তাহাকে পুষ্ট করিবার জন্য এবং বিদেশীয় সমাজে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য যাইতেছেন? তাঁহারা কি ভিখারীর মত, গোলামের মত পরানুকরণ ও পরানুবাদের মোহে পড়িয়াছেন? না জননী জন্মভূমির সনাতন সাধনাকে সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের গুরুরূপে অগ্রসর হইয়াছেন? তাঁহারা কি বাহ্য চাক্‌চিক্যে মজিয়া সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি ও সুখভোগের আশায় নিজের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত? না, বিচক্ষণ কর্ম্মবীরের ন্যায় বিদেশের নানা মণিরত্ন আহরণ করিয়া স্বজাতির গৌরব বাড়াইবার জন্য চেষ্টিত? এবং নানা উপায়ে স্বধর্ম্ম-প্রচারের দ্বারা সমগ্র জগৎকে মজাইবার জন্য প্রবৃত্ত?

বলা বাহুল্য, এই সকল প্রশ্নের উত্তরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার প্রতিকূল। কিন্তু আজকালকার বিদেশযাত্রা আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, সমাজের নেতৃগণ বিদেশগামীদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই— আর পারিবেনও না। যাঁহার অর্থ আছে, যাঁহার সুবিধা আছে, তিনি অন্য কোন পরামর্শদাতার সদুপদেশ গ্রাহ্য করিবেন—না। প্রয়োজন হইলে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সমাজশাসনের দিন আর নাই। এই সকল যথেচ্ছাচার এখন সমাজের স্বাভাবিক কার্য্যকলাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাইতেছে। আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।

তবে নানা দিকে আশার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। আমরা অতীতের ভুলগুলি একটু একটু করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। জাতীয় জাগরণের নানা লক্ষণের মধ্যে জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বদেশীয় সভ্যতার প্রতি সমাদর বাড়িতেছে দেখিতে পাইতেছি। এখন আমাদের চিত্তসংমোহন ও বুদ্ধিভ্রংশ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। পরের মুখে ঝাল খাইয়াই আর আমরা সন্তুষ্ট থাকি না। নিজের আদর্শ, নিজের উৎকর্ষ খুঁজিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশীয় সভ্যতার আব্‌হাওয়ায় স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছি। পাশ্চাত্য জগৎকে সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু বলিয়া আর বেশী মনে করি না।

চিত্তসংমোহনের যুগে যখন আমরা বিদেশে যাইতাম, তখন ফিরিয়া আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাকরী করিতাম, দেশের লোককে গালি দিতাম, নিজ পরিবারের ইষ্ট-সাধনকেই সর্ব্বস্ব মনে করিতাম, স্বদেশের রীতিনীতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই অবজ্ঞা করিয়া বিদেশের মহিমা-খ্যাপন ও কীর্ত্তি প্রচার করিয়া জীবন ধন্য করিতাম। এখন নানা কারণে সুর ফিরিয়াছে, আজকাল বিদেশ হইতে ফিরিয়া কেবলমাত্র নিজ পরিবারের কথাই সর্ব্বদা ভাবি না—স্বদেশের বৃহৎ পরিবারের চিন্তাও অনেক সময়ে করিয়া থাকি। স্বজাতির গৌরববিকাশ ও স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনেই এখন বেশী আনন্দ উপভোগ করি। বিদেশীয় সভ্যতা ও আদর্শের মোহ অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারি। বরং পাশ্চাত্য জগৎকে অনেক নূতন কথা শিখাইব এই স্পর্দ্ধা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করি না। এই সুযোগে আমরা স্বজাতি-রক্ষা ও স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য এখন বিশেষভাবে স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে পারি। জগতে আমাদের প্রভাব-বিস্তারের জন্য নূতন ভাবে বহুবিধ কর্ম্ম আরম্ভ করা আবশ্যক। সকলেই

বুঝিতে পারিতেছেন—একটা বিশাল বিদেশীয় সমাজের মধ্যে বাস করিয়া একজন বা দশ জন হিন্দু বা ভারতবাসী কোন মতেই তাঁহাদের জাতীয় বিশেষত্ব, ধর্ম্মের বিশেষত্ব, চরিত্রের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারেন না—সেখানে আধিপত্য লাভ ত দূরের কথা। হাজার হাজার অন্যধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্নভাবে ভাবুক লোকের মধ্যে দু'দশ জন ভারতীয় হিন্দু তলাইয়া যাইবেন, তাহা ত নিঃসন্দেহ। ভারতবাসীর স্বধর্ম্ম, হিন্দুর হিন্দুত্ব, ভারতের জাতীয় গৌরব রক্ষা ও পুষ্ট করিতে হইলে বিদেশীয় সমাজের অভ্যন্তরে কয়েকটা ছোট-বড় ভারতী টোলা, বা হিন্দুপল্লী বা হিন্দুস্থানীপুর গঠন করিতে হইবে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ভারতবাসীরা নিজ নিজ ধর্ম্ম-কর্ম্ম, কায়দা-কানুন, সভ্যতা, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন। এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় উপনিবেশ হইতে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করিতে থাকিবেন। তখন আমাদের সে দিন ফিরিয়া আসিবে, যখন আমরা একটা স্বতন্ত্র সভ্যতার অধিকারী ও প্রবর্ত্তকভাবে পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব ; সে দিন আর হিন্দুকে আট ঘাট বাঁধিয়া চলিতে হইবে না, যখন হিন্দুগণ পরানুকরণে ব্যস্ত না থাকিয়া সভ্যতাকে নানা উপায়ে হিন্দুভাবে অনুরঞ্জিত করিতে সমর্থ হইবেন। তখন আবার সেই দিন ফিরিয়া আসিবে, যে দিন অধ্যাপক রাধাকুমুদ তাঁহার ভারতীয় সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাসগ্রন্থে জলন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।

আমাদের আদর্শে ও লক্ষ্যে এইরূপ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অনেকট বিকাশ হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত। এজন্য ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা অতীতের ও বর্ত্তমানের চরিত্রনাশ, ধর্ম্মহানি এব যথেচ্ছাচারগুলি ভুলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। আপদ্ধর্ম্মের যু অনেক দুর্ব্বলতা, নীতিহীনতা এবং আদর্শশূন্যতা জাতির চরিত্রকে আক্রমণ করে। ভারতবাসী হিন্দুগণ তাহার প্রভাবে যথেষ্ট বিড়ম্বিত

হইয়াছেন ও হইতেছেন। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য-পালনে বাধা জন্মিবে। সুতরাং যদিও আমরা যে কোন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির বিদেশ গমনের পক্ষপাতী নহি, তথাপি বিদেশবাসী হিন্দুগণ যাহাতে সাধ্যমত স্বদেশ-প্রীতি ও স্বধর্ম্মানুরাগ হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক রাখেন তাহার জন্য আমাদের ভাগ্যগঠনের বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি—"হে ভগবান, বিদেশে আমাদের ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিবার প্রবৃত্তি ও সুযোগ সৃষ্টি কর।"

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় যবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া "সাহিত্য-সংহিতায়" সেখানকার দশলক্ষ ঔপনিবেশিকের অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভারতের শিক্ষিত হিন্দুগণকে যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম ও শিক্ষাপ্রচারকের ভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। প্রস্তাবটি বড়ই সময়োপযোগী এবং আমাদের জাতীয় আদর্শের অনুকূল। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে নানা দিকে হিন্দুসমাজে নূতন কর্ম্মপ্রবাহ ও নূতন চিন্তা-প্রবাহ ছুটিবে। বিদেশগমনাকাঙ্ক্ষী হিন্দুগণ এই প্রস্তাবের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। জীবনের সম্মুখে একটা উচ্চ লক্ষ্য পাইয়া ধন্য হইবেন।

গায়কবাড়ের গ্রন্থশালা

বড়োদার মহারাজা শ্রীযুত সয়াজীরাও গায়কবাড় বাহাদুর স্বরাজ্যে কতকগুলি গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অনেকেই তাহা জানেন। বড়োদারাজ্যে যে ভাবে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন চলিতেছে তাহা দেখিয়া ভারতসম্রাট সন্ন্যাসী অশোকের কথা মনে পড়ে। সমগ্র বড়োদা রাজ্যই যেন শিক্ষাপ্রচারব্রতের জন্য দেবোত্তররূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ভারতবর্ষে এরূপ গ্রন্থশালা, পুস্তকালয় ও পাঠাগারের প্রয়োজন বেশী নাই। প্রথমতঃ খরচ-পত্রের কথা। লাইব্রেরী বলিলে যে আস্‌বাব-সরঞ্জামের কথা মনে আসে, তাহার খরচ কুলাইবার ক্ষমতা দরিদ্র ভারতবাসীর নাই। পল্লীতে অত টাকা খরচ করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রত্যেক জেলায় কেবলমাত্র একটা করিয়া মন্দের ভাল পাঠাগার গঠন করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকগুলি না হয় সংগৃহীত হইল। কিন্তু পড়ে কে? লিখিবার পড়িবার অভ্যাস আমাদের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই এখনও জন্মে নাই। দরিদ্র-সমাজ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের ত কথাই নাই। এখন আমাদের দেশে পুস্তকসংগ্রহ অপেক্ষা পুস্তক পড়াইবার লোকের বেশী প্রয়োজন। তাঁহারা সদ্‌গ্রন্থের উপদেশসমূহ কথায় বার্ত্তায় নানা স্থানে নানা ভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইবেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, আমাদের অতীত গৌরবকাহিনী, বর্ত্তমান যুগের নানা সদনুষ্ঠানের কথা, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণ, আমাদের কর্ম্মবীর ও সাহিত্য-বীরগণের শক্তি, উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় এই উপায়ে লোকমুখে সমাজে ছড়াইয়া পড়িবে।

লোকশিক্ষা বাড়াইবার যত উপায় আছে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কথক, প্রচারক এবং পর্য্যটকের আবশ্যকতা অধিক। লোকেরা লাইব্রেরীতে আসিয়া গ্রন্থ লইয়া যাইবেন, অথবা পুস্তকগুলি লইয়া গিয়া তাঁহারা বাড়ীতে বসিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন—সে আশা বড় কম। আমাদিগকে এখন কিছুকাল পর্য্যন্ত লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া সৎকথা শুনাইতে হইবে—সদ্‌গ্রন্থের উপদেশ তাঁহাদের দোকানে বসিয়া প্রচার করিতে হইবে। তাহার জন্য উৎসাহী কর্ম্মিগণের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রন্থশালাসংক্রান্ত একটা প্রশ্ন অনেক সময়েই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠাগারে রাখা আবশ্যক অনেকে এই বিষয় জানিতে চাহেন। এখানেও আবার সেই দুইটা কথাই মনে পড়ে। প্রথমতঃ খরচপত্রের কথা—ভাল ভাল গ্রন্থ কিনিবার উপযুক্ত টাকা আমরা প্রায়ই সংগ্রহ কারতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজের বিদ্যাচর্চ্চার অবস্থা। বাঙ্গালা গ্রন্থ ছাড়া কোন ইংরাজী গ্রন্থ রাখিতে হইলে আগে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক সাধারণ পল্লীগ্রামে ইংরাজী-জানা লোক বেশী আছেন কি না। আমাদের বিশ্বাস—যে সকল ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিলে দেশকে ধনে বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা যায়, বিদেশী রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক অবস্থা, ও বাণিজ্যের ইতিহাস বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়, সে সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিবার ক্ষমতা আমাদের অতি অল্প লোকেরই আছে। আর তাহাদের মূল্য অত্যধিক।

এই অবস্থায় আমাদিগকে অতি সংযতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। আমীরি চালের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যেন কর্ম্মিগণের মনে উপস্থিত না হয়। আমাদের ধারণা এই যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান

যুগে যত প্রকার কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে, সকলগুলির সহিত দেশবাসীকে পরিচিত রাখা আমাদের শিক্ষাপ্রচারকগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সমগ্র দেশের প্রতিমূর্ত্তি যাহাতে সকল দেশবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। বর্ত্তমানের সমস্যাগুলি বুঝিতে আরম্ভ করিলে লোকেরা ক্রমশঃ বিদ্যা-অর্জ্জনে এবং শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত হইবে।

এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় যতগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় সেগুলি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন ফ্যাক্টরী, স্বদেশী ভাণ্ডার, বিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষৎ, বিবেকানন্দ-মিশন, সেবাসমিতি, কৃষিসমিতি, যৌথ-কারবার-সমিতি ইত্যাদি সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্পেক্টস্, উদ্দেশ্যাবলী এবং বার্ষিক বা মাসিক বিবরণী, ও কার্য্য-তালিকা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কেবল বঙ্গদেশেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। সমগ্র ভারতেরই তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এজন্য পঞ্চনদ ও মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় ও হিন্দুস্থানের জনগণ নানা ক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্ম ও চিন্তা করিতেছেন তাহার সহিত পরিচিত থাকিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতের ইংরাজী পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত, হিন্দীভাষায় যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয় তাহাদের বিবরণীও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে আর একটা প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে দেশকে জীবন্তভাবে চিনিবার সুযোগ ঘটিবে।

আমরা বর্ত্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিলাম। আশা করি—আমাদের উৎসাহী কর্ম্মিগণের মন এই ব্যবস্থায় ছোট হইয়া যাইবে না। যাঁহারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে সমর্থ তাঁহাদিগকে আমরা আবার বলি—গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ-প্রচারকেরই আবশ্যকতা বেশী। যে মুহূর্ত্তে পুস্তক-

সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, সেই সময়েই অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচারক-সংগ্রহের চেষ্টা করুন।

বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র ও জাতীয় সাহিত্য

তোমরা যদি বাঙ্গালা-সাহিত্যকে বড় করিতে চাও, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া তোল। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া যদি সকল ভাব প্রকাশ করিতে চাও, সকল কথা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাঙ্গালার সমাজকে সকল বিষয়ে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা কর, বাঙ্গালার লোকগুলিকে দূরদর্শী, প্রশস্তহৃদয় ও চরিত্রবান্ করিবার আয়োজন কর। যদি বাঙ্গালীর সাহিত্যকে বিশাল ও বিপুল বিস্তৃত দেখিতে চাও, তাহা হইলে নানা উপায়ে বাঙ্গালা দেশটাকে মানব-সমাজে পূজ্য বরেণ্য মহনীয় করিয়া তোল। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হউক, বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্য বাড়িয়া উঠুক, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য মানবজাতির সারস্বতক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালার সমাজ হইতে ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কথা, স্বার্থের কথা, নীচাশয়তার কথা দূর করিয়া দাও। তাহার পরিবর্ত্তে অসাধারণ চিন্তা, অসামান্য আলোচনা, অনন্ত কর্ম্মের কথা, অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা, অসীম প্রেম ও অফুরন্ত জ্ঞানের কথা বাঙ্গালার জনগণের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে স্থান পাউক। বাঙ্গালার জেলায় জেলায় পঞ্চনদের কথা, মহারাষ্ট্রের কথা, দ্রাবিড়ের কথা, সিংহলের কথা আলোচিত হউক। পঞ্চনদের জেলায় জেলায়, দ্রাবিড়ের অঞ্চলে অঞ্চলে, সিংহলের নগরে নগরে বাঙ্গালার অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালার ইতিহাস-কথা, বাঙ্গালীর শিল্পনৈপুণ্য, বাঙ্গালীর কাজকর্ম্ম আলোচিত হউক। বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে চীনের সাহিত্য, জাপানের শিল্প, আমেরিকার ব্যবসায়, ইউরোপের রাষ্ট্র বাঙ্গালী শিশু ও যুবকের প্রতিদিনকার শিক্ষণীয় বিষয় হউক। চীন-জাপানের বিদ্যামন্দিরে, বার্লিন-

হার্ভার্ড-কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর রীতিনীতি বিভিন্ন দেশবাসীর পাঠ্য-তালিকায় সন্নিবিষ্ট হউক। বাঙ্গালী দুঃসাধ্য কর্ম্ম আরম্ভ করুক, অসম্ভব সাধনায় নিযুক্ত হউক, বাঙ্গালী তাহার কর্ম্মরাজ্য বিস্তৃত করুক, বিশাল জগৎকে তাহার চিন্তার আয়ত্ত করুক, তাহা হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্মিলনগুলি সার্থক হইবে।

বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্রকে সুদূরবিস্তৃত করিয়া তুলিবার জন্য উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে পঠিত 'সাহিত্যসেবী' প্রবন্ধে যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহা হইতে আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—

"মানবের কর্ম্মক্ষেত্রই সকল প্রকার ভাব ও ধারণার কারণ, জীবনের বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়ই চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য জন্মে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে হইলে, বিবিধ উপায়ে প্রকৃত জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রকে বিচিত্র সমস্যাপূর্ণ ও ঘটনাবহুল করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমগ্রতা, সর্ব্বগ্রাহিতা এবং সচেষ্ট কর্ম্মপ্রবণতা প্রবিষ্ট না হইলে ভাষা নিজের সামর্থ্য প্রকটিত করিবার সুযোগ পায় না; সাহিত্যও নিজকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া বিপুল ও বেগবান্ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের জীবন যাহাতে বিচিত্র কর্ত্তব্যময় এবং ঘটনাবহুল হয়, তাহার চর্চ্চা করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশ এবং মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও আন্ধ্রদেশ যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিনিতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে যাইয়া যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাসমূহ শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালা, মারাঠি ও তামিল অন্ততঃ এই তিনটী ভাষা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানে উচ্চশিক্ষার বিষয় হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের সহিত বিচিত্র উপায়ে কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের সমাজে বিদ্যায়, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশেই জীবন যাপন করিতে পারেন, বিভিন্ন দেশে যাহাতে আমাদের প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া শিক্ষিত জাতির সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, এবং যাহাতে বিভিন্ন সভ্যজাতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজের অবস্থা, সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ব্যবসায় এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের প্রদেশসমূহে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফরাসী ও জার্ম্মান্ অন্ততঃ এই দুইটি ইউরোপীয় ভাষা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতিতে সুপ্রচলিত করিতে হইবে।"

বিহারী স্বদেশসেবক কর্ম্মবীর লঙ্গৎ সিংহ

গত এপ্রিল মাসে মজঃফরপুর ভূমিহার ব্রাহ্মণ-কলেজ গৃহে মৃত মহাত্মা লঙ্গৎ সিংহের জন্য একটি শোক-প্রকাশ-সভা আহুত হইয়াছিল। আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাবু অরিক্ষ সিংহ, মৌলবী আবদুল হালিম, বাবু জং বাহাদুর প্রভৃতি বিহারের কতিপয় বিখ্যাত ভদ্রলোক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় মৃত মহাত্মার জীবনীর একটা সুন্দর বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকাল রাষ্ট্রীয়দিক্ হইতে বিহার-প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ হইলেও যুক্তবঙ্গের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিরদিনই অক্ষুন্ন থাকিবে। কারণ বহুকাল হইতে বিহার ও বঙ্গ এক-যোগে কাজ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের চিন্তা ও আদর্শ চিরদিনই এক, তাহাদের উভয়েরই লক্ষ্য একাভিমুখী; আর আজও বাঙ্গালী বিহারী ছাড়া চলিতে পারে না; বিহারীও বাঙ্গালী ছাড়া চলিতে পারে না। বাবু লঙ্গৎ সিংহকে বিহারীরা Maker of Modern Tirhut আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি যদি বিহারে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভূমিহার কলেজ স্থাপন না করিতেন, তবে আজ বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত কি না সন্দেহ। তিনি শুধু বিহারের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, বঙ্গমাতার যাবতীয় দুঃখ-নাশের জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুপূর্ব্বে তিনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের জন্য শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে লোকদিগকে উৎসাহ দিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রধান মত ছিল—দেশকে সকল দিক হইতে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। সেই

জন্য দেশের যাবতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্, ইণ্ডিয়ান্ ষ্টোরসের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় যে শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়, তাহার সফলতার একমাত্র কারণ মহাত্মা লঙ্গৎ সিংহের ঐকান্তিকী চেষ্টা। সে বৎসর জাতীয়-মহাসমিতি ও শিল্পপ্রদর্শনী উভয়ই কলিকাতায় সংগঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থের সাহায্য কিছু মাত্র পান নাই ও সাধারণ লোক শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য সাহায্যদানে অনিচ্ছুক ছিল, এই দুই কারণে প্রদর্শনীর সফলতার আশা সকলকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রোগশয্যাগত লঙ্গৎ সিংহ তখন গাড়ীতে চড়িয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রদর্শনী সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল। বিহারের প্রধান কর্ম্মবীর লঙ্গৎ সিংহের চেষ্টায় বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। লঙ্গৎ সিংহের অনুসরণ করা বাঙ্গালী ও বিহারী যুবকদিগের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

মারাঠা-জাতির সমাজ-সংস্কার

গত এপ্রিল মাসের 'মডার্ণ ওয়ার্লড' পত্রিকায় মহারাষ্ট্রবাসী শ্রীযুক্ত ভাজেকার বি, এ, এল, এল, বি, মহোদয় উত্তর ও দক্ষিণ মারাঠা জাতির মিলনের প্রস্তাব করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে আন্ধ্রদেশের মারাঠী ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ট্রেণেই দুইজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের সহিত ঘটনাক্রমে দেখা হয়। তাঁহাদের বেশ-ভূষা তামিলী হইলেও কথাবার্ত্তা প্রায় বোম্বাইয়ের মারট্টাদিগের ন্যায়। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় ভাজেকার মহাশয় জানিলেন যে, দুই জাতিরই আচার-ব্যবহার প্রায় এক। বিশেষতঃ স্ত্রী লোকদিগের বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, হাবভাব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। তাঁহারা তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলি, মাডুরা, টিনেভেলি, ট্রিভেণ্ড্রাম প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ সমস্ত স্থানের স্বজাতীয়দিগকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা আহ্বান করিয়া সেখানকার লোকমত এই মিলনের পক্ষপাতী কি না পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। কোন কোন সভায় মাদ্রাজীরা বোম্বাই ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাহের আদান-প্রদানে সম্মত আছেন, এ কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। বোম্বাইয়েও এইরূপ সদিচ্ছার অভাব নাই। শ্রীযুক্ত ভাজেকার যাহাতে এই মিলন সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য উভয় দেশবাসী ও বিশেষভাবে মাদ্রাজীর নিকট কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন—"বোম্বাইয়ের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ এইরূপ মিলনে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া যেমন সম্মতি-পত্র মুদ্রিত করিয়া বিলি করিতেছেন, তেমনি মাদ্রাজ হইতেও

এইরূপ সম্মতি-পত্র প্রচারিত হউক। ইহাঁর বহুল প্রচারের জন্য মাদ্রাজের দেশস্থ ব্রাহ্মণবহুল গ্রামসমূহে সভাসমিতি আহূত হওয়া উচিত। মাদ্রাজ হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বোম্বাইয়ে যাইয়া সভা-সমিতি আহ্বান করুন। মাদ্রাজে বিশুদ্ধ মারাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা হওয়ার জন্য এখন হইতে বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক ; এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাঠীভাষার পুনঃ প্রবর্ত্তন হউক।" এইরূপ আরও কয়েকটি প্রস্তাবে ভাজেকার বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত মাদ্রাজের দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের মিলনের পথ দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে মাদ্রাজীদিগকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ সমূহে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য অনুরোধই উল্লেখযোগ্য! মাদ্রাজী ছাত্র ও ছাত্রীরা যদি বোম্বাই প্রদেশে গিয়া বিদ্যালয়-কলেজে তাহাদের সহিত মিশিতে পারেন তবে বিবাহের আদান-প্রদান কতকটা সহজ-সাধ্য হইয়া আসিবে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভাজেকার ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগের মধ্যেও যাহাতে এইরূপ মিলন সংঘটিত হয় তাহার জন্য সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন। তবে তিনি তাহাদের বিষয়ে বেশী কিছু জানেন না তাই বেশী কিছু লিখিতে বা বলিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত ভাজেকারের এই উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমরা আশা করি, তাঁহার এই আশা অচিরেই পূর্ণ হইবে। আর আমরাও বাঙ্গালী একবার চাহিয়া দেখি ভারতের দশা। আমরাও আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহের আদান প্রদান করিতে পারি। তাহাতে জাতি-গঠনের সহায়তা করা হইবে। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ভারতের কায়স্থ-সমাজে মিলনের চেষ্টা করিতেছেন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের স্বদেশ-সেবক জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়, বাঙ্গালার-ব্রাহ্মণ-সমাজে ঐক্য-বন্ধনের প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধু উদ্যম জয়যুক্ত হউক।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ

'বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে ?' আমেরিকার সুবিখ্যাত ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভাপতি সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—"প্রকাণ্ড একটা কলেজে নানা বিষয় শিখাইলেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত হইল না। সাধারণ স্কুল-কলেজে যত বিষয় শিখান হয়, একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিষ শিখান হইয়া থাকে সত্য। কিন্তু বড় বড় বাড়ী-ঘর, অধিকসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক, এবং বহু বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য ও প্রধান লক্ষণ নয়। 'জন্‌স্‌ হপকিন্‌স্‌'কে লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিত, যখন তাহাতে কেবলমাত্র ছয়জন অধ্যাপক দুইশত জন ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। যে শিক্ষালয়ের কর্ম্ম, চিন্তা ও সাধনা সমস্ত সুধীজগতে সমাদৃত হয়, তাহাকেই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। আমেরিকার কলেজ ও বিদ্যালয়গুলি যেদিন সমগ্র বিশ্বে তাহাদের চিন্তাপ্রণালী ও কর্ম্মপ্রণালীর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, সেইদিন হইতেই আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।"

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রকৃত তত্ত্ব মনে রাখিবেন তাঁহারা 'বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ'কে একটা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ কেবল সাত বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়াছেন। এখনও ইঁহাদের কার্য্যের হিসাব ও পরীক্ষা লইবার সময় আসে নাই। তথাপি এই কয় বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ যে আদর্শে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহা কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতে,

এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও বিশাল পণ্ডিত-সমাজে ভারতবাসীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব বঙ্গে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে কত নূতন নূতন সমস্যা আনিয়া দিয়াছে এবং কত নূতন দিকে শিক্ষাপ্রণালীর গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আমরা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সফলতা সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করিব। সম্প্রতি দু'একটা জাতীয়-শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতেছি।

কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক "ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে' প্রকাশ—বিগত বৈশাখ মাসে কলিকাতা 'পঞ্চবটী ভিলা'তে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের পারিতোষিক বিতরণোৎসব-সভার অধিবেশন হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্পাদকগণ যে বিবরণী পাঠ করেন তাহা মোটের উপর সন্তোষজনক। রেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি (লণ্ডন) এফ্, জি, এস্, এম্, আর, এ, এস্, তাঁহার অভিভাষণে পরিষদের অভাব ও বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান কথা এই—"পরিষদ যে অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের আশা আছে একদিন ইহা উন্নতিলাভ করিবেই। যদিও বর্ত্তমানে আমরা ইহার কৃতকার্য্যতার অধিক লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমাদের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনী শক্তির প্রভাবে দেশের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যে শিক্ষা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ বা অনুরূপ নহে, তাহা আমাদের দেশবাসী কর্ত্তৃক আদৃত হয় না।" অতঃপর তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনা করিয়া বলেন যে, "হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিহনে আজও বাঁচিয়া আছে। তাহা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার

আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই সভ্যতা আমাদের দেশীয় শিল্পকলার বিনাশ ও প্রাচীন শিক্ষাদর্শের খর্ব্বতা সাধন করিয়া হিন্দু-সভ্যতায় অনৈক্য ও অশান্তির ভাব আনয়ন করিয়াছে। সুতরাং আমাদের সনাতন সাম্যভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য দেশীয় শিল্পের পুনরুন্নতি ও প্রাচীন শিক্ষার পুনঃপ্রবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে।" তিনি আরও, বলেন "শিল্পশিক্ষায় পরিষদ যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, এবং যদিও গভর্ণমেণ্ট একটি সুসজ্জিত শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় আমাদের কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক পরিষদের সাহায্যদানে অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এরূপ আরও দুই একটা বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।"

অবশেষে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন হইতে যে বক্তৃতা দেন, নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।

"পরিষদ বাস্তবিকই ভয়ানক সঙ্কট অবস্থা অতিক্রম করিয়া এই নিরাপদ স্থানে আসিয়াছে। এখন আশা করি যে, ইহা আর বিপদে পড়িবে না। অবশ্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ বিস্মৃত হইবেন না যে, তাঁহারা কিরূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থাতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তখন দেশে কি তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তখন যে ঘটনাবলীর উপর তাঁহাদের কিছুমাত্র হাত ছিল না সেই সমুদয়ই তাঁহাদিগকে এই বিপদের মেঘান্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাঁহারা লোকের সন্দেহ-ভাজন হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কখনও গুপ্ত এবং অপ্রকাশ্য জীবন যাপন করিতেন না। তাঁহাদের কার্য্যবিবরণী, কার্য্যপ্রণালী সবই সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহই সন্দেহজনক কোন কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন না। যদিও পরিষদের কাজ প্রথমাবস্থায়

একযোগে অষ্টাদশটি শাখা-বিদ্যালয়ের সহিত আরব্ধ হইয়াছিল ও এক্ষণে তাহার আটটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, তত্রাচ আমি হতাশ হই নাই। এখনও ইহার কতকগুলি শাখা সুন্দররূপে কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি'; এই সমিতি অতি সুন্দর গৌরবজনক কাজ করিতেছেন। পরিষদ স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাজনীতির সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; ইহা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান।

যে সমস্ত ছাত্র বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বৃত্তি পাইয়া আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহারা চরিত্র ও বুদ্ধির দ্বারা সেই দূর দেশেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সেই সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগের ছাত্রগণ সম্বন্ধে সন্তোষপ্রদ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। অধিকন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে বারজন ছাত্র পাঞ্জাবের গত শিল্প-পরীক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি মাত্র ছাত্র ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে দুইজন এই পরিষদ হইতে গিয়াছিল তাহাদের উভয়ই উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখানকার একটি ছাত্র অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিদ্যায় পরাজিত করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগে ৫০৲ টাকা বেতনের একটি পদ অধিকার করিয়াছে। এই সমস্ত পরিষদের গৌরবের কথা। বাস্তবিক পরিষদ অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ভূতত্ত্ববিভাগ ও রঞ্জন-বিভাগের কার্য্য বন্ধ হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু এই দুই বিভাগে শিক্ষিত ছাত্রদের চাকুরীর আশাও খুব কম; সুতরাং আমি মুদ্রণ-বিভাগ খুলিয়া তাহাতে উপযুক্ত কম্পোজিটর প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করি।

প্রাচীন যুগে আমরা উচ্চতর-সভ্যতা লাভ করিয়াছিলাম ও ইহা

আমাদের গৌরবের বিষয় ছিল, এই সমস্ত কিম্বদন্তী এখন ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকেই খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পক্ষাঘাতে যাহার শরীর অবসন্ন তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও দৃষ্টি-শক্তির তীক্ষ্ণতায় লাভ কি; অবশ্য এই অপ্রীতিকর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করায় আমি আপনাদের নিকট অপরাধী। যাই হোক, আমার ইচ্ছা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হউক।"

সম্প্রতি বরিশালের ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের বিগত দুই বৎসরের কার্য্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষাসম্বন্ধে কতক-গুলি গভীর কথা আলোচিত আছে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়, কার্য্য-পরিচালনা, শিক্ষাপ্রণালী ইত্যাদি বিষয় সুবিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। অধিকন্তু সমগ্র বঙ্গের জাতীয় শিক্ষার চিত্র তাহা হইতে কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"স্রোতস্বতী যেমন জলরাশি সাগরের দিকে লইয়া যায়, তেমনি গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর পাঠশালাসমূহ উচ্চাঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্র সরবরাহ করিয়া দেয়। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীস্থ বালকদিগের শিক্ষার জন্য আজ পর্য্যন্তও পাঠশালাদি স্থাপনের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, আমার মনে হয় ছাত্রাভাবের ইহাও একটি প্রধান কারণ। বলিতে কি আজ পর্য্যন্ত যতগুলি জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে, অধিকাংশই ছাত্রাভাবে, অর্থাভাবে নহে। আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের স্কুল-কমিটির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে বর্ত্তমান বর্ষে দুইটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া পরিচালিত করিতেছেন।

বানেশ্বরপুর—ঝালকাঠীর অনতিদূরে এই গণ্ডগ্রামটি অবস্থিত। অধিবাসী তাবৎ মুসলমান, আমাদের স্কুলকমিটীর মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও উপদেশে গত ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়া আমাদের স্কুলের শাখারূপে কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে ছাত্র-সংখ্যা ৪৮ জন, শ্রীযুক্ত মুন্সি আইনদ্দি মহোদয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকিলে এই বিদ্যালয়টির এত উন্নতি সাধিত হইত না। আমরা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালক ব্যক্তিবৃন্দকে ধন্যবাদ দিতেছি।

চৈতন্য বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয় ঝালকাঠী বন্দরে শ্রীযুক্ত বল্লভদাস মোহান্তের আখড়ায় অবস্থিত। বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা ২৫ জন। উক্ত মোহান্ত মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে দিন দিন বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধিত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন এই বৎসরের প্রারম্ভে আরও ৪।৫টি পাঠশালা আমাদের কমিটির অধীনে পরিচালিত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। এইরূপ ভাবে পাঠশালা স্থাপন জন্য কলিকাতার কাউন্সিল মাসিক কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।”

জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের **অন্ন-সংস্থান** সম্বন্ধে প্রকাশ :—

“বন্ধুগণ, জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় কি, তাহা কি আর যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে হইবে? আপনারা বিশ্বাস করুন ইহারা “উদ্যোগী পুরুষঃসিংহঃ” হইবে। ইহাদিগকে যে ক্ষেত্রেই ফেলিয়া দেন না কেন, ইহারা আপন পথ খুঁজিয়া নিতে সক্ষম হইবে। তাহারা কাহারও গলগ্রহ হইবে না, অথবা ভবঘুরে সাজিয়া ভ্রমণ করিবে না। আপনারা কি জানেন না ন্যাশন্যাল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ

কেহই নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া নাই? তাহারা প্রত্যেকেই ভাল ভাল কাজে নিযুক্ত আছে; অনেকে আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করতঃ নিজের ও পরিজনের সুখের কারণ হইয়াছে। কেহ কেহ মাসিক ১০০৲। ১২৫৲ উপায় করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের জন্য জ্ঞান উপার্জ্জন করা উচিত। অধ্যয়নকালে অর্থ-চিন্তা প্রবল করিলে প্রকৃত বিদ্যালাভে ব্যাঘাত জন্মে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও সেরূপভাবে বিদ্যোপার্জ্জনকারী লোকের সংখ্যা অতীব বিরল। অতএব উপার্জ্জন-সমস্যাটি সর্ব্বাগ্রে ভঞ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রগণের অভিভাবকেরা অনেক সময়েই সে চিন্তা করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়েন। বাস্তবিক তাঁহাদের হতাশ হইবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। কেননা ন্যাশন্যাল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত কাহাকেই নিষ্কর্ম্মাভাবে কাহারও দ্বারস্থ হইতে দেখা যায় না।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয়-শিক্ষা-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ বিভাগে কার্য্য করিবার জন্য বহু-সংখ্যক লোকের প্রয়োজন। বস্তুতঃ দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের নিতান্তই অভাব। যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারাই ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন। পরিষদের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে এ যাবত প্রায় ৪০ জন উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছেন, এবং সকলেই স্ব স্ব স্থানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া অধ্যাপকের প্রশংসালাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিলে শিক্ষাবিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। ইহাদের কেহ 'পরিষদে'র খরচে, কেহ 'মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি'র খরচে, কেহ 'বিজ্ঞান-সমিতি'র খরচে গিয়াছেন। অপরেরা নিজের বা আত্মীয়গণের খরচে গিয়াছেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ছাত্রগণ পবিত্র শিক্ষকতা-কার্য্যে, সাহিত্যালোচনা, গ্রন্থ-রচনা, সংবাদপত্র-সম্পাদন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উন্নত প্রণালীর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। আবার চাকরী করিতে হইলে তাহার পথও উন্মুক্ত রহিয়াছে। রেল কোং, জাহাজ কোং, চা-বাগান, কাপড়ের কল, পাটের কল ইত্যাদি, এবং ইন্সিওরেন্স কোং, সমবায়-সমিতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ইঁহাদের প্রবেশাধিকার আছে।

অনেকের বিশ্বাস যে এখানকার ছাত্রেরা সরকারী চাকরী পান না, ইহাও ভুলধারণা। আমি জানি সরকারী ডাকবিভাগ, যাদুঘর, সরকারী বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ইঁহারা কাজ পাইয়াছেন। ন্যাশন্যাল কলেজের একজন ছাত্র ৫০৲ টাকা বেতনে যাদুঘরের কাজ পাইয়াছেন, আর একজন ৬০৲ টাকা বেতনে এক Technological schoolএ Assistant Head masterএর পদ পাইয়াছেন, আর একজন ১০০৲ টাকা বেতনে এক Insurance Co.র Secretaryর পদে আছেন, ইত্যাদি আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। এমন কি ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের টেক্‌নিক্যাল বিভাগের একটি ছাত্র ৪০৲ টাকা বেতনে Port Trust officeএ এবং আর একটি ৪০৲ টাকা বেতনে District Boardএ কাজ পাইয়াছেন। আসল কথা যোগ্যতা চাই। যোগ্য ব্যক্তির আদর সর্ব্বত্রই আছে।”

১৯১১ এবং ১৯১২ এই দুই বৎসরে ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য ১২০০০৲ বার হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ বিদ্যালয়-পরিদর্শন সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট নহেন। রিপোর্ট হইতে এ বিষয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল:—

“গত দুই বৎসরে আমাদের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিতে, ছাত্র ও

স্কুল-পরিচালক মেম্বরদিগকে উৎসাহিত করিতে অনেক সদাশয় মহাত্মারই শুভাগমন হইয়াছে। তন্মধ্যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, এটর্ণি এট ল, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য এবং গৌরীপুরের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রফেসার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্, এ, দেশগৌরব শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ এম্, এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, "বরিশালহিতৈষী" পত্রিকার এডিটার এবং খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

চীনের ভবিষ্যৎ

শ্রীযুক্ত সনৎ সেন স্বায়ত্ত-শাসনাধীন চীনের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন :—

"আজ চীনের অবস্থা আগেকার অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত। দেশে একতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে; আগেকার মত গোলমাল বা বিশৃঙ্খলতা নাই, দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিদেশে যাতায়াতের পথের বেশ সুবিধা হইয়াছে; এই সব কারণেই আমাদের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। এখন দেশের কোন জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে সকলেই জানিতে পারে, এবং সব দেশটাও কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে সব খবর রাখিতেছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবের পর হইতেই প্রায় এক হাজার দৈনিক কাগজ চলিতেছে; আগে মোটে ৪০ কি ৫০ খানা ছিল; এবং কয়েক বৎসর আগে আরও কম ছিল, তাহাও কেবল মাত্র কয়েকটি বন্দরেই আবদ্ধ ছিল। টেলিগ্রাফের তার সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, শরীরের ভিতর রক্তসঞ্চালনের ন্যায় দেশের পল্লীতে পল্লীতেও সব খবর যাইতেছে।

আফিঙের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যেরূপ একটি আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে বোধ হয় চীনের ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। আগেকার দিনে এখনকার মত সহানুভূতি ও সফলতার সঙ্গে এরূপ একটি আন্দোলন কখনই সম্ভবপর হইত না। দেশের জাতীয় আন্দোলনের আহ্বানে সমগ্র চীনবাসী আজ সাড়া দিতেছে।

চীনবাসীরা বিদ্যালাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেক বালকই যে যেমন পারিতেছে, অমনি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছে;

কাজেই জোর করিয়া আর বিদ্যা শিখাইবার কোন দরকার নাই। বিদ্যাশিক্ষা দেশের মধ্যে বন্যার মত ছুটিয়া চলিয়াছে, এখন সর্ব্বসাধারণের জন্য কি প্রণালীতে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাই আমাদের ভাবিতে হইবে।

চীনবাসীদের আর্থিক অবস্থা আজ অনেক উন্নত হইয়াছে। তাহারা কৃষি-বিদ্যা ভাল করিয়া বুঝিতে শিখিতেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আগেকার অপেক্ষা দেশে স্বচ্ছলতার মাত্রাও বাড়িতেছে। গত দুই বৎসরের মধ্যেই যদিও গবর্ণমেণ্টের দারিদ্র্য ঘুচে নাই, কিন্তু লোকেদের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইতেছে।

রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও চীনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং আমাদের মনে হয় লোকগুলিকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে চীন একটা পরাক্রান্ত জাতি হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা শান্তিতে থাকিতে চাই, অন্য রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা বাধ্য না হইলে আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবার ইচ্ছা নাই। পাশ্চাত্য জাতিই যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহারা না করিলে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। চীনের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

আমি চীন ও জাপানের মধ্যে বন্ধুতা-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি। বড়ই সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে, চীনের সহিত জাপানের যে সখ্যনীতি আবশ্যক, তাহা অধিকাংশ জাপানীরাই বুঝিতে পারিয়াছে। এই উভয় দেশের পক্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে এইরূপ ভাবই মঙ্গল-জনক। চীন স্বতন্ত্র ভাবেই উন্নতিসাধন করিতে চায়।

অন্যান্য জাতি চীনকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিবে কি না, এ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি একমত না

হইলে এটা হইতে পারে না এবং ইহার কারণও আর কিছুই নয়। কোন কোন রাষ্ট্রশক্তি নূতন গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে চান না, দেখেন যে, এই সুযোগে কিছু রাজ্যলাভ হয় কি না। রুষিয়া চীনের পরিবর্ত্তে মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে ও অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিকেও এই মতে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত চীনের স্বাধীনতা বিঘোষিত না হইবে, ততদিন মঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রশক্তি কিছু বলিতে পারিবে না। অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তি চীনে যা খুসী তাই করিতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া তাহারা চীনের অঙ্গচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যখন সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি একমত হইবে, তখনই এইরূপ সম্ভব, কিন্তু অনেকে দেরী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ড তিব্বতের অবস্থার দিকে চাহিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। ফরাসীরা রুষিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। জার্ম্মাণী আমাদের দিকে অনুকূল বলিয়া মনে হয়, মার্কিণও জাপানের মতেই মত দিবে।

এই জাতি-সঙ্ঘাতের ফলে যে চীনের জাতীয় আন্দোলন বিশেষ বাধা পাইবে বা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবে, তাহা আমার মনে হয় না। বরং চীনের সমস্ত জায়গায় আমূল সংস্কার হইবে, শৃঙ্খলা বিধান হইবে এবং উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে, ইহাই আমার আশা।”

মালদহের কবি ও গায়কগণ *

এই প্রবন্ধের কিয়দংশ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পুরা-কাহিনী-সংগ্রহ বা প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানমূলক কোন তথ্য নাই। ইহা বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের সাহিত্য-চিত্রের একটি অংশবিশেষ। লেখক কয়েকজন আধুনিক কবি, গায়ক ও নর্ত্তককে বাঙ্গালার সাহিত্য-সংসারে পরিচিত করিতে প্রয়াসী। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় জনসাধারণের মধ্যে বহু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবী, কবি, লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, পরিহাস-রসিক আছেন। তাঁহারা বঙ্গের সারস্বতক্ষেত্রে যথার্থ গুণী ব্যক্তিগণের সঙ্গে সহচর বা অনুচরভাবে আসন পাইবার যোগ্য। যাঁহারা এই সকল শিল্পকলাবিৎ ব্যক্তিদিগকে বাঙ্গালীর নিকট পরিচয় করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের 'লোক'-সংখ্যা বাড়াইবারই আয়োজন করিতেছেন।

দুঃখের কথা—উচ্চশিক্ষার মোহে পড়িয়া আমরা দেশের জনসাধারণ হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছি। কেতাবী শিক্ষার ফোড়ন অথবা বি, এ, এম্, এস্, সি, উপাধির আড়ম্বর না দেখিলে আমরা কোন লোককে গুণী, শক্তিমান্ বা গণ্যমান্য মনে করিতে লজ্জা বোধ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইয়া আমরা শিখিয়াছি—পাশ্চাত্য কবি ল্যাঙ্গল্যাণ্ড অশিক্ষিত দরিদ্রের দুঃখ সাধারণের অসাধু অমার্জ্জিত ভাষায় প্রকাশ করিয়া ইংরাজ-সমাজে অমর হইয়াছেন। কৃষক কবি বার্ণস্ ভাঙ্গা ভাষায় গান গাহিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, লোক-সমাজে দরিদ্র নারায়ণের কথা প্রচার করিয়া জনগণের হৃদয়ে কত নূতন

---

* শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আশা নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছেন; গ্রে, কলিন্‌স্ প্রভৃতি কবিগণ কাব্যে জনসাধারণের জীবন চিত্রিত করিয়া সাহিত্য-জগতে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা এই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত ও অনুন্নত ব্যক্তির কবিত্বশক্তি, ভাবুকতা, চিন্তার স্বাভাবিকতা ও নির্ভীকতা, হৃদয়ের সরলতা, স্বদেশ-প্রীতি, অদম্য উৎসাহ এবং পবিত্র মানবসেবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি নানাবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকি। ইহারই নাম উচ্চ শিক্ষা। কিন্তু আমাদের চরণনিম্নে "উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা" যে কত সহস্র উদার-হৃদয়, সরলস্বভাব নৈসর্গিক-কবিত্বময় ব্যক্তির চিত্ত প্রকৃত বিশ্বপ্রেমে ও স্বজাতি-প্রীতিতে পুলকিত করিতেছে, তাহার সংবাদ রাখি না। আমাদের ঘরের উপর দিয়া যে ভাব-গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে—তাহার পুণ্য-প্রবাহে যে কত শত মানব-হৃদয় উর্ব্বর হইয়া জগতের সনাতন সত্যকে অঙ্কুরিত করিতেছে তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। দেশের এই সকল অমর আত্মাকে আমরা অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত অথবা ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। ইহাকে বলে চিত্ত-সংমোহন।

পূর্ব্বে আমরা ইহজগতের তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি নাই। এজন্য কত শত রামপ্রসাদ চণ্ডীদাসকে হারাইয়া আমরা অনুন্নত জাতির বংশধর ভাবে লজ্জায় জীবন যাপন করিতেছি। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া পাশ্চাত্য সমাজকেই মাথায় রাখিতে শিখিতেছি। এইরূপ আবার কত নূতন নূতন রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাসকে নীরব রাখিয়া দরিদ্র হইতে বসিয়াছি—কে জানে?

শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ, বাঙ্গালার জনসাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন বহু গ্রে, কলিন্‌স্, বার্ণ্‌স্ আপনাদের নিভৃত পল্লী-কুঞ্জে নীরবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিতেছেন। দেখিবেন তাঁহাদের

কেহ কেহ ব্যবসায়ে ও জাতিতে কামার বা নাপিত, কেহ হয় ত জোলা, কেহ বা সামান্য মিস্ত্রী, কেহ বা দর্জ্জি। কিন্তু হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন, জেলেই হউন বা ধোপাই হউন, এখনও তাঁহারা নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে গ্রে, কলিন্‌স্‌, বার্ণসের ন্যায় সহস্র সহস্র নরনারীকে তাঁহাদের কাব্যনাট্য-হাস্যের দ্বারা কখনও কাঁদাইতেছেন, কখনও তীব্র সমালোচনার দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেছেন, কখনও উৎকট বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া সংসারে পরমানন্দের ধারা ঢালিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের প্রভাব বড় কম নহে। তাঁহাদের প্রভাব ক্ষণিকও নহে। তাঁহাদের মৃত্যুর বহু কাল পর পর্য্যন্ত তাঁহারা লোকের হৃদয়ে জীবিত থাকেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায়ও অনেকে অসংখ্য নরনারীর মুখে মুখে ঘুরিয়া থাকেন। আমাদের আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এইরূপ "নরকুলে ধন্য" কয়জন লোক জন্মিতেছেন বা জন্মিতে পারিবেন বলিতে পারি না। অশিক্ষিত জনসাধারণের সমাজে এইরূপ 'অমর' কবি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় এখনও জন্মিতেছেন—এই কথা বুঝিতে পারা ও জানিতে পারা কি কম আশার কথা ?

যাঁহারা বঙ্গসমাজের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ শক্তিমান্‌ পুরুষগণকে লোক-সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য। আমাদের সাহিত্য-সংসারের লোকবল শীঘ্রই বাড়িবে, আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতেছি। কারণ আজকাল দু'একজন করিয়া উচ্চশিক্ষিত মহাত্মারা জনসাধারণের ভাবুকতা, সাহিত্যশক্তি ও ধর্ম্মভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। চট্টগ্রামের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে "পল্লীসেবকে"র লেখক প্রচার করিয়াছেন:—"যেখানে কৃষক লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গান ধরিয়াছে, 'মন তুমি কৃষি-কাজ জান না, এমন মানবজমি রইল পতিত, আবাদ

করলে ফলত সোনা' ; যেথানে তাঁতী কাপড় বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে 'ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান' ; যেথানে মাঝি নদীর স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া উদাস প্রাণে গাহিতেছে, 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাহিতে পারি না'—তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের গভীরতা বুঝিতে হইবে। তাহাদের নিকট সরলতা, ভক্তি ও তন্ময়তা শিখিতে হইবে। গম্ভীরার গান, ভাটিয়াল গান, বিষহরির গান, রাধা-কৃষ্ণ ও হরগৌরী সম্বন্ধীয় গান ইত্যাদি সকল প্রকার হৃদয়োচ্ছাসগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

আমেরিকায় গণিত-শিক্ষা

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটী ভালো বিদ্যালয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। সেখানে দেখবার জিনিষ ঢের আছে। কিন্তু তাদের সে সমস্ত বহুব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা দেখে আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভ নাই। কেবল, অঙ্ক শেখবার একটা যা প্রণালী দেখলুম সেইটে তোমাকে লিখ্‌চি। এরা ক্লাসে একটা খেলার মত করে—সেটা হচ্চে Banking. তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেক বই, ভাউচার, হিসাবপত্র সবই আছে। ছেলেদের কারো বা চিনির ব্যবসা, কারো বা চামড়ার—সেই উপলক্ষে ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের লেনা-দেনা এবং তার লাভ-লোকসান ও সুদের হিসাব ঠিক-দস্তুর মত রাখ্‌তে হচ্চে। এতে অঙ্ক জিনিষটাকে এরা গোড়া থেকেই সত্য ভাবে দেখ্‌তে পায়। ছেলেরা খুব আমোদের সঙ্গে এই খেলা খেল্‌চে। তোমার মনে আছে কি না বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বিদ্যালয়ের অঙ্কের ক্লাসে এই দোকান-রাখার খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। গণিতশাস্ত্রে আমার বিদ্যার পরিমাণ গণনায় অতি যৎসামান্য বলেই আমি এ জিনিষটাকে খাড়া করে তুল্‌তে পার্‌লুম না—কোন জিনিষ নূতন প্রণালীতে গড়ে তোলবার শক্তি ছিল না—এই জন্যে এটা ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু অঙ্ক জিনিষটা কি এবং তার ভুল জিনিষটা যে কেবল নম্বর

কাটার জিনিষ নয়, সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ, এটা খেলাচ্ছলে ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। ছোট ছোট কাপড়ের বস্তায় বালি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে—অবশ্য খাতা-পত্র ঠিক দস্তুরমত রাখ্‌তে শেখাতে হয়। এই জিনিষটাতে ওদের হাত দুরস্ত হলে প্রত্যেক ঘরেই আমরা বিদ্যালয়ের ডিপজিটের কাজ স্বতন্ত্র করে চালাতে পারি। প্রথমটা এটা গড়ে তুল্‌তে একটু ভাব্‌তে এবং খাটুতে হয়, কিন্তু তারপর কলের মত চলে যাবে।

আতাঁর বীচি ও তেঁতুলের বীচি দিয়ে টাকা-পয়সার কাজ চলতে পারে—কাগজ কেটে কতকগুলি নোটও তৈরি করে নিতে পার—এতে ওদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে। এই জিনিষটা একটু ভেবে দেখো। এদেরই স্কুলে এই জিনিষটার নূতন প্রবর্ত্তন হয়েছে—আমরা এদের অনেক আগে এই প্রণালীর কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমরা বাঁধা রাস্তার বাইরে কিছুই কর্‌তে পার্‌লুম না—আর এরা অনায়াসে এগিয়ে যাচ্চে—এইটে দেখে আমার মনে দুঃখ বোধ হল।"

পাঁচ ছয় বৎসর হইল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় গণিত-শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"সচরাচর যে প্রণালীতে গণিত-শাস্ত্রে শিক্ষা-প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহাতে ছাত্রকে কতকগুলি সংজ্ঞাহীন নির্জ্জীব সংখ্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়। সংখ্যা, রাশি ও সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ এবং পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সমস্তই কেবলমাত্র কাগজ বা বোর্ডগত প্রাণ হইয়া থাকে। এই সমুদয় তথ্য জীবন্ত সত্যের ন্যায় মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। মানুষের জীবনের সহিত এই

সকল জিনিষের সম্বন্ধ বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। এই জন্য এই সকল পদার্থ মৃত ও অচেতন বিবেচিত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে বিশেষ কোন দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় অথবা গণিতকার কোন চিত্র বা প্রকৃত ঘটনার সাহায্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়টি কথঞ্চিৎ সজীবতা লাভ করে। কিন্তু কেবল তাহার সাহায্যে গণিত-শাস্ত্রের অনুশীলনের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, এবং প্রকৃত অনুরাগ জন্মে না।

এই জন্য এক নূতন প্রণালী এই পুস্তকে অবলম্বিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনের বৈষয়িক কার্য্যকলাপের মধ্যে গণিত-শাস্ত্রকে আনয়ন করিয়া সরস করিয়া তোলা হইবে। প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহু পদার্থের পরিমাণ গ্রহণ করিতে হয়; বহু জিনিষ ওজন করিতে হয়। এই নিত্য ব্যবহার্য্য পরিমেয় পদার্থসমূহের প্রতি ছাত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইতে হইবে। দিন, ক্ষণ, লোক, স্থান, গৃহ, ধন, পশু প্রভৃতি পদার্থের পরিমাণ মানুষ আবহমানকাল গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। এই সকল শিল্প-বাণিজ্য এবং বিষয়-সম্পত্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সহিত গণনা ও পরিমাণ-শাস্ত্র ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেই সকল বিষয়সমূহের সহিত সম্যক পরিচিত হইলেই গণিত-শাস্ত্রে রসগ্রাহিতা জন্মে। নতুবা ভিত্তিহীন অলীক সংখ্যাতত্ত্ব শুষ্ক, দুরূহ ও ভীতিজনক বোধ হয়।

এই পরিমেয় পদার্থসমূহের পরিমাণ লইয়া অসংখ্য প্রকার প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রশ্নের বিষয় অবগত হইতে হইবে। লাভ-ক্ষতি, আদান-প্রদান, ঋণ-গ্রহণ, ঋণদান, ক্রয় বিক্রয়, বিভাগ, বিনিময় প্রভৃতি পরিমাণমূলক নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপার মানব-জীবনের বিচিত্রতা সম্পাদন করে, এই সকল ঘটনা অর্থনীতি-শাস্ত্রের আলোচ্য

বিষয়। এই সমুদয় কার্য্য-কলাপই মানব-জীবনের প্রধান অংশ। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এই সকল কার্য্যের বিবরণ গ্রহণ করা আবশ্যক। যত ক্ষেত্র ও যে যে স্থলে পরিমাণ গ্রহণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে——সেই সকল ক্ষেত্রের প্রশ্নের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

মানব-জীবনের সামাজিক কার্য্যাবলীর মধ্যে ধনসম্পত্তি ও শিল্প-বাণিজ্য লইয়া নানাপ্রকার কারবার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকাংশই অতি জটিল, দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ও সমস্যাপূর্ণ। সমবেত ব্যবসায়, যৌথ-কারবার, ব্যাঙ্কিং, রাজস্বের আদান প্রদান, সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়, অন্তর্দ্দেশিক ও বহির্দ্দেশিক বাণিজ্য, ঋণ-দান, ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ অতিশয় কঠিন ও বিচক্ষণতার সহিত বিবেচ্য। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক ব্যাপারসমূহের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন অবশ্য সহজ ও অল্পায়াসসাধ্য। কেবল মাত্র সেইগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই গণিতে উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। সুতরাং যে সমস্যাসমূহ মীমাংসা করিবার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে হয়, সেই সমুদয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তৎপরিবর্ত্তে শিক্ষার্থীকে সর্ব্ববিধ সমস্যার সরল সুবোধ্য দৃষ্টান্তসমূহই আলোচনা করিতে হইবে।

রাশি, সংখ্যা বা কোন সঙ্কেত ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে না। মুখে মুখে গণিতের সর্ব্ববিধ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। গণিত-শাস্ত্রে প্রকৃত প্রবেশ লাভ করিবার জন্য এবং বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত জটিল রাশি বা বৃহৎ সংখ্যা ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অতি-সরল এবং ক্ষুদ্রতম রাশি ব্যবহার করিয়াই, এবং সঙ্কেত-চিহ্নের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়াও মানুষের সর্ব্ববিধ পরিমেয় পদার্থসমূহের এবং পরিমাণ-গ্রহণকার্য্যের ধারণা করা যায়। অতি জটিল প্রশ্নও এই উপায়ে সরল

হইয়া পড়ে। কঠিন কঠিন অঙ্ক করিতে পারাই গণিতে ব্যুৎপত্তির লক্ষণ নহে। অনেক সময়ে একেবারে না বুঝিয়াও কেবলমাত্র সূত্র প্রয়োগ করিয়াই কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা উচিত যাহাতে বৃহৎ বৃহৎ রাশির অথবা জটিল সংখ্যার প্রয়োগ না করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র রাশি ব্যবহার করিয়াই সমগ্র গণনা-শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধারণা-শক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে বস্তু ধারণা করা বিধেয়। চিত্রাঙ্কনাদি উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করাই গণিত-শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী।

এইরূপে জীবনের নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয়টি আয়ত্ত হইলে পর শিক্ষার্থীর মানসক্ষেত্রে বীজগণিত, পাটীগণিত ও জ্যামিতি স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বুদ্ধিশক্তি-বিকাশের সহায়তা করিতে পারিবে।"

এই প্রণালী কতকগুলি স্কুলেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই অনুসারে শিক্ষাও দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বিনয় বাবুর এই পদ্ধতি কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা আমরা জানি না।

রবি বাবুও "জিনিষটাকে খাড়া করে তুলতে" পারেন নাই, "নূতন প্রণালীতে গড়ে তোলবার" শক্তি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে লোকেরা সকল বিষয়েই সফলতা প্রাপ্ত হয়। আমরা প্রায় কোন কাজেই সার্থকতা লাভ করিতে পারি না। আমাদের অপদার্থতাই কি ইহার একমাত্র কারণ?

বাঙ্গালীর সমাজেতিহাসের উপকরণ

বাঙ্গালী জাতি চিরকাল একটানা একভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বাঙ্গালীর সমাজ, সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্ম্মভাব সকলই নানা জাতির চিহ্ন, নানা প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শক্তিপুঞ্জ সমাজগঠনে সহায়তা করিয়াছে। এসিয়ার বিভিন্ন দেশবাসীর চিন্তা এবং কর্ম্মও বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য, ধর্ম্ম, কলা, শিল্প এবং বিদ্যাও বাঙ্গালার বাহিরে বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ-গঠনে উপকরণ যোগাইয়াছে, এবং বঙ্গের সভ্যতা নেপাল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, জাপান প্রভৃতি দেশের উপর নিজ বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহাদের ভাষাবিষয়ক, সমাজবিষয়ক, ধর্ম্মবিষয়ক, পুঁথিবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থাদির দ্বারা আমাদিগকে এইরূপ ইঙ্গিত দিয়া আসিতেছেন।

আমরা এই কথা মনে রাখি না। এজন্য বাঙ্গালার আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, কায়দাকানুনগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তাহার কারণ আছে। আজকালকার বাঙ্গালাদেশের চতুঃসীমা দেখিয়া সাধারণতঃ আমরা অতীত বঙ্গের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলির ধারণা করিতে পারি না। বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় সীমা অতীত কালে অসংখ্যবার অসংখ্য উপায়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গে রাষ্ট্রীয় জগতের কেন্দ্রস্থল নানা জনপদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বহু রাজধানী একই যুগে

নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং যুগে যুগে স্ব-স্বপ্রধান রাষ্ট্রশক্তি অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে আজ যেখানে সমাজের, ধর্ম্মের, বিদ্যা ও শিল্পের উৎস, কাল সেখানে তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান। সভ্যতা-গঙ্গা কোন্ এক অজানা পথের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ নূতন নূতন স্থানকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে চলিয়াছে।

আধুনিক বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে, আধুনিক হিন্দুসমাজের বিচিত্র বিধিনিষেধের প্রকৃত তথ্য জানিতে হইলে বাঙ্গালার অতীত যুগের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে। আধুনিক বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমা মাত্রে অনুসন্ধান আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। বঙ্গ, বাঙ্গালা, বঙ্গপ্রদেশ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলির মোহ ছাড়িতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে নূতন নূতন নামে নূতন নূতন জনপদে বাঙ্গালীর শক্তি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর পরিচয় পাইতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কেবলমাত্র মামুলি যুগবিভাগ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না। বৈদিক যুগ, হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ইত্যাদি শব্দের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে বিচিত্র জাতি-সংঘর্ষ, বিচিত্র শক্তি-সমন্বয়, বিচিত্র রক্ত-সংমিশ্রণ, বিচিত্র কর্ম্মপ্রবর্ত্তনের বিবরণ বাহির করিতে হইবে।

কিন্তু এতদিন বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে আমাদের বেশী লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের আলোচনায় সাহিত্যসেবিগণ বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। আজকাল বঙ্গে জাতীয় জাগরণের যে সকল শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে অর্থব্যয়, সময়ব্যয়, কষ্টস্বীকার, স্বার্থত্যাগ ও আন্তরিকতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য এক্ষণে নানা পরিষৎ ও সমিতির সাহায্যে শতগুণ প্রসার লাভ করিয়াছে বলিলে

কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতায় বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষৎ, মালদহের জাতীয়শিক্ষা-সমিতি, রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, বীরভূমের সাহিত্য-পরিষৎ, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীহট্ট সাহিত্য-সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন; উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, সুরমা সাহিত্য-সম্মিলন ইত্যাদি নানা কর্ম্মকেন্দ্রে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অনুসন্ধান-কার্য্য চলিতেছে। যাঁহারা বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ ভাবে মনসংযোগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক. শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি লেখকগণ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলসমূহ এখনও স্থিরসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণীয় হয় নাই। তাঁহাদের সকলের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইঁহাদের সকলেই যে, সকল স্থলে অকাট্য যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছেন, তাহা নহে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা, পরস্পর তাচ্ছীল্যভাব, অহম্মন্যতা ইত্যাদি সাহিত্যসেবিসুলভ দুর্ব্বলতা ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আমরা দেশের দিক্ হইতে, দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিক্ হইতে, সমাজের প্রাচীন তথ্যাবিষ্কারের দিক্ হইতে অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছি। ইঁহাদের গবেষণায় আমরা নূতন কথা ভাবিতে অভ্যস্ত হইতেছি, অশ্রুতপূর্ব্ব, অবিশ্বাস্য ঘটনার সংবাদ পাইতেছি, অলীক-কাহিনীস্বরূপ নানা কথা শুনিতেছি। মোটের উপর, একটা অনুসন্ধিৎসা, বিবিদীষা, ঐতিহাসিক সাহিত্যে কৌতূহল, যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকা ইত্যাদি উন্নতির নানা কারণ আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালীর যে একটা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আছে, অন্ততঃ এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। বাঙ্গালার অতীত যুগে নানাস্থানে রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকাশলাভ হইয়াছে, তাহা সন্দেহ করিবার আর কারণ নাই। গত কয়েক বৎসরের সাময়িক পত্রিকাগুলির পাতা উল্টাইলেই এই বিশ্বাস জন্মিবে। তাম্রশাসন, পুঁথিপাঠ, মুদ্রাতত্ত্ব, মূর্ত্তির বিবরণ, রাঢ়-অনুসন্ধান, কামরূপ-অনুসন্ধান, গৌড়ভ্রমণ, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান, ইত্যাদি বিবিধ আলোচনার ফলে বাঙ্গালার জেলাগুলির অতীত রাষ্ট্রীয় মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইতে থাকিলেই আমাদের সমাজের কাজকর্ম্ম, সৌজন্য-শিষ্টাচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলই আয়ত্ত হইবে। জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে কখন আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিব না।

প্রাচীন বাঙ্গালায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র

শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্যে' তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনটিই বাঙ্গালাদেশের রাষ্ট্রীয়সীমা-পরিবর্ত্তনবিষয়ক। প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাঢ়, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের পরস্পর সম্বন্ধ কোন্ যুগে কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্, এ, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বিক্রমপুর প্রভৃতি জনপদের প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে 'গৌড়রাজমালা'-লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসিগণের স্বাধীনতার যুগের একটা চিত্র দিয়াছেন। এই প্রবন্ধত্রয়ে

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্নকালের কয়েকটা রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবৃত হইয়াছে :—

(১) অশোকের পিতৃপিতামহের শাসন-সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক রাষ্ট্রভুক্ত ছিল। মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বর্ণনানুসারে গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত কলিঙ্গ নামে এবং 'গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি' একটি যুক্তরাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। (২) অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ে অঙ্গ-বঙ্গ-বিজয়ও অনুমিত হয়। কারণ "কতকগুলি কারণে মনে হয়, তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত একটি যুক্তরাজ্যরূপে পরিচিত ছিল।" (৩) খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহামেঘবাহন খারবেল কলিঙ্গ হইতে দিগ্বিজয় আরম্ভ করেন। তাহার ফলে 'রাষ্ট্রীকগণ' অনুগত হইয়া তাঁহার মগধ-আক্রমণে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা অঙ্গ-বঙ্গেও তাঁহার প্রভাব স্বীকৃত হইয়া থাকিতে পারে। খারবেল জৈনধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। অঙ্গ-বঙ্গে জৈন-প্রভাবের বহু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। (৪) তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সাহিত্যনিহিত একটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মনে করেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে "কলিঙ্গ-রাজ্য আন্ধ্রসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং অঙ্গ-বঙ্গেও তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।" (৫) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গ কিয়ৎকালের জন্য গৌড়াধিপ শশাঙ্কের করতলগত হইয়াছিল। তখনও ইতিহাস-বিখ্যাত পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। (৬) খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ধর্ম্মপালদেব উৎকল অতিক্রম করিয়া আধুনিক কলিঙ্গের শেষসীমা পর্য্যন্ত "দুষ্টদমন" করিয়াছেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তিনি কলিঙ্গে "মাৎস্য ন্যায়" দূরীভূত করিয়া সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের তিরোভাবের পর উৎকল একবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিল।

সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার পুত্র দেবপালদেবও দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তিনি "উৎকল-কুলকে উৎকিলিত করিয়াছিলেন।" "ধর্ম্মপালদেবের ও দেবপালদেবের প্রায় শতবর্ষব্যাপী শাসনকাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গৌরবের কাল।" "এই যুগের কলিঙ্গের কথা অঙ্গ-বঙ্গ-কথার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।" "কলিঙ্গ অঙ্গ-বঙ্গেরই কণ্ঠলগ্ন ছিল; গৌড়েশ্বরগণের প্রবল প্রতাপ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে তুল্য ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এখনও বাণিজ্য-কুশল গৌড়ীয় বৈশ্যগণের বংশধরগণ পূর্ব্বস্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতেছে।" বাঙ্গালীর কলিঙ্গ-বিজয়ের জনশ্রুতি বঙ্গদেশে একেবারে অপরিচিত ছিল না। তাহা এক সময়ে পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেনের আখ্যায়িকায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

যাঁহারা প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করেন, তাঁহারা মৈত্রেয় মহাশয়ের এই উক্তি-সমর্থনোপযোগী অনেক নূতন তথ্য দিতে পারিবেন আশা করি। যাঁহারা বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব-আমোদ, পূজাপদ্ধতি ইত্যাদির বর্ত্তমান অবস্থা এবং প্রাচীন যুগ হইতে ক্রম-বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাও বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু মুসলমান-যুগে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত 'আদ্যের গম্ভীরা'-গ্রন্থে উড়িয়া জাতির সহিত বাঙ্গালীর সংযোগ ও ঐক্যের কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। উৎকলের 'সাহীযাত্রা'-উৎসবের বিবরণে তিনি গৌড়ীয় গম্ভীরা এবং রাঢ়ীয় গাজনের এক-গোষ্ঠীভুক্ত উৎসবের পরিচয় দিয়াছেন। এই দিকে অনুসন্ধান বাড়াইয়া দিলে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সংমিশ্রণের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত

হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আরও দুইটি কথা জানা যায়। (৭) একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল প্রবল যুদ্ধে দুর্গম ওড্রবিষয় পদানত করিয়া কোশলনাড়ু, তন্দবুত্তি, তক্কণ লাড়ম্ ও বঙ্গাল দেশ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। (৮) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে গঙ্গাবংশ দীর্ঘকাল কলিঙ্গের সঙ্গে উৎকল—কখনও কখনও বঙ্গভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ অধিকারভুক্ত করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় মহাশয়ের অধিকাংশ তথ্যই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল অনুমানের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষজ্ঞগণ ভবিষ্যতে বিচার করিয়া দেখিবেন। কিন্তু এই সমুদয় হইতে বর্ত্তমানে আমরা অন্ততঃ এইটুকু ধারণা করিতে পারি যে, বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে উড়িয়া জাতি এবং এমন কি আন্ধ্র প্রদেশের দ্রাবিড় জাতিকে বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, শিল্পে দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রভাব স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে।

মৈত্রেয় মহাশয় বাঙ্গালীর ইতিহাস যেখানে শেষ করিয়াছেন, অধ্যাপক বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রায় সেই খানেই আরম্ভ। তাঁহার ঐতিহাসিক অনুমানসমূহ বাঙ্গালার খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর কিয়দংশ লইয়া ব্যাপৃত। তিনি গৌড়ীয় পাল-সাম্রাজ্যের অবসান কালের এক চিত্র দিয়াছেন। নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁহার বক্তব্য—(১) রামপালের পর কুমারপালদেব 'বরেন্দ্রী'তে রাজ্যশাসন করিতেন, তাঁহার সময়ে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কোন কোন বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল, কতকগুলি দমন করিতে পারা যায় নাই। (২) এই সময়ে 'বঙ্গে' (বিক্রমপুর রাজধানী) বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থান

হইয়াছিল। (৩) অপর দিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া বরেন্দ্রীতে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। (৪) কুমারপালের প্রধান সচিব ও সেনাপতি দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ংই কামরূপে তিগ্মদেবকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। (৫) এই সুযোগে পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলতা দেখিয়া 'চন্দ্রদ্বীপে'র (খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরে) শ্রীচন্দ্রদেব 'বঙ্গে'র রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার পূর্ব্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। শ্রীচন্দ্রদেব বৌদ্ধ ছিলেন। (৬) ইহার কিছু কাল পরে বিজয় সেন বরেন্দ্রীতে পালরাজগণের ধ্বংস বিধান করিয়া বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রদেবের বৌদ্ধরাজ্য অধিকার করেন।

বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধে বাঙ্গালায় এক সঙ্গে চারিটি রাজধানীর অস্তিত্ব অবগত হওয়া গেল—গৌড়, বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও কামরূপ। রাষ্ট্রের প্রভাব সমাজের উপর বড় কম নহে। এই কারণে এই চারি স্ব-স্বপ্রধান রাষ্ট্রে জনসাধারণের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল প্রকার উৎকর্ষ নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালার সভ্যতার চারিটি কেন্দ্র অর্থাৎ চারিটি 'সমাজ' যুগপৎ গড়িয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাঙ্গালীর ইতিহাসের ঠিক পরবর্ত্তী যুগের কিয়দংশ বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই—(১) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রাক্‌কালে রাঢ় ও বরেন্দ্র মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। (২) তাহার কিয়ৎকাল পরে অহোমেরা পূর্ব্বোক্ত কামরূপ (এখনকার আসাম) দখল করেন। (৩) ফলতঃ উত্তরবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র জনপদ, পশ্চিম কামরূপ (জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও গোয়ালপাড়া জেলা) ত্রয়োদশ

শতাব্দে দুইটি নূতন প্রবল জাতির আক্রমণ হইতে এই জনপদের অধিবাসীবৃন্দকে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইয়াছে। ইহাদের আত্মরক্ষা-কাহিনী আলোচনা করিলে "ইতিহাসজ্ঞের নিকট রাজপুত, মারাঠা ও শিখ যেরূপ পূজা পাইয়া আসিতেছেন, ইহাদিগকেও সেইরূপ পূজা দিতে প্রবৃত্তি হয়।" এই প্রদেশ সেন ও রাজবংশী এই দুই জাতির বাসস্থান—ইহারা আকারে, আচারে ও ভাষায় বাঙ্গালী। "সুতরাং পশ্চিম কামরূপবাসীর গৌরবে রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গদেশ-বাসীর গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

আমরা এই তিনটি প্রবন্ধ হইতেই বহু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। অনেক স্থলেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখকগণ চলিয়াছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ধারণা জন্মিবে যে বাঙ্গালা দেশের মাটির উপর বাঙ্গালী জাতির অভ্যন্তরে যুগে যুগে অসংখ্য পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন রাজধানী-স্থাপনের ফলে বাঙ্গালীর বিদ্যা, কৌশল, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্ম্ম নানা কেন্দ্রে নানাভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন 'সমাজ' গড়িয়া উঠিয়াছে।

এক অবস্থায় যে স্থান কোন রাষ্ট্রের সীমান্তপ্রদেশ মাত্র, অপর অবস্থায় তাহাই হয় ত এক নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের কেন্দ্র। এক সময়ে যাহা রাজধানী, অপর সময়ে তাহা হয় ত সীমান্ত-প্রদেশ। বাঙ্গালীর সভ্যতার ইতিহাস-লেখকগণ এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। তাহা না হইলে বাঙ্গালী জাতি কত বিচিত্র শক্তি-সমাবেশে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে না। আজকালকার অবস্থা দেখিয়া প্রাচীন বাঙ্গালীর গতিবিধি, কাজকর্ম্ম, চলাফেরা, কৌশল-নৈপুণ্য, রাস্তা-ঘাট, কিছুই অনুমান করা সম্ভব নহে। সভ্যতার স্রোত কখন কোথায় কোন্ পথে কিরূপভাবে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী জাতির

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অসংখ্য পরিবর্ত্তনগুলি, তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার জন্য চীন, তিব্বত, নেপাল, আসাম, ব্রহ্মদেশ, যুক্তপ্রদেশ দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র—এই সকল স্থান বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। বাঙ্গালার যাঁহারা ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহাদিগকে এই সকল দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে, জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং জাতীয় জীবনের গূঢ় কথাগুলি অবধারণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় জলপ্লাবন

দামোদরের বিগত বন্যায় ভগবতী আবার চণ্ডী মূর্ত্তিতে বাঙ্গালায় দেখা দিয়াছেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্যই জননীর তাড়না। তাই দেখিতেছি একদিকে যেমন জীব-জন্তু, ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র-আহার্য্যদ্রব্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর একদিকে তেমনি আর একটা জিনিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেটি আমাদের জড়তা, আলস্য-প্রিয়তা। মানুষের মধ্যে পরসেবার যে চিরন্তন প্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে, তাহাই আজ দেশের চারিদিকে নবভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আজ দেখা যাইতেছে কেহই আর্ত্তের রোদনে কর্ণপাত করিতে কুণ্ঠিত নহে—সকলেই আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে, সকলেই সাধ্যমত বিপন্নের সাহায্যজন্য ব্যগ্রচিত্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্দ্ধোদয়-যোগে আমরা এই পরদুঃখকাতরতা, এই পরসেবার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলাম এ দেশ আর ক্ষুদ্র নহে—এ দেশ স্বার্থসঙ্কীর্ণতার জাল ছিন্ন

করিতে পারিয়াছে। আর আজ ভীষণ বন্যার ফলে বুঝিতে পারিতেছি, দেশে মাতৃসেবার আকাঙ্ক্ষা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে। আজ চারিদিক হইতেই সহানুভূতি, দানশীলতা, পরসেবানিষ্ঠার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। বিপন্নের সাহায্যকল্পে বহু সম্প্রদায়, বহু সঙ্ঘ, বহু স্বেচ্ছাসেবক কার্য্য করিতেছেন। হিন্দুস্থানবাসিগণ কলিকাতা মাড়োয়ারি সম্প্রদায়, ও আর্য্যসমাজ, কলিকাতা ও বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্ম-সমাজ, নিঃস্বহিতৈষিণী, মুসলমানছাত্রসঙ্ঘ, কলিকাতার কেন্দ্রীয় সাহায্য-সমিতি প্রভৃতি বহু সাহায্য-সম্প্রদায়, সেবাকর্ম্মে নিরত। এতদ্ভিন্ন আরও কত নূতন নূতন সাহায্য-সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে। কত শিক্ষক, কত ছাত্র, কত ডাক্তার, কত উকিল ব্যারিষ্টার স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য্য করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা কেহ খাদ্য, কেহ ঔষধ, কেহ কাপড়ের বস্তা মাথায় করিয়া আবক্ষ জলের মধ্য দিয়া চলিতেছেন--ভীষণ স্রোত, প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত, গর্জ্জনপর দামোদর, আজানু কর্দ্দম, আপতিত বৃক্ষরাশি, ভগ্নগৃহ, প্রাণক্ষয়কর পুতিগন্ধ কোন দিকেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বুঝি দেশবাসী তাঁহাদের শোণিতের বন্যায় এই বন্যা ভাসাইয়া দিতে অগ্রসর! এবার বাঙ্গালী জাতি দেশমাতা দুর্গার বোধন-কল্পে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে থাক—

"বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে সকলি দয়া তব জেনেছি মা দুখহরা।"

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমা *

ভারতবর্ষের সীমান্ত ও বৈদেশিক সমস্যার শেষ সমাধান কোন কালে হয় নাই, হইবেও না। কখনও কখনও শুনিতে পাই যে অমুক সীমান্ত-সমস্যার শেষ মীমাংসা হইয়া গেল বা অমুক জাতি এইবার যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছে; এখন হইতে প্রান্তদেশসমূহে শান্তি বিরাজ করিবে। প্রকৃতপক্ষে যখন ভারতের সমতল অতিক্রম করিলেই অপর রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিতে হয়, তখন স্বীকারযোগ্য শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। গ্রেট ব্রিটেন একদিন চিন্তা করিয়াছিল যে, যখন সে অত্যুচ্চ, হিমালয়-শিখর ও ঈষৎধূম্র 'খাইবার পাহাড়' পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন ভারতের সমস্ত গোলযোগই মিটিয়া গিয়াছে। সে যে প্রতারিত তাহা শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল। তাহার কতদূর ভ্রম হইয়াছিল সীমান্তজাতিসমূহের সমরসজ্জার বিস্তৃত কাহিনী হইতে বেশ জানা যায়। অনেক অর্থব্যয়ে আফগানিস্থানে যে দুইটি যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ঐ বাধাদানকারী মিত্র-রাজ্যের (Baffer State) জন্য উদ্বেগ ও চিন্তার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে অক্ষম। লাসা পর্য্যন্ত ইংরাজের সৈন্য গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনো তিব্বতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি অত্যন্ত বিরক্তিকর কার্য্য বলিয়া মনে হয়। বেলুচিস্থান ও মেক্রানের মরুভূমি ভারতকে দক্ষিণ পারস্যে বিজড়িত হইবার সম্ভাবনা

---

* বিলাতের বিখ্যাত 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-অবলম্বনে।

হইতে দূরে রাখিবে এমন নহে। চীনের বর্ত্তমান বিগ্রহবহ্নি কলিকাতা হইতে বহুদূরে; কিন্তু ইহার ফল ব্রহ্মদেশ ও আসামের সীমায় উপনীত হইয়াছে। সীমান্তের যুদ্ধবিগ্রহ দশ বৎসরের অল্পাধিক কাল নিবৃত্ত হইয়াছে। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই আমরা নানা পর্ব্বত ও ওয়াজিরী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমরাভিযানের কথা শুনিতে পাইতেছি। গত নব্বই বৎসরের মধ্যে পার্ব্বত্য জাতির আবরণস্বরূপ টিরা উপত্যকা অধিকার-কালে যে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমর-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তাহার অধিবাসী পুনরায় যে সেরূপ অগ্নি জ্বালাইবে না তাহা কে বলিল? আধুনিক রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে যে লর্ড কর্জ্জন সীমান্ত-ব্যাপারসমূহকে নিরাপদ, দৃঢ় ও সতর্কতাযুক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা করেন, তিনিও সীমান্তসমস্যার শেষ সমাধান করিয়াছেন এরূপ দাবী করিতে পারেন নাই। তিনি শান্তি স্থাপিত করিলেও সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই যে এ-ই স্থায়ী শান্তি। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর বিস্তৃত প্রান্তরাজ্যের সমস্ত অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়াছে। পারস্য এখন নানা অংশে বিভক্ত; তাহার অরাজকতা আমাদের সীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। আফগান ওলন্দাজদিগের দুঃসাহসের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তাহারা মেক্রানে উপদ্রব করিয়া সীমান্ত রাজনীতিতে বিপজ্জনক নূতন সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। পাঠানজাতি বাহ্যতঃ শান্তশিষ্ট; কিন্তু তাহাদের বিশাল অস্ত্রাগার ও গোলাবারুদ-ভাণ্ডার ভীতিপ্রদ সম্পত্তি বলিয়াই ধারণা হয়। আফগানিস্থানে খষ্টবিদ্রোহ (Khost rebellion) ও তাহাদিগের হস্তে আফগানের সমরনিপুণ স্থায়ী (Regular) সৈন্যের পরাভব হওয়াতেই রাজা হবিবুল্লার ক্ষমতা যে আমাদের ধারণানুরূপ নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়। চীন তিব্বতের উপর

পুনরাধিপত্য স্থাপন করিল; সুতরাং লাসার সহিত ভারত-গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ এখন বিচারসাপেক্ষ। আসাম ও ব্রহ্মদেশের উপান্তে পার্ব্বত্যজাতি ক্রমশঃ অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। চীনজাতি অন্তরোন্নতি সত্ত্বেও ক্রমশঃ তাহাদের সৈন্যাবাস আমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনয়ন করিতেছে। এই সমস্ত নূতন নূতন প্রশ্ন এখন একবার বিশেষভাবে আলোচ্য। একে একে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত পাঠান জাতির বিষয়ই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। এই আলোচনা যে বর্ত্তমান অবস্থার বিকাশ লইয়া নয়, এরূপ বুঝিতে বলি না। সীমান্তনীতির ভবিষ্যৎগতি কোন দিকে তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। অবশ্য পরবর্ত্তী দুই চারি বৎসরের কথা নয়, যতদিন অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাধ্য করিবে ততদিন আমাদিগকে এই নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সমস্যা যদিও ক্রমশঃ অর্থসচ্ছলতার উপর নির্ভর করিতেছে, তথাপি প্রধানতঃ উহা সাময়িক শক্তির অধীন। এই প্রশ্ন লইয়া যুদ্ধনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে দুইটি মত প্রচলিত। একদল স্বার্থরক্ষার বর্ত্তমান (অর্থদান) নীতির পক্ষপাতী; অন্যদলের মত, যেরূপেই হউক একটা শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে; অর্থের দ্বারা কত দিন চলিতে পারে? এক দিক হইতে উভয় মতই সত্য। বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত গোলযোগময়। ব্রিটিশ শাসনাধীন রাজ্যের সীমা সীমান্তরাজ্যের অতি নিকটেই শেষ হইয়াছে। মধ্যস্থিত স্থানসমূহ পর্ব্বত-সঙ্কুল ও অনুর্ব্বর হইলেও উর্ব্বর উপত্যকা-গুলিতে যুদ্ধপ্রিয় লোকেরই বাস। আইনের মর্য্যাদা রক্ষা তাহারা জানে না, এবং সংখ্যায়ও তাহারা তিন লক্ষের কম নহে। অধিকাংশ যোদ্ধা

আধুনিক যুগের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ইহাদের দুর্গের অনতিদূরে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সৈন্য রক্ষিত; আমরা তাহাদিগকে আমাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সৈন্যদলভুক্ত করিয়া থাকি। যদি তাহারা ব্রিটিশের অধীন জেলায় লুণ্ঠনাদি করে, তবে তাহারা শাস্তিও পাইয়া থাকে। কিন্তু ভারতের এই শান্তিরক্ষার প্রধান উপায় অর্থদান। এই পার্ব্বত্য জাতিকে যে অর্থদান করা হয়, তাহার পরিমাণ অধিক নহে, বরং ফলে অনেক বিদ্রোহের হাত হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা পায়, এই অর্থদানে বশীভূত রাখার প্রথা নূতন বা অপমানসূচক নহে; কারণ, স্মরণাতীতকাল হইতেই উহা চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগলেরা সীমান্ত জাতিকে কর দিতেন; হিন্দুস্থানের অন্যান্য শাসনকর্ত্তারাও ঐরূপ করিয়াছেন। যাহাই হউক না কেন, এ সতর্কতা কিন্তু বড়ই সন্দেহজনক ও অনিশ্চিত, কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে ইহা নষ্ট হইতে পারে। কোন সময়ে হয়তঃ আফগানিস্থানে একদল সৈন্য প্রেরণের আবশ্যকতা উপস্থিত হইতে পারে এবং ইহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন পথে যাইবে ইহাও সত্য। তখন ঐ সমস্ত ইংরাজের শাসন-বহির্ভূত জাতিদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বর্ত্তমান নীতির ফলাফল স্থির করিতে হইবে। যদি তাহারা ইংরাজসৈন্যের গমনাগমন ও সংবাদাদি আদানপ্রদানে বাধা দান করে, তবে বর্ত্তমান স্বার্থরক্ষানীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিবে। সম্ভবতঃ ইহার ফলে রেলওয়ে-বিস্তারই ভবিষ্যৎ সীমান্ত-নীতির লক্ষ্য হইবে।

যখন কাবুলের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের রাজ্যে রেলওয়ে বিস্তারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, তখন ভবিষ্যতে সীমান্ত-ব্যাপারে আমাদের বর্ত্তমান নীতির নিষ্প্রয়োজনীয়তা আশা করা যায়। নিশ্চয়ই প্রত্যেক গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া আফগানিস্থান পর্য্যন্ত লাইট

রেলওয়ে নীত হইবে এবং ট্রেণের গমনাগমনে পাঠানদিগের পুরাতন ধারণা-সমূহ অবশ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।* এই সুযোগে যদি তাহারা লাঙ্গল ত্যাগপূর্ব্বক অস্ত্রধারণে প্রবৃত্ত হয়? এইরূপ করিবার একটি কারণ, তাহাদের বর্ত্তমান জনসংখ্যার ভরণ-পোষণোপযোগী কর্ষণযোগ্য ভূমি নাই। সুতরাং একদিকে প্রবৃত্তি অন্যদিকে আবশ্যকতা তাহাদিগকে সমতল ভূমিতে আসিয়া লুণ্ঠন করিতে বাধ্য করিবে। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজ্য যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহার শান্তিরক্ষা বহু ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে। সামরিক ব্যয় চিরকালের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ও ভারতসৈন্য আফগানসৈন্যের অতিসান্নিধ্যে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বাস করিবে।

আফগানিস্থান

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবস্থা এইরূপ অনিশ্চিত ও গোলযোগপূর্ণ। এখন আফগানিস্থানের প্রশ্ন আলোচনা করা যাউক। এই রাজ্যের আয়তন ২৪৬,০০০ বর্গ মাইল; জন সংখ্যা ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ। ইহা অধিপতি কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে গড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভিতর দিয়া রাজা ও প্রজাবর্গ ব্যতীত আর কাহারও অবাধগমনের অধিকার নাই। এরূপ রাজ্য এসিয়াতে চিরকালের জন্য অন্য সকল হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না। চীন একদা বহিঃস্থ অসভ্য জাতি হইতে পৃথক থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল, জাপান নিজের নির্জ্জন গণ্ডীর মধ্যে বাস করিত, কিন্তু উভয়েই অনেকদিন হইতে বহিঃস্থ চাপে মস্তক অবনত করিয়াছে। অবশ্যম্ভাবী ঘটনাক্রমে একদিন আফগানিস্থানও ঐরূপ করিতে বাধ্য হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইবে না। আফগানিস্থানের অবস্থায় মনে বিস্ময়ের উদ্রেক

হয়। কারণ বহিঃস্থ পৃথিবীর সংস্পর্শ হইতে ইহার পৃথগবস্থান অতি অল্পদিনই ঘটিয়াছে। বহু শতাব্দী হইতে ইহা এসিয়ার একটা বিস্তৃত রাজপথ সদৃশ ছিল; এবং ইহা যেমন অন্য কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে অধিকৃত হইয়াছে তেমনি সময়ে সময়ে অন্য দেশ অধিকারে অভিযানও করিয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে ইংরাজকর্ম্মচারীরা আফগানিস্থান বিষয়ে বর্ত্তমানাপেক্ষা অনেক বেশী জানিত। যে আব্দার রহমান ইংরাজ সাহায্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন তিনিই বহিঃসংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তবে তিনি জানিতেন আবশ্যক হইলে সন্ধির প্রস্তাবানুযায়ী ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীও এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছেন। আফগানিস্থান যে একদিন তাহার প্রাচীর ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তাহার কারণ তাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া ইউরোপে যাইবার সহজ ও সরল পথ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ সার টমাস হলডিক্ প্রমুখ লোকেরা বিবেচনা করেন, পারস্যের ভিতর দিয়া লৌহবর্ত্ম না যাইতে পারে, কিন্তু সহজ ও দ্রুত পথে ইউরোপে যাইবার রাস্তা আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিবে, ইহা নিশ্চিত। রাজা হবিবুল্লার মত উহার প্রতিকূলে নয়; কারণ তিনি জানেন ইহাতে তাঁহার রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু প্রজাগণের মত ইহার অনুকূলে নয়। সুতরাং রাস্তা-নির্ম্মাণের অনুকূল মত গঠন করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবে। এখন চিন্তার বিষয়, দুরাণিবংশ দেড় শত বৎসর রাজত্ব করিল, আর কত কাল তাহারা একযোগে উহা রক্ষা করিতে পারিবে। আব্দার রহমানের মৃত্যুকালে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উত্তরাধিকারীর সৌভাগ্যরবি শীঘ্রই অস্তমিত হইবে। হবিবুল্লা দ্বাদশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিলেন, কিন্তু গত দুই বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে তাঁহার আসন

টলিয়াছে। কতিপয় প্রজা শুল্ক দিতে অস্বীকার করিয়াছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। সৈন্যগণের ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার ন্যায় নিপুণতাও আর নাই। রাজা হবিবুল্লা যদিও ভারত-গভর্ণমেণ্টের উপর কতকটা অসন্তুষ্ট, তবু তাঁহার রক্ষায় ব্রিটিশের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকিবে, সুতরাং তাঁহারা কোন দিন হবিবুল্লার উচ্ছেদসাধনের সমর্থন করিবেন না।

তিব্বত-সমস্যা

ভারত-সীমান্তের সমস্যাগুলির মধ্যে তিব্বতপ্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা সমাধানযোগ্য। লাসার ব্রিটিশ-প্রতিনিধি চীনের বাধ্যতা অগ্রাহ্য করেন নাই। তিব্বতের সহিত ইংলণ্ডের রাজনীতিক সম্বন্ধ চীনের সাহায্যে রক্ষিত হইবে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রুশের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয় তাহাতে তিব্বতের অন্তর্ব্যাপারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এই একটা সর্ত্ত হয়। চীন এই সুযোগে তিব্বতের জনবহুল অংশ পুনরধিকার পূর্ব্বক তাহাকে বশ্যতার পরিবর্ত্তে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করাইতে চেষ্টা করে। গ্রেট ব্রিটেন চীনের এইরূপ ব্যবহার আশা করেন নাই। বর্ত্তমান বিগ্রহ ঘটনাক্রমে চীনের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অরাজকতায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাসার চৈনিক সৈন্য তিব্বতীয়দিগের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিয়া মুক্তি ঘোষণা করিল। লাসার অধিবাসীরা লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরিয়া লইতে দলবদ্ধ হইল; তিব্বত হইতে চীনাদিগকে বহিষ্কৃত করিল ও দালাইলামা পুনরায় লাসায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিব্বত এখন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, তাহার উপর পিকিনের কোন আধিপত্য নাই। একদল চীনা সৈন্য তিব্বতে প্রবেশ করিতে যাইয়া পরাজিত হইয়াছে; অনেক কামান-বন্দুক শত্রুকরে অর্পণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত কোন পথ আবিষ্কার

করিতে পারে নাই। শুনা যাইতেছে, তিব্বতের পূর্ব্ব দিকের প্রবেশদ্বার দুর্ভেদ্য। উহা ভেদ করিতে চীনের প্রাণপণ চেষ্টাও ব্যর্থ হইতেছে। জিয়াংসিতে ব্রিটিশের একজন বাণিজ্য-প্রতিনিধি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে এখনও ব্রিটেনকে ১৯০৬ সালের পিকিন সন্ধি ও ইংরাজ-রুশের সন্ধি অনুসারে পিকিনের মধ্য দিয়া সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়। যদি তিব্বতে চীনের কোন আধিপত্য স্বীকৃত না হয়, তবে কি হইবে? লাসা-সন্ধিতে গ্রেট্ ব্রিটেনকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় পৃথক সত্ব বা অধিকার দেওয়া হয়। তিব্বত-গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক লইয়া তিনি উহার প্রয়োগ করিতে পারিবেন এই স্থির করা হয়। এই সত্বের সাহায্যে আমরা তিব্বত-গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব স্বীকার করি। এখন যদি ঐ গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিকই কৃতকার্য্যতার সহিত চীনের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া থাকে, তবে গ্রেটব্রিটেনকে তাহা মানিয়া লইতে ও তিব্বতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। এই পন্থা অবলম্বন করিতে রুশ-ইংরাজের সন্ধির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ভারতের সীমান্তব্যাপারে তিব্বতে গোলযোগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ব্রিটিশ-নীতি এই নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠন করা আবশ্যক; যে সকল বন্দোবস্ত উপন্যাস বা প্রহসনে শোভা পায়, তাহাতে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় চিরকালের জন্য লাগিয়া থাকা আর উচিত নয়। সম্ভবতঃ পর্ব্বতমালা ও মরুভূমি-পরিবেষ্টিত তিব্বত অপর কতকগুলি কারণেও অনেকদিন পর্য্যন্ত বহির্জগৎ হইতে কতকটা পৃথক থাকিবে। যদি কোন দিন তাহার উচ্চ মালভূমিতে যাইতে কাহার বাসনা হয়, সে কেবল তাহার পশ্চিম-উপত্যকায় শৈবলিনীর তলদেশজাত স্বর্ণরেণু লাভের আশায়। তিব্বতভূমি ক্লনডাইক্ অপেক্ষা অনেক অধিক স্বর্ণের অধিকারিণী ইহাই লোকের বিশ্বাস। সময়ে মানবজাতির দৃষ্টি ঐ দিকে আকৃষ্ট হইবে।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত

উত্তর-পূর্ব্ব সীমার অবস্থা উত্তর-পশ্চিমের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্। পাঠান রাজ্যের ধূম্রবর্ণাভ পর্ব্বতমালার পরিবর্ত্তে উত্তর-পূর্ব্বে হিমালয়ের পাদদেশ স্থিত দুর্ভেদ্য জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী বিরাজিত। স্রোত-উপম বৃষ্টিধারা নিপীড়িত ঐ স্থান কিয়ৎকাল বেগগামী প্রবাহ সকলে এরূপ খণ্ডাকার ধারণ করে যে, মানুষের গমনাগমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। ওখানে পার্ব্বত্য মানুষগুলি আদিম মঙ্গলীয়দিগের বংশসম্ভূত; তীর-ধনুকে ও প্রাচীন কালের অন্যান্য অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত, তাহারা আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করে। যুদ্ধের জন্য এক প্রকার প্রাচীর বা বেষ্টনী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হয়। বনের মধ্যে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য নির্ম্মিত আবাসস্থানে সময়ে সময়ে যে সমস্ত শত্রুদল উপস্থিত হয়, তাহাদের বিনাশের জন্য উহারা স্থানে স্থানে গর্ত্ত করে ও ভিতরে সূচ্যগ্র কাঠ পুঁতিয়া রাখে। মাঝে মাঝে ইহাদিগকে দমন করিতে শান্তিরক্ষাকারী সৈন্যের অভিযান আবশ্যক হয়, কিন্তু এই দিকে এখনও ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এত দিন ইহার ফল ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল। উহা ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে ও বৃহৎ সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তিব্বতীয় ও চৈনিকদিগের অশান্তির ফলে ইংরাজের সত্ব ও সীমা আরও পরিষ্কাররূপে নির্দ্ধারিত করার সময় আসিয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে কতকাংশে আজিও প্রকৃতরূপে সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পরিশেষে এদিকের সীমান্ত-নীতিও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ যাবৎ আসাম ও ব্রহ্ম-দেশের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। একটু একটু স্থান কিয়ৎপরিমাণে গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হইয়াছে। উহাদের

অধিবাসীরা অল্পসংখ্যক সামরিক পুলিশের সাহায্যে কতিপয় কর্ম্মচারী দ্বারা পুরাকালের আদিম শাসন-পদ্ধতিতে শাসিত হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্টের কয়েকটি অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যও আছে; তাহাদিগকে কোন কাজেই এ পর্য্যন্ত বিশেষ বাধা দেওয়া হয় নাই। অবশিষ্ট বহুবিস্তৃত অনেক স্থান ব্রিটিশ-অধিকৃত বলিয়া কথিত হয়। বস্তুত সে সকল নাম মাত্র। ঐ সমস্ত স্থান মানচিত্রে লোহিত বর্ণে চিত্রিত করা হয়, কিন্তু রাজ্যেশ্বরের কোন আদেশ সে পর্য্যন্ত পৌঁছায় কি না সন্দেহ। যখন কোন সৈন্যদল কোন অন্যায় কার্য্যে বাধা দিতে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, তখন ব্রিটিশ-শক্তির সহিত তাহাদের' একটু পরিচয় হয়। এই সীমান্তের সমস্যাসম্বন্ধেও নানারূপ মতামত বিদ্যমান। অনেকে বলেন ইংরাজ ক্রমান্বয়ে তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীমা পর্য্যন্ত সমানাধিপত্য লাভ করিবে। সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আর সেই জনশূন্য ও ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত বসবাসসম্পন্ন সহস্রক্রোশব্যাপী স্থানের উপর আধিপত্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত ভূখণ্ড প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে অপসারিত করিয়া একটা নূতন "উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত-প্রদেশ" গঠিত করা উচিত ও উহা রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক। পরিশেষে এইরূপ ঘটিবে ইহাও ঠিক। তাহা হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ব্যয়সঙ্কুল ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের হস্ত হইতে কিছু নিষ্কৃতি পাইবেন ও ঐ নূতন প্রদেশের বন্দোবস্তও সত্বরই সাধিত হইবে।

বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার *

'গৃহস্থে'র আর এক বৎসর চলিয়া গেল। বাঙ্গালা-ভাষার সাহায্যে আমরা ভারতের গৃহস্থগণের নিকট নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের 'আলোচনা', 'মফঃস্বলের বাণী', 'প্রবন্ধ' ও 'পরিশিষ্টে'র ভিতর দিয়া নানা সমস্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। সকল দিক হইতে বর্ত্তমান যুগের গৃহস্থ-ধর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। এ বৎসরও আমরা যথাসাধ্য সেই চেষ্টাই করিব।

এই পৃথিবীতে আমরা শক্তিরই খেলা দেখিতেছি। অনলে ভূতলে, পর্ব্বতে জলে, জীবে মানবে, সমাজে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই শক্তির কার্য্য অহরহ চলিতেছে। ভাঙ্গনে গড়নে, বিনাশে বিকাশে আমরা শক্তির পরিচয় পাই। সমগ্র বিশ্বজগৎ শক্তিময়ের রঙ্গভূমি, শক্তিমান্ ভগবানের ক্রীড়া-ক্ষেত্র—শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, শক্তিদ্বারা পরিচালিত।

শক্তির এই বিরাট কেন্দ্র হইতে যে যত অংশ নিজের আয়ত্ত করিতে পারে, সে-ই তত মানুষ-নামের অধিকারী। জগতের শক্তি-পুঞ্জের সঙ্গে সম্মুখ-সমর—ইহাই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম। মানবের জীবন এই সংগ্রামেই বিকাশ লাভ করে। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই মানবশক্তি ও বিশ্বশক্তির যুঝাযুঝি ও বুঝাপড়ার বিভিন্ন ফল। বিজ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল, রেলগাড়ী বল, ঐশ্বর্য্য বল, সুখভোগ বল, সাম্রাজ্য বল, "স্বারাজ্য-সিদ্ধি" বল—সকলই এই সম্মুখসমরে জয়-লাভের ভিন্ন মূর্ত্তি। যুগযুগান্ত ধরিয়া মানুষ পৃথিবীকে এইরূপে নিজ বশে আনিতেছে

* কার্ত্তিক, ১৩২০।

—জগতের শক্তিপুঞ্জকে নিজের কাজে লাগাইতেছে—বিশ্বশক্তিকে যথাসম্ভব হজম করিয়া নানাবিধ মানবীয় শক্তি-কেন্দ্র গঠন করিতেছে। পৃথিবীকে এইরূপে ভোগ করা—সংসারের সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া তাহার উপর মানবের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করা—এই সকল কাজকে সাধারণ লোকেরা ভুল বুঝিয়া বলিবে—বীরত্ব। সত্য কথা বলিতে গেলে—এই সব মানবধর্ম্ম মাত্র। 'মানবত্ব' ও 'বীরত্ব' প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিশব্দ। মানবমাত্রেই বীর, সংসারের শক্তিনিচয় করতলগত করিবার জন্যই তাহার জন্ম—বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভই তাহার ধর্ম্ম। প্রাণ-বিজ্ঞান ও মানব-বিজ্ঞানের ইহাই একমাত্র স্থিরীকৃত সত্য।

কিন্তু নিজের প্রকৃতি, নিজের ধর্ম্ম কয়জনের মনে থাকে? ভাবুক কবি বলিয়াছেন:—"Our birth is but a sleep and a forgetting." আমরা দিন দিন কেবল ভুলিয়াই চলিয়াছি। মানুষ তাহার মহত্ত্ব, তাহার দেবত্ব, তাহার অসীমতা, তাহার বিশালতা কখনই স্মরণে রাখে না। জন্ম, জরা, মায়া, মোহ, পৃথিবী, সংসার সবই মানুষকে সর্ব্বদা 'কাবু' করিবার জন্য প্রস্তুত; মানুষকে নানা উপায়ে ছোট, হীন, ক্ষুদ্র, পঙ্গু, জড়, দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে চেষ্টিত। সংসারে এই মায়া-বিভীষিকা ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য, মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতা বুঝাইবার জন্য, মানবকে দেবত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতের মহাপুরুষগণ প্রচার করিয়াছেন—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' এবং 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। ভারতের ধর্ম্মপ্রচারকগণ মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিতে প্রয়াসী—জগতে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাই তাঁহাদের সরলবাণী এই—"যিনি বীর তিনিই বসুন্ধরা ভোগ করিবেন—যিনি বলবান্ তিনিই প্রকৃত আত্মার উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনিই দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন—মুক্তিলাভ করিবেন।" শক্তির মাহাত্ম্য এরূপ

জোরের সহিত আর কোন দেশে প্রচারিত হইয়াছে কি? আর কোন সমাজ মোহান্ধ মানবকে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার প্রকৃতিগত কর্ত্তব্য এত স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছে কি? ভারতের গৃহস্থ, নানা কণ্ঠে, নানা ইতিহাসে যুগে যুগে তুমি এই বীরত্বের গাথাই শুনিয়া আসিয়াছ। 'নানা উপায়ে শক্তি অর্জ্জন কর,' তোমার মুনিঋষিগণের ইহাই এক মাত্র উপদেশ। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার তোমার জন্মজন্মান্তরের মূলমন্ত্র।

ভারতীয় গৃহস্থের ধর্ম্ম

আমরা বলিলাম—মানুষ স্বভাবতই বীর; এবং হিন্দুধর্ম্ম ভারতবাসীকে মহত্ত্ব, বীরত্ব ও দেবত্বের দিকে লইয়া যাইতে চাহে। আমাদের ঋষিগণের বাণী এই যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি সকল প্রকার মহত্ত্ব ও দেবত্বের আধার, তিনি তিন প্রকারে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। "ব্রহ্মত্বে সৃজ্যতে লোকান্ বিষ্ণুত্বে পালয়ত্যপি। রুদ্রত্বে সংহরত্যেব তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥" যিনি ঈশ্বর, যাঁহার শক্তি অসীম, তিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন ও রক্ষা করেন এবং রুদ্ররূপে সংহার ও বিনাশ করেন। ভাঙ্গা, রাখা ও গড়া—যাহা নাই তাহাকে গড়িয়া তোলা, যাহা আছে তাহাকে বজায় রাখা, অথবা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন আকার দেওয়া—এইগুলি মহাবীরের, জগদীশ্বরের কার্য্য। আমরা মানুষের মধ্যে এই ঐশ্বরিক শক্তি দেখিতে চাই। ভারতবাসী মানুষ কি না তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিব—ভারতবাসী নূতন কোন একটা জিনিষ খাড়া করিতে পারে কি না, ভারতবাসী নূতন নূতন কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারে কি না, ভারতবাসী নূতন নূতন বাসনারাশি সৃষ্টি করিতে পারে কি না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব—ভারতের নরনারী স্বকীয় যত্নে ও উৎসাহে কোন

প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে সুন্দররূপে চালাইতে পারে কি না, ভারতের নরনারী নিজ মাথা খাটাইয়া কোন সমাজতত্ত্ব, দর্শনবাদ বা কর্ম্মকেন্দ্রের পরিপুষ্টি বিধান করিতে পারে কি না, ভারতবাসী স্বধর্ম্ম ও স্ব-সমাজের উন্নতি ও বিস্তৃতিকল্পে সময় ও অর্থব্যয় করিতে উৎসাহী হয় কি না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব—ভারতবাসী পুরাতনগুলিকে প্রয়োজনমত বদলাইতে সাহসী হয় কি না, ভারতবাসী আবর্জ্জনারাশি দূর করিতে কৃতসংকল্প কি না, ভারতবাসী নিজহাতে গড়া জিনিষকেও যথাসময়ে ওলট পালট করিয়া দিতে প্রস্তুত ও অভ্যস্ত কি না।

যদি এইরূপ ভাঙ্গাগড়ার ক্ষমতা ভারতবাসীর না থাকে, তবে তাহা অর্জ্জন করাই ভারতীয় গৃহস্থের একমাত্র ধর্ম্ম। তাহার শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবাসী ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রকে ভাল করিয়া চাষ করিবে, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার সকল প্রদেশের চিন্তাস্রোতে ও কর্ম্মস্রোতে স্নান করিয়া যথোচিত স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিবে, মারাঠী হিন্দী বাঙ্গালা তামিল ভাষায় সুদক্ষ হইয়া ভারতের অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হইবে; ভারতবাসী সকল স্থানেই নিজ নিজ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন পাইতে অভ্যস্ত হইবে, ভারতের সর্ব্বত্র নিজ নিজ কর্ম্ম ও চিন্তার প্রভাব বিস্তৃত করিবে। ভারতের নদনদী, চন্দ্র-সূর্য্য, তরুলতা, আকর-সাগর, প্রান্তর-পর্ব্বত ভারতবর্ষকে নানা প্রাকৃতিক শক্তির অধীশ্বর করিয়াছে, ভারতবাসী সেইগুলিকে নিজ বিদ্যাবলে ও নিজ চরিত্রবলে আয়ত্ত করিবে, সেইগুলি হইতে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষকে ধনে ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাহসে উদ্যমে জগতের শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া তুলিবে। ভারতবাসীর যদি এই-আশা না থাকে তাহা হইলে তাহার

শিক্ষালাভের আর প্রয়োজন নাই। শিক্ষিত হইয়া তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পাইতেছে, বলিব। যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসী প্রকৃতির শক্তিগুলি লইয়া ছেলে-খেলা করিবে, সমাজের শক্তিগুলি লইয়া 'দাবাবড়ে'র চাল চালিবে, সর্ব্বত্র 'হাঁ'কে 'না' করিবে, 'না'কে 'হাঁ' করিবে।

চরিত্রবান্ ভারতবাসীর এই ভাঙ্গাগড়া ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকিবে না। ভারতবর্ষের বাহিরে একটা বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে। সেটাকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবাসীর চলিবার উপায় নাই। সুতরাং ভারতের শক্তিমান্ পুরুষগণকে সেই বিশাল জগতেও প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। যদি ভারতবাসী তাহার 'সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার'-শক্তি ভারতবর্ষের বাহিরেও প্রকটিত করিতে পারে, তাহা হইলেই বুঝিব, সে তাহার মুনি-ঋষি-নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলেই বুঝিব ভারতের গৃহস্থগণ স্বকীয় ধর্ম্ম পালন করিতেছে—তাহা হইলেই বিশ্বাস হইবে শিক্ষার দ্বারা ভারতে মানুষ তৈয়ারী হইতেছে। জগতের মধ্যে চিন্তার উৎস, কর্ম্মের কেন্দ্র, জীবনের আধার, মৌলিকতার প্রস্রবণ নানা স্থানে নানা ভাবে কাজ করিতেছে। জগতের শিল্পাগারগুলি, জগতের বিশ্ববিদ্যালয়- গুলি, জগতের মন্ত্রণা-সভাগুলি, জগতের ধর্ম্মমন্দিরগুলি, জগতের বিদ্বৎ-সমিতিগুলি, জগতের বিজ্ঞানশালাগুলি বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহকে নানা আকারে কেন্দ্রীকৃত ও পুঞ্জীভূতভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসী সেই সকল কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া প্রকৃত জীবনীশক্তির সম্মুখীন হইবে এবং তাহার সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া নিজ জীবনের স্বার্থসিদ্ধি করিবে, নিজের প্রয়োজন অনুসারে সেই কর্ম্মকেন্দ্র ও চিন্তার আধারগুলিকে ব্যবহার করিবে। সুস্থ ভারতবাসী তাহাদের চাপে অভিভূত হইয়া পড়িবে না, শক্তিমান্ ভারতবাসী তাহাদের আড়ম্বরে, বিশালতায় ও চাকচিক্যে হতপ্রভ ও নির্ব্বাক হইয়া যাইবে না,

শিক্ষিত ভারতবাসী স্থির ও গম্ভীরভাবে সেই সমুদয়ের সাহায্যে নিজ জীবনেরই চরমলক্ষ্য সাধন করিবে, স্বকীয় সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিবে, স্ব-সমাজের প্রভুত্ব বিস্তার করিবে, স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে, জগৎকে ভারতবর্ষের কর্ম্মভূমিতে পরিণত করিবে।

বিশ্বজগতের শক্তিপুঞ্জকে ভারতবাসীর খেলার সামগ্রীতে পরিণত করা, পৃথিবীর বাধাবিঘ্ন এবং সংসারের মায়া-মোহ-দুর্ব্বলতার সঙ্গে যুঝাযুঝি করা, প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সকল প্রকার শক্তি আহরণ করা, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচিত্র উপায়ে স্বকীয় সৃষ্টিস্থিতি সংহার-শক্তির পরিচয় দেওয়া, অসুবিধাগুলিকে চরিত্রবলে সুবিধায় রূপান্তরিত করা, বিশ্বশক্তিকে নানা কৌশলে ভারতমুখী করা ও ভারতসমাজের অনুকূল করা ইহাই বৈদিক যুগ হইতে রামকৃষ্ণের যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর একমাত্র ধর্ম্ম। ভারতের গৃহস্থ অন্য কোন কর্ত্তব্য জানে না, ইহাই তাহার স্বধর্ম্ম।

প্রাচ্যজগতের আট বৎসর

সাধারণ হিসাবে ১৯০১ সালে বিংশশতাব্দীর আরম্ভ, কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে ১৯০১ সালের কোন বিশেষত্ব নাই। মানবজাতি ১৯০৫ সালকেই তাহার নবযুগ—তাহার বিংশশতাব্দীর প্রথম বর্ষ মনে করিবে। দিন আসে দিন যায়, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, সবগুলিরই কি মূল্য থাকে? সবগুলিই কি আমরা মনে রাখি? যে দিন বা যে বৎসর কোন একটা বিশেষ ভাব-তরঙ্গ বা চিন্তাপ্রবাহ বা অন্য কোনরূপ প্রভাব লইয়া আমাদের সম্মুখীন হয়, সেই দিনই একটা দিনের মত দিন, সেই বৎসরই একটা স্মরণীয় বর্ষ। সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা দিন গণিয়া থাকি, যুগ মাপিয়া থাকি। ১৯০৫ সাল পৃথিবীর মধ্যে, সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে—এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায়—সকলের পক্ষেই এইরূপ একটা বর্ষ। এই বর্ষ যে সকল প্রবাহ ও প্রভাব লইয়া জন্মিয়াছে তাহা অনেক প্রকারেই ব্যাপক ও সুদূরবিস্তৃত। এই প্রবাহ ও প্রভাব সমগ্র মানবজাতির ভিতর একটা নূতন তত্ত্ব, নূতন সমস্যা, নূতন প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। সেই সকলের মীমাংসা করাই এবং তাহাদের চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াই বিংশশতাব্দীর কার্য্য হইবে।

১৯০৫ সালটাকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসর এবং একটা নবযুগের নববর্ষ বলিতেছি কেন? তাহার কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে যাহা ঘটিয়াছে, এই নবযুগে তাহা আর ঘটিবে না, তাহার ফলমাত্র দেখিতে পাইব। অথবা এই নবযুগে যাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহা

পূর্ব্বযুগে ঘটে নাই, পূর্ব্বযুগে তাহার কারণস্বরূপ উপাদানগুলি ছিল। মোটের উপর পূর্ব্ব যুগে এবং নবযুগে অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইব, তাহাতে এই দুই যুগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না—দুইএর মূল মন্ত্রে অনেক প্রভেদ। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, হাবভাব, আদর্শ, চিন্তা, সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি সকল বিষয়ে দুই যুগের মধ্যে অসংখ্য বৈষম্য থাকিবে—একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই দুই যুগের সন্ধিস্থল আমরা ১৯০৫ সালে ফেলিতেছি।

১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত যে ভাব-তরঙ্গ মানবজাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহার উৎপত্তি কোথায়? সেই যুগের লক্ষণগুলিই বা কি ছিল? আমরা বলিব—সেই প্রবাহের জন্ম ১৮০১ সালে নয়, ১৮১৫ সালে। অর্থাৎ ১৮১৫ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত এই ৯০ বৎসরই বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্ব যুগ, মানবেতিহাসের ঊনবিংশ শতাব্দী। যে দিন ওয়াটার্লুর সংগ্রামে নেপোলিয়ানের পরাজয়, যে দিন ভিয়ানা-নগরের কংগ্রেসে ইউরোপের মানচিত্রে নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় সীমার নির্দ্দেশ, সেই দিন প্রাচীনের অবসান, নবীনের অভ্যুদয়। পদার্থবিজ্ঞানের বিস্তৃতি, শিল্প-কারখানার আধিপত্যলাভ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিপ্লবসাধন, কর্ম্মজগতে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসন, ইংলণ্ডের বিশ্ব-সাম্রাজ্য, ভারতবাসীর অধানতা এই সকলের উদ্বোধন করিয়া ১৮১৫ সাল মানবজগতে দেখা দিল। তাহার পর নব নব চিন্তার আবির্ভাব, বিপ্লববাদ ও সাম্যবাদের প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মে নাস্তিকতা, পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, সাহিত্যে ভাবুকতা, জার্ম্মান্ ও আমেরিকান্ দর্শনবাদে বেদান্তের ক্ষীণ-আলোকবিস্তার, শিল্পজগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জার্ম্মান্-সাম্রাজ্য-গঠন, ফরাসী-বিপ্লব, ইতালীর স্বাধীনতা, তুরস্কের ওষ্ঠাগতপ্রাণতা, রুশিয়ার বিস্তার, আমেরিকার গৃহবিবাদান্তে বিশ্ববিজয়লিপ্সা, নবাভ্যুদয়প্রাপ্ত জাতিপুঞ্জের

বাণিজ্য-ও-সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতা, সকল জাতিরই প্রাচ্য জগতে ভোগ-স্বত্বাধিকারের প্রবল প্রয়াস, এসিয়ায় ও আফ্রিকায় বৃহত্তর জার্ম্মাণি, বৃহত্তর ইতালী, বৃহত্তর আমেরিকা ও বৃহত্তর রুশিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্যম—এই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা পাশ্চাত্য জগতের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে।

এই সময়টা প্রাচ্য জগতের পক্ষে—সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে—পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ। ১৮১৫ সালে যেদিন ইউরোপে ইংলণ্ডের আধিপত্য ঘোষিত হইল, তাহারই কিছুকাল মধ্যে ভারতখণ্ডে মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইল এবং ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক হইল। এইরূপে ইংরাজ-জাতির বিশ্বসাম্রাজ্য গঠিত হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করিল। ১৮১৫ সালের ঘটনা এসিয়া ও ইউরোপের সুদৃঢ় মিলনব্যাপারের প্রথম ঘটনা। প্রাচ্য জগতে ও পাশ্চাত্য জগতে ভাববিনিময়, কর্ম্মবিনিময় ও আদর্শবিনিময় এই দিন হইতে নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। এইজন্য ১৮১৫ সাল প্রাচ্য জগতের পক্ষে—বিশেষতঃ ভারতবাসীর পক্ষে—এক নবযুগের নূতন বর্ষ। এই নবযুগে নব নব ভাবের উন্মেষণ, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মিলন, বিশেষরূপে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব-প্রতিষ্ঠা, চীনে জাপানে, ভারতে ও পারস্যে পরানুকরণ, পরানুবাদ ও পরকীয় আদর্শে অত্যধিক আস্থা-স্থাপন, সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষা, পাশ্চাত্য-পূজা, এক কথায় বিদেশীয় আদর্শে জীবন-গঠন, প্রাচ্যের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের অহঙ্কার, ইউরোপের দাম্ভিকতা, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-শক্তি, ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তি প্রাচ্যজগতের সর্ব্বত্র বীরদর্পে প্রকটিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যের হস্তে প্রাচ্যের জীবন-সংশয় উপস্থিত হইল—তাহার প্রতাপে মানবজাতির কোন অংশ জগতে

টিকিতে পারিবে কি না—এই সন্দেহ প্রাচ্যের সর্ব্বত্র মানুষকে অভিভূত করিয়া রাখিল। মোটের উপর এই উনবিংশ শতাব্দীকে—১৮১৫ সাল-প্রসূত যুগধর্ম্মের কালকে—ইউরোপীয় প্রভাবের যুগ, জগতের পাশ্চাত্য কাল, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়ের সময় বলিলে ইহার যথাযথ বর্ণনা করা হয়।

প্রাচ্যকে গ্রাস করিবার জন্য, প্রাচীন জগতের আদর্শ, সভ্যতা, শিল্প ও সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য, পুরাতনের প্রভাব অভিভূত করিবার জন্য ১৮১৫ সাল ইউরোপের হস্তে দিগ্বিজয়ের পতাকা দান করিল। ইউরোপীয় মানব 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিয়া মত্ত ঐরাবতের ন্যায় জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইল; কিন্তু ১৮১৫ সালই মানবজাতির একমাত্র বর্ষ নয়, উনবিংশ শতাব্দীই তাহার সভ্যতা-প্রবাহের একমাত্র যুগ নয়। আবহমান কাল হইতে, যুগযুগান্ত হইতে, কত শতাব্দী আসিয়াছে, কত শতাব্দী গিয়াছে, কত যুগ আসিবে, কত যুগ যাইবে, তাহার সংখ্যা ত কেহ করে নাই—তাহার প্রভাব ত কেহ গণে নাই। ১৮১৫ সালের মানব এরূপ দূরদৃষ্টি লইয়া ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাই সে ১৯০৫ সালে এক অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, স্বপ্নাতীত চিন্তার বহির্ভূত ঘটনায় থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই ঘটনা হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী ও মানবজাতির সর্ব্বপুরাতন সন্তান এসিয়াবাসীর জাগরণ, প্রাচ্যজগতের জীবন-স্পন্দন।

প্রাচ্যের এই জীবন-স্পন্দন দেখা দিল ক্ষুদ্র জাপানের সামরিক শক্তির বিকাশে। তাহার পর হইতে প্রাচীনের বিজয়-ঘোষণা, প্রাচ্য আদর্শের মহিমা-কীর্ত্তন, হিন্দুজগতে, মুসলমানজগতে ও বৌদ্ধজগতে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম, স্বায়ত্তপ্রয়াস, পাশ্চাত্যমোহ-নিবারণ, পাশ্চাত্য প্রভাবের গতিরোধ, স্বকীয় আদর্শের বিকাশ-চেষ্টা, পাশ্চাত্যজগতে প্রাচ্যভাবের

সমাদর-বর্দ্ধন, বিশ্বের চিন্তারাজ্যে এসিয়াবাসীর বিজয়-লাভেচ্ছা, ভাবজগতে ভারতের সাম্রাজ্য-বিস্তার—এই সকল লক্ষণ জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রাচ্যের সর্ব্বত্র মানবজীবনকে অনুশাসিত করিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ এখন প্রাচ্যকে বুঝিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতেছে। রাষ্ট্রীয় আলোচনায় প্রাচ্য-জাতির অধিকার লাভ, জাপানকে একটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তিরূপে ইউরোপীয় মন্ত্রণা-সভায় আসনপ্রদান, চীনের প্রতি লোলুপদৃষ্টির কথঞ্চিৎ সঙ্কুচন, মুসলমান-জাতির আকাঙ্ক্ষায় সম্মানপ্রদর্শন, ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও দর্শনে অনুরাগ—ইত্যাদি নানা ভাবে প্রাচ্য আদর্শ, প্রাচ্য প্রভাব, প্রাচ্য চিন্তা, প্রাচ্য প্রবাহ ইউরোপীয় মানবের উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সময়ের ফেরফারে ইউরোপ আজ এসিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত—এসিয়ার প্রভাবে কথঞ্চিৎ অভিভূত। ইউরোপ এসিয়াকে আর কেবলমাত্র ভোগ্য বস্তু মনে করিতে পারিবে না, ইউরোপকে এসিয়ার সমকক্ষ হইয়া চলিতে হইবে; এসিয়া এসিয়ার নিজস্ব রক্ষা করিবে, প্রয়োজন হইলে ইউরোপকে উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিবে। ইহাই ১৯০৫ সালের বাণী।

এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই আমরা এক সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম—"আমরা আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিক বা আবিষ্কারক বা চিন্তাবীরমাত্ররূপে দেখি না। আমরা তাঁহাকে হিন্দুর মূলমন্ত্রগুলির প্রচারকস্বরূপ মনে করি। তিনি ভারতের মর্ম্মকথা আধুনিক জগৎকে শুনাইয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার চরম উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাণী—হিন্দুর হিন্দুত্ব—তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া বিংশ-শতাব্দীর নরসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশসমূহ এই

উপায়ে ভারতের বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা আলোকিত হইল। বৈজ্ঞানিক সংসার এই উপায়ে হিন্দুর ভাবে প্রভাবান্বিত হইল। এই উপায়ে হিন্দুর জাতীয় বিজ্ঞান বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।"

জগতে প্রাচ্য ভাবের বিকীরণ অতি সহজে সাধিত হইবে না। গত আট বৎসরে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির সম্মুখে প্রধানতঃ তিনটি সমস্যা উপস্থিত। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় কার্য্য হইবে ইহাদের মীমাংসা। সেই মীমাংসা হইয়া গেলে এই যুগের তৃতীয় কার্য্যাবলীর সূত্রপাত হইবে।

প্রথমতঃ প্যানামাখাল-কর্ত্তনে পৃথিবীর ব্যবসায় ও রাষ্ট্রীয় শক্তির ভারকেন্দ্র আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে। তাহার ফলাফল এখন কিছুই ইয়ত্তা করা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, চীনের ভবিষ্যৎ। মুসলমান-জগৎ আবার কিছু কালের জন্য হ য ব র ল হইয়া থাকিল। সম্প্রতি সমগ্র ইউরোপ এবং এমন কি জাপানও চীনের ব্যাপার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, চীনের প্রজাতন্ত্র-শাসন টিকিয়া গেলে পৃথিবীতে এক যুগান্তর সৃষ্ট হইবে। পরন্তু চীনের অন্তর্বিদ্রোহ প্রজ্জলিত হইলে সমগ্র মানবসমাজ এই অগ্নিময় পাকের মধ্যে গিয়া পড়িবে।

তৃতীয়তঃ, ইউরোপের গৃহ-বিবাদ ও সামাজিক অশান্তি। পাশ্চাত্য-জগতে ধর্ম্মের কোন প্রভাব নাই, সমগ্র খৃষ্টান সমাজে ঐক্য নাই। তাহা বেশ প্রমাণিত হইয়াছে। অধিকন্তু এসিয়া ও আফ্রিকায় বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার লইয়া পরস্পর কামড়াকামড়ি বাড়িয়াই চলিয়াছে।

তাহার উপর প্রত্যেক দেশেই অর্থ-বৈষম্যে সমাজ জর্জ্জরিত—যে অর্থের প্রভাবে ইউরোপের দিগ্বিজয়, সেই অর্থই তাহার সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার আভ্যন্তরীণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া সুকঠিন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ

জগতে প্রাচ্যভাব-বিস্তারের জন্য বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব। এই প্রাচ্য প্রভাবের যুগ তাহার আট বৎসর সম্পূর্ণ করিল। এই আট বৎসরে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির, নবাভ্যুদয়ের এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়াই ভারতে প্রাচ্য জগতের নবীন বাণী প্রচারিত হইতেছে। একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, যে বৎসরকে আমরা সমগ্র মানবজাতির নূতন শতাব্দীর প্রথম বৎসর এবং প্রাচ্য জগতের নবযুগের নববর্ষ ধরিয়াছি, সেই বৎসরই ভারতেও নবযুগের নূতন মন্ত্র, স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দিয়াছে। এই স্বদেশী আন্দোলন যে প্রবাহ লইয়া দেখা দিয়াছে তাহার এক স্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আমরা সম্প্রতি দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করিতেছি। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে 'স্বদেশী'র জন্ম, ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালী জাতির আটবৎসর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। আমরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

স্বদেশী আন্দোলন যে মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছে, তাহার সুফলগুলি আমরা লাভ করিয়াছি। এই আন্দোলনের ফলে সমগ্র সমাজের উপর দিয়া একবার নবজীবনের ধারা বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে সকল ক্ষেত্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে সার প্রদত্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ অঙ্কুরের জন্য বীজ উপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলন যতদিক হইতে যে আদর্শে উপস্থিত হইয়াছিল, ৪।৫ বৎসরের ভিতরই তাহার চরম সীমা দেখিতে পাইয়াছিলাম। ১৯১০।১১ সাল হইতেই আমরা তাহার ক্ষীণতা অনুভব করিতেছিলাম। প্রথম অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে, অথচ দ্বিতীয়

অধ্যায়ের আরম্ভ হয় নাই—গত ২।৩ বৎসর আমাদের এইরূপ সন্ধিস্থলে কাটিয়া গেল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধানতঃ চারি স্তম্ভ—(১) বঙ্গবিভাগের প্রতিরোধ, (২) স্বায়ত্ত-শাসন, (৩) স্বদেশীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের 'সংরক্ষণ', (৪) জাতীয় শিক্ষা। বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভাষাভাষিগণকে লইয়া একটা নূতন বঙ্গপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত করিবার একটি প্রধান লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ, স্বায়ত্তশাসন লইয়া সমগ্র ভারতবাসী এবং বাঙ্গালীরা অতি চড়া সুরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—সে সুর টিকিল না। তবে স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ এখন কেবল বঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাবিভাগ বল, আইন-বিভাগ বল, ব্যবস্থাপক-সভা বল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বল, সর্ব্বত্রই ভারতবাসী এখন অধিকতর অধিকারের দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় কাজকর্ম্মে ভারতবাসী মন্ত্রী, সচিব, রাজকর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পরিচালক ইত্যাদি নিয়োগের জন্য আজকাল ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার সবিশেষ বিকাশ স্বদেশী আন্দোলনেই সাধিত হইয়াছে।

অল্পদিনের ভিতরই আন্দোলন বন্ধ হইল বটে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গবিভাগসম্পর্কে বাঙ্গালী জাতির বিজয়লাভে ভারতের সর্ব্বত্র এই আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়াছে। কোন তথাকথিত আন্দোলনকারী বা দু'দশজন স্বদেশী বক্তা বা পাণ্ডার মধ্যে ইহা আর গণ্ডীবদ্ধ নয়—ইহা এখন দেশের জলবায়ুর সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু দেশবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা মাত্রেই আবদ্ধ না থাকিয়া স্বায়ত্তকর্ম্মের নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন।

তারপর কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এদিকেও যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ, কষ্ট-স্বীকার, গোলমাল, হুজুগ হইয়াছে। কলকারখানা-প্রতিষ্ঠা, বক্তৃতা, প্রচারকার্য্য, বিদেশ-গমন, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি কতদিকে কত কার্য্য হইল। তাহার অনেকগুলিরই সুফল ও স্থায়িত্ব হয় নাই। কিন্তু যখন হইতে কেবলমাত্র উচ্ছ্বাস-প্রসূত কর্ম্মরাশির ব্যর্থতা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিলাম, তখন হইতেই 'স্বদেশী'র নাম-মাত্রে আনন্দ প্রকাশ বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তান্বিত হইলাম। বিফলতায় অভিজ্ঞতা লাভ হইল, চোখ ফুটিতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থা আমাদের গত ২।৩ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্য স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ চলিয়া গিয়াছে—আমরা বলিতে বাধ্য। এখন স্বদেশীর জন্মোৎসব ৭ই আগষ্ট হয় না। 'স্বদেশী মেলা' যে কোন তিথিতেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সেই দিন-ক্ষণের প্রতি মমতা কমিয়া আসিয়াছে। এখন আমরা 'স্বদেশী' আন্দোলনে পাণ্ডাগিরি না করিয়াও স্বদেশী। দেশীয় শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এখন আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল।

স্বদেশী আন্দোলনের চতুর্থ স্তম্ভ—জাতীয় শিক্ষা। মাতৃভাষায় সকল শিক্ষা, অল্প বয়স হইতে শিল্পশিক্ষা, স্বদেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার পরিচালনা, শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্বার্থত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ ইত্যাদি আদর্শ লইয়া সমগ্র বঙ্গে এবং মহারাষ্ট্রে ও আন্ধ্রদেশে একটা প্রচেষ্টা হইয়াছিল। তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় প্রয়াস। কিন্তু যে উচ্চ সুরে এই স্বায়ত্ত-শিক্ষার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইল, তাহা দেশের জনসাধারণ হজম করিতে পারিল না। শেষ দুই এক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল—জাতীয়শিক্ষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত তাঁহার দান তুলিয়া লইলেন, এবং সেদিন জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের

সভাপতি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষও পুরাপুরি স্বায়ত্ত-শিক্ষালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্যত্র অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি জাতীয় শিক্ষার আদর্শ দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? তাহা নহে, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা ভারতবাসীর চিন্তায় আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। শিল্পশিক্ষার আয়োজনের জন্য সকলেই ব্যস্ত। বিজ্ঞান শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিবার ইচ্ছা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই পোষণ করিতেছেন। হিন্দুসাহিত্য-প্রচার এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির উদ্ধার-সাধন সমগ্র সমাজেই এখন আদৃত।

কেবল জাতীয় শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যেই নহে, এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া রাজপুরুষ ও জনসাধারণ নানা স্থানে নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন। তাহার উপর, বিদ্যালয়ের পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন, নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় এবং স্বায়ত্ত-কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বর্জ্জনব্যাপারে ও মহারাষ্ট্রের ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপকগণের স্বাধীনতানাশমূলক সরকারী আদেশের তীব্র প্রতিবাদে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, পঞ্চনদের গুরুকুল, হিন্দুস্থানের প্রেম-মহাবিদ্যালয়, অন্ধ্রপ্রদেশের কলাশালা প্রভৃতি খাঁটি স্বায়ত্ত- প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং বোলপুর, পুণা, বরিশাল, দৌলতপুর, পাচাপ্পা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ স্বাধীন শিক্ষালয়গুলির প্রতি সকলের সস্নেহ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, স্বায়ত্তশাসন ও শিল্পের ন্যায় শিক্ষাব্যাপারেও লোকেরা অত্যুচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কিছু নরম সুরে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেদিন হইতে চড়া সুরের

পরিবর্ত্তে সমগ্র সমাজ একটু নরম ভাবে অগ্রসর হইল, যেদিন হইতে ৭ই আগষ্ট, ১৬ই অক্টোবর, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদির মায়া কিছু কিছু কাটিল, সেইদিন হইতে স্বদেশীর প্রথম যুগ শেষ হইল, এবং দ্বিতীয় যুগের জন্য পথ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সন্ধিসময়ে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রবল ধারা দুইটি কথঞ্চিৎ পুরাতন আন্দোলনের সবিশেষ পুষ্টিতে নিয়োজিত হইল—(১) ধর্ম্ম-ও-সমাজ-সেবার আন্দোলন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ১৯১০-১১ সাল হইতেই অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগের অবসানকালে ইহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠালাভ। বঙ্গে ত্যাগধর্ম্ম জাতীয়-শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকল্পেই সবিশেষ আত্ম-প্রকাশ করে। ধনবানগণের অর্থ-দান এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিদ্যাদানের জন্য জীবনোৎসর্গ দ্বারা জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন বাঙ্গালার জেলায় জেলায় প্রসার লাভ করে। এই বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক, ছাত্র ও শিক্ষকগণের নেতৃত্বে দেশময় সেবাধর্ম্মের কর্ম্ম আরব্ধ হয়। অর্দ্ধোদয়-যোগে এবং স্বদেশী আন্দোলনের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও এই সেবা-পরোপকার-ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন চারি পাঁচ বৎসরের কর্ম্মাভ্যাসে বঙ্গসমাজে স্বার্থত্যাগ, পরোপকার ও কষ্টস্বীকারের প্রবৃত্তি সুবিস্তৃত ও সুগভীর হইল, তখন বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতি বাঙ্গালীর বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। গত দুই তিন বৎসরের ভিতর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

(২) সাহিত্যের আন্দোলন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবেই ইহাদের কার্য্যের প্রকৃত বিকাশ ও বিস্তার সাধিত হইয়াছে। স্বদেশীর প্রভাবে বাঙ্গালায় একটা স্বাধীন চিন্তা আসিয়াছে, এবং দেশের অতীত

ও বর্ত্তমান ভাল করিয়া বুঝিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। অধিকন্তু জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ শিক্ষাব্যাপারে মাতৃভাষাকে প্রথম স্থান এবং ইংরাজী ভাষাকে দ্বিতীয় আসন প্রদান করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নানা কারণে সাহিত্য-সংসারে বহু সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-পরিপোষকের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলতঃ এখন বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্রাট্, ধুরন্ধর বা মহারথী পদবাচ্য এক হিসাবে কেহই নাই—আর এক হিসাবে অনেকেই আছেন। বঙ্গসাহিত্য এখন বঙ্গীয় জনসাধারণের সম্পদ, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব ও গতিনির্দ্ধারক।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ চলিয়া গিয়াছে—সেই যুগের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা এখন আর আমাদিগকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। সেই যুগের প্রভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র যতখানি গঠিত হইবার হইয়াছে। এখন আমরা নূতন প্রভাবের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমাদের বিশ্বাস—দামোদরের বন্যা হইতে আমাদের দ্বিতীয় যুগ পরিষ্কাররূপে আরম্ভ হইল। এই বন্যাই আমাদের সন্ধিকালের শেষ ঘটনা। সমগ্র জাতির ভিতর একটা বিশেষ সাড়া দিবার জন্যই রুদ্রদেবের এই তাণ্ডব।

এই আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ১৯০৫ হইতে ১৯১০ এই পাঁচ বৎসর 'স্বদেশী'র প্রথম যুগ। যে সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে সেই সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। প্রধানতঃ সেই সকলের সাহায্যেই লোকের স্বদেশী প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইত। ইহাদের সঙ্গে সকলের একটা মায়ার বন্ধনও ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ১৯১১ হইতে ১৯১৩ এই আড়াইবৎসর কাল দ্বিতীয়যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধি-সময়। এই সময়ের মধ্যে প্রথমযুগের অনুষ্ঠান-

প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু শিথিল ও ক্ষীণ হইল। স্থানে স্থানে বিফলতা দেখা দিল। এই শিথিলতা, ক্ষীণতা ও বিফলতায় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশব্যাপী সংশয় উপস্থিত হইল—লোকের হৃদয়ে নৈরাশ্য আসিল। নৈরাশ্য আসিল বটে, কিন্তু একেবারে অবসন্ন করিল না। নূতন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকেই অগ্রসর হইলেন, অনেক নূতন লোক কর্ম্মে নামিলেন। চড়া সুর পরিত্যাগ করিয়া, যাহা টিকিবে, যাহা ভবিষ্যতে জনসাধারণ সহজে বুঝিতে ও ধরিতে পারিবে, সেই দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। লোকের চিত্ত সংযত হইতে লাগিল, নিজ নিজ চরিত্র-বিশ্লেষণ, দোষ-নিবারণ, সার্থকতার উপায়-উদ্ভাবন ইত্যাদি শক্তি সমাজে কাজ করিতে লাগিল। প্রথম যুগের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের গণ্ডীর মধ্যেই আর 'স্বদেশী', 'স্বায়ত্তশাসন', 'জাতীয় শিক্ষা' বেশী আবদ্ধ থাকিল না। সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ছাপাইয়া উঠিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রসার, সেবাধর্ম্মের প্রচার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠা, দিল্লীতে রাজধানী-প্রবর্ত্তন, বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি কতিপয় নূতন শক্তি আসিয়া সমাজে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত করিল। তাহারই শেষ নিদর্শন দামোদর-বন্যায় বঙ্গবাসীর কার্য্যতৎপরতা। এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের নব নব কার্য্য দেখিতে পাইব।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙ্গসাহিত্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি, বঙ্গভাষাভাষীর ঐক্যবিধান, তারকনাথ-রাসবিহারীর দান এবং দামোদরের বন্যা, এই কয়েকটি নূতন ঘটনা গত দুই তিন বৎসরের বিশেষ লক্ষণ। এই সকল কার্য্যফলে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহার লক্ষণগুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

(১) বাঙ্গালীর সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিভাগ উন্নতি লাভ করিবে। প্রথম আট বৎসরে বাঙ্গালায় ইতিহাস-চর্চ্চার ভিত্তি গভীর ও বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গে ঐতিহাসিক-সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা যুগপৎ জাগরিত হইয়াছে। এজন্য বঙ্গে ইতিহাস-চর্চ্চা বলবতী। কিন্তু জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবসা-শিল্প-কৃষি-বিজ্ঞানাদির প্রভাব কম, এজন্য বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য এখনও অল্প। যাহা হউক, সাময়িক লক্ষণগুলি দেখিয়া আশা হইতেছে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, আকর-তত্ত্ব, রসায়ন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ঔষধপ্রস্তুতকরণ, ইত্যাদি পদার্থবিজ্ঞানের নানাবিভাগ এখন হইতে বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যে মর্য্যাদা লাভ করিবে। বাঙ্গালী লেখক ও পণ্ডিতগণ পদার্থ-জগতের বিজ্ঞানাবলী লইয়া অনুসন্ধান, গবেষণা, অনুবাদ, আবিষ্কার, প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি-প্রণয়ন, সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

উচ্চ অঙ্গের দর্শন-সাহিত্যেও আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে বটে—কিন্তু তাহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার আশা নাই। জীবনের গতি-নির্দ্ধারণ এবং কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিবার জন্যই দর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর

লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য নূতনভাবে বুঝাইবার সময় শীঘ্র আর আসিবে না। কেবল বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতেরই চরম আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে—সকলেই শেষ-লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে রামমোহন-প্রবর্ত্তিত চিন্তাপদ্ধতিদ্বারা সকল প্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, বেদান্ত ও পদার্থবিদ্যার সমন্বয়-সাধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তি বা শেষ অধ্যায় বা চরম synthesis হইয়াছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত বিংশশতাব্দীর যুগধর্ম্মে।

এই কর্ত্তব্যপ্রদর্শক synthesisএর বা সমন্বয়-সাধনের, অর্থাৎ এই বিংশশতাব্দীর মানবোপযোগী গীতাধর্ম্মের মূলমন্ত্র তিনটি—প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য অবলম্বন এবং কামকাঞ্চনকীর্ত্তি বর্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জীবনে পরোপকার ও মানবসেবার কর্ম্মযোগ, তৃতীয়তঃ সংসারে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে এই বৈরাগ্য ও কর্ম্মযোগের যথোচিত প্রবর্ত্তন। এই যুগধর্ম্মের কর্ম্ম যতদিন না পরিসমাপ্ত হয়, ততদিন আর নূতন কোন দর্শনবাদ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক যাহা কিছু নূতন মৌলিকতত্ত্ব স্বাধীনভাবে প্রচারিত হইবে তাহাও নূতন প্রণালীতে সেই চিন্তাস্রোতকেই পুষ্ট করিবে। সকলই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনবাদেরই কুক্ষিগত হইয়া যাইবে এবং নানাদিক হইতে তাহাকে বিশদ ও স্পষ্টীকৃত করিবে। এই তত্ত্বের প্রচার, প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও উপলব্ধিই আগামী বঙ্গীয় জীবনের একমাত্র কার্য্য থাকিবে। সুতরাং দর্শন-সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয় বাঙ্গালায় শীঘ্র হইবে না—জীবন-গঠনোপযোগী নূতন কোন তত্ত্বের উদ্ভব এখন অসম্ভব।

তবে কতকগুলি পারিভাষিক দর্শনসাহিত্য, কলেজ-পাঠ্য দর্শন-গ্রন্থ,

নীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদির অনুবাদ বা সঙ্কলন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকেই এখন কিছুকাল বাঙ্গালী চিন্তাবীরগণের দৃষ্টি থাকিবে।

(২) এই বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যপুষ্টির কারণ ও উপাদানগুলির সবিশেষ প্রাধান্য নবযুগের দ্বিতীয় লক্ষণ হইবে। অর্থাৎ শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার, কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ ও স্বাধীন অন্নের উপায়-উদ্ভাবন বঙ্গীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে। বাঙ্গালার মধ্যবিত্তশ্রেণী—তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ—দারিদ্র্যের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে। কিন্তু যৌথকারবার, সমবেত-ব্যবসায় ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপারে লোকে ঝুঁকিবে না। ব্যক্তিগত ব্যবসায়েরই আদর হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ওকালতি, কেরাণীগিরি, মাষ্টারীগিরির প্রতি যথেষ্ট উদাসীন হইতে থাকিবে। কুলীমজুরের সঙ্গে মিশিতে বেশী অপমান বোধ করিবে না। চাষ-আবাদে, সূত্রধর-কর্ম্মকারের কার্য্যে, কুটিরশিল্পে, ছোটখাট কারখানায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাগিয়া যাইবে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে স্বাধীন অন্নের প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়াছে, স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায়ও অল্পাধিক মাত্রায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু দেশের বেশী লোক ঐ সকল উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে অগ্রসর বা সমর্থ হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে, নৈতিক-চরিত্র-হীনতায়, আলস্য-ও বিলাসপ্রবণতায়, এবং সাধুতার অভাবে পূর্ব্ব যুগে নানা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় যুগে দেখিতে পাইব—বাঙ্গালী সমাজের বহু শিক্ষিত পরিবার স্বাধীন অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে ব্যবসায় বা শিল্পের পরিচালক করা হইবে না। অসাধু ব্যক্তিগণকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে। মোটের উপরে ব্যবসায়-জগতে প্রকৃত দায়িত্ব-বোধ জন্মিবে।

(৩) এই দ্বিতীয় যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ হইবে—অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠা-লাভ। প্রকৃত প্রস্তাবে মান-সম্ভ্রম, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, শিক্ষালাভ ইত্যাদির মাপকাঠিই বদলাইয়া যাইবে। প্রথম যুগে আমরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর, ইংরাজীশিক্ষিত সমাজের কার্য্য-ফলই বিশেষরূপ ভোগ করিয়াছি। পোষাকী দেশ-সেবার পরিবর্ত্তে শিক্ষিত লোকেরা 'দেশের মাটি'কে চিনিতে ও ভালবাসিতে শিখিয়াছে। ইহাই প্রথম যুগের প্রধান সুফল। ধনী সম্প্রদায় এবং অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী অনেক সময়ে পথপ্রদর্শক হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রধানতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সহায়ক মাত্র এবং সহযোগীরূপেই কর্ম্ম করিয়াছেন। প্রথম যুগকে আমরা "মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগ" বলিতে পারি। আগামী দ্বিতীয় যুগকে আমরা "জনসাধারণের যুগ" নামে অভিহিত করিব।

জনসাধারণের চরিত্রবত্তা, তথাকথিত 'অশিক্ষিত' লোকের স্বার্থত্যাগ এবং উদারতা, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যথার্থ নেতৃত্বগ্রহণের ক্ষমতা ইতিমধ্যে সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দারিদ্র্যবশতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীও ইতি-মধ্যেই অশিক্ষিত সমাজের নিম্নে পড়িয়াছে এবং তাহার সঙ্গে মিশিতে বাধ্য হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার কোন জেলায় এখন তথা-কথিত দুই চারিজন উকীল-নায়কের দিন নাই। বঙ্গসমাজে কলিকাতার ধুরন্ধর-গণের একাধিপত্য অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের বাণী অগ্রাহ্য করিয়া কাহারও চলিবার উপায় নাই। জেলার প্রধান সহরগুলিও পল্লীগ্রামকে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে না। বাঙ্গালীর চিন্তা ও কর্ম্ম জাতি-নির্বিশেষে, শিক্ষানির্ব্বিশেষে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য উপায়ে সমাজের উচ্চ, নিম্ন, ধনী-নির্ধন সকল স্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার ফলে বিজ্ঞানে, সাহিত্যক্ষেত্রে, সমাজ-সেবায়, শিক্ষার আন্দোলনে নানা ধুরন্ধর,

নানা কর্ম্মবীর, নানা চিন্তাবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশের প্রকৃত "লোকসংখ্যা" সত্য সত্যই বাড়িয়াছে? দশ বিশ পঞ্চাশ জনের অভাবে বা চরিত্রহীনতায় বা অহঙ্কারে মতিভ্রংশে সমাজের উন্নতি কিছুমাত্র রুদ্ধ হইবে না। বিরাট জাতীয় আবর্ত্তের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্ম্ম কোথায় লুকাইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। "ব্যক্তি" অপেক্ষা জাতি যে কত বড়, তাহা আমাদের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইবে। কোন তথাকথিত বিজ্ঞান-বীর, সাহিত্য-রথী, শিক্ষাপ্রচারক বা জননায়কের ক্ষমতা ও বিচারশক্তি তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া জনসাধারণের মহতী শক্তি বীর পরাক্রমের সহিত দেশে আধিপত্য লাভ করিতে থাকিবে। তাঁতী জোলা কামার স্বর্ণকার মাঁঝি দর্জ্জী ইত্যাদি ব্যবসায়ী সমাজ এবং মাতাপিতার অকৃতী সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেল-হওয়া ছাত্র, ইত্যাদি তথাকথিত অনুন্নত লোকের আদর্শে উচ্চশ্রেণী, সভ্যসমাজ এবং 'ভাল ছেলেরা' অনেক বিষয়ে জীবন গঠন করিতে শিখিবে। কেতাবী শিক্ষা ও "ডিগ্রি" অপেক্ষা চরিত্রবত্তা, কর্ম্মতৎপরতা ও স্বাধীনচিন্তাই সবিশেষ আদৃত হইবে। তাহার ফলে সমগ্র সমাজকে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে দেখা হইবে—তাহাতে অর্থে ও বিদ্যায় হীন ব্যক্তিও সামাজিক সম্মানে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে।

(৪) বাঙ্গালী সমাজের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রান্ত জমাট বাঁধিবে। নানা উপায়ে নানা দুর্বুদ্ধির বশবর্ত্তিতায়, নানা স্বার্থের প্ররোচনায় বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্র সমানভাবে চিন্তা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে পায় নাই। সমাজদেহের তাপমান-যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব তাপের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান নহে। আগামী যুগে এই সমতার পরিচয় পাইব। অধিকন্তু হিন্দুকে মুসলমান ভাল করিয়া বুঝিবে। বাঙ্গালীর হৃদয় না বুঝিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসিগণ তাহাকে অযথা নিন্দা

করিয়া থাকে। কিন্তু আগামী যুগে মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ, দ্রাবিড় সকলেই বুঝিবে যে বাঙ্গালীর চিন্তায় প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাদেশিকতাও সঙ্কীর্ণতা নাই। বাঙ্গালীও ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা বুঝিবার জন্য সমধিক যত্ন করিবে।

বাঙ্গালার জলপ্লাবনে আমরা উপরি-উক্ত শেষ লক্ষণ দুইটির সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। জনসাধারণের শক্তি এবং জাতীয় ঐক্য ইহাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এই সেবাকার্য্যে কোন তথাকথিত সেবা-সমিতি বা শিক্ষা-পরিষৎ বা মিশন বা নামজাদা ও ধনবান জননায়কগণের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া দেশের জনসাধারণ তাহার গণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজই মহত্তর, কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মকেন্দ্র বা সাহায্যসমিতি অপেক্ষা দেশের জনগণই অধিক প্রতাপশালী। দেশের মাটির পরেই সকলকে মাথা ঠেকাইতে হইবে—এই শিক্ষা প্রদান করিয়া দামোদরের বন্যা আমাদিগকে আশান্বিত হৃদয়ে দ্বিতীয় যুগের কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে।

"আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী।"

আর ঐ দেখ

"গৌরবময় পুণ্য দৃশ্য
উচ্ছ্বাস ভরে স্তব্ধ বিশ্ব।"

সুতরাং "ভরা বিশ্বাসে শক্তি-শিখা
ধরায় লুটাও স্বশরীর।"

বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য

অল্পদিনের ভিতর আমাদের সাময়িক সাহিত্যে একটা নূতন প্রাণ আসিয়াছে। কতকগুলি নূতন মাসিকের উৎপত্তিই ইহার একমাত্র লক্ষণ নয়। সাহিত্য-জগতের স্থরই উন্নত হইয়াছে—বেশ বুঝিতে পারা যায়। সাহিত্য-সেবিগণের আলোচ্য বিষয়গুলিও আজকাল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ধন-বিজ্ঞান ও সমাজ-তত্ত্ব এই দুইটা ঘরে আমাদের যথেষ্ট শূন্যতা ছিল। গত দুই এক বৎসরের মধ্যে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা সুলক্ষণ।

একটা ক্ষণিক উন্মাদনা ও প্রতিযোগিতার ভাব মাসিক সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা ইতিমধ্যেই সুফল ফলিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনর্থক অর্থব্যয় কত হইতেছে বিচক্ষণ সম্পাদকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। অর্থের আড়ম্বর ব্যতীত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অন্য কোন অভিব্যক্তি আছে কি না সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ বিচার করিবেন। সাহিত্যসাধনা স্বদেশসেবারই এক অঙ্গ—ইহা বুঝিলে কোন্ দিকে কি প্রণালীতে কিরূপ আকারে প্রতিযোগিতার আবশ্যক সকলেই অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

আমাদের পাঠকগণকে সাময়িকসাহিত্যপাঠ সম্বন্ধে একটা অনুরোধ করিতেছি। কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালাদেশে মাতৃভাষার প্রতি সমাদর অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে—আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে ইহা বিশেষ আশাপ্রদ। আমরা মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা-প্রদানেরই পক্ষপাতী—একদিন তাহা

হইবে ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু বিদেশীয় ভাষাগুলি আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ ইংরাজীসাহিত্যে আমাদিগের পাণ্ডিত্য চিরকালই প্রয়োজনীয় থাকিবে। আমরা ইংরাজীকে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা মাত্র মনে করি—ইহা দ্বিতীয় ভাষাই থাকিবে। কিন্তু ইহার অনুশীলনে আমাদের ত্রুটি হইলে অশেষ ক্ষতি।

দুঃখের বিষয় ইংরাজীর প্রতি আদর একটু কমিয়াছে মনে হইতেছে। কারণ জানি না, কিন্তু চট্টগ্রাম হইতে বাঁকপুর পর্য্যন্ত কলেজগুলির অধ্যাপক মহাশয়গণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে আজকালকার ছেলেরা—গ্র্যাজুয়েটগণও—ইংরাজী ভাষায় অতি সামান্য সামান্য নিয়মগুলিও আয়ত্ত করে না, ইংরাজীতে লিখিতে বা পড়িতে হইলে তাহাদের বিশেষ কষ্টবোধ হয়।

ইহা নিবারণের উপায় অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে Modern Review, Dawn এবং Collegian এই তিনখানা কাগজ সকলেরই পাঠ করা উচিত। "মডার্ণ-রিভিউ" পত্রিকায় গত আট বৎসরে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমাদের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, সমাজ ও অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সুবিচারিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। যাঁহাদের সুবিধা আছে তাঁহারা এই মাসিক পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি ক্রয় করিয়া text bookএর ন্যায় পাঠ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের-সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার ফল অপেক্ষা বেশী ফল লাভ করিবেন।

"ডন" পত্রিকায়ও ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব নানা উপায়ে বুঝান হইয়াছে। ইহারও পুরাতন সংখ্যাগুলি সকলেরই অবশ্যপাঠ্য। Modern Review ও Dawn এই দুই পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালায়

অনুবাদ করিবার জন্য কোন প্রকাশক বা পুস্তক-বিক্রেতা অগ্রসর হইলে, দেশের লোকশিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন।

Collegian শিক্ষাবিষয়ক পাক্ষিক পত্র। বাঙ্গালাদেশে ইহাই একমেবাদ্বিতীয়ম্। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও ইহা সুপ্রচলিত। শিক্ষাজগতের কোথায় কি ঘটিতেছে বিশেষভাবে এই সংবাদ প্রদান করাই কলেজিয়ান পত্রিকার উদ্দেশ্য। আজকাল শিক্ষা-সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব পাইবার জন্য দেশবাসীর আগ্রহ জন্মিয়াছে। আশা করি, তাঁহারা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। সময়ের লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে—প্রায় সকল জেলাতেই সাহিত্যানুশীলনের এরূপ পরিচয় অনতিবিলম্বে পাওয়া যাইবে। অনেকে এই সমুদয় সাময়িক বা ক্ষণিক উদ্যমের সার্থকতা দেখেন না। কিন্তু আমরা মনে করি—নানা উপায়ে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্বাভিমান, দায়িত্বজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বাড়াইয়া দিবার ইহাই একমাত্র উপায়। সুতরাং ইহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও আমরা সকল জেলার সাহিত্যসেবিগণকেই এই উপায়ে সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছি।

স্থানীয় উদ্ভিদাদির বিবরণ, শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা, বৈষয়িক ও সামাজিক তথ্যসংগ্রহ, শব্দতত্ত্ব, লোক-সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় জেলার মাসিকপত্রিকাগুলিতে বিশেষরূপেই আলোচিত হইবে। ইহাদের সাহায্যে অনেক নূতন লেখক, কবি ও শিল্পী বাঙ্গালার সাহিত্য-সংসারে পরিচিত হইবেন। কিন্তু আলোচনার ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ হইল বলিয়া সকল বিষয়ে ক্ষুদ্রত্ব, সঙ্কীর্ণতা এবং অনর্থক প্রতিযোগিতার প্রশ্রয় দেওয়াই স্থানীয় পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য থাকিবে না। সমগ্র বঙ্গীয়

সাহিত্যের গভীরতর ও বিস্তৃততর অনুশীলনের উদ্দেশ্যেই নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বপ্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল মাত্র—এই আদর্শে জেলার মাসিক পত্রগুলির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে উদারতার সহিত শ্রমবিভাগ-নীতির অনুসরণ করিলে বঙ্গজননীর বাণীমূর্ত্তি একদিকে বিচিত্রতা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে, অন্যদিকে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়*

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙ্গসাহিত্যের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি, বঙ্গভাষাভাষীর ঐক্যবিধান, তারকনাথ-রাসবিহারীর দান এবং দামোদরের বন্যা—এই কয়েকটি নূতন ঘটনা গত দুই তিন বৎসরের বিশেষ লক্ষণ। এই সকল ঘটনার ফলে যে যুগের আরম্ভ হইল" তাহাকে গত সংখ্যায় আমরা ভারতে "স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ" নামে অভিহিত করিয়াছি। "সাহিত্যের প্রসার, সেবাধর্ম্মের প্রচার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা, দিল্লীতে রাজধানী-প্রবর্ত্তন, বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি কতিপয় নূতন শক্তি আসিয়া সমাজে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত করিল। এই নূতন শক্তিপুঞ্জের শেষ নিদর্শন দামোদর-বন্যায় দেশবাসীর কার্য্যতৎপরতা। এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের নব নব লক্ষণ দেখিতে পাইব।"

বাঙ্গালী জাতির আট বৎসর বয়সে সমগ্র দেশের ভিতর বিশেষ নাড়া দিবার জন্য রুদ্রদেব দামোদরের প্লাবনোপলক্ষ্যে একটা তাণ্ডবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা ভারতে নবজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় উন্মুক্ত হইল। অধিকন্তু, দ্বিতীয় যুগের এই আবাহন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই আমরা একজন বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর বিশ্ব-সাহিত্যে শীর্ষস্থানলাভের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। সত্যসত্যই আমরা দ্বিতীয় যুগে প্রবেশ করিয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীকে "এসিয়ার রাজকবি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

---

* 'গৃহস্থ' (অগ্রহায়ণ, ১৩২০) হইতে উদ্ধৃত।

বঙ্গসরস্বতীর বরপুত্রের যথোচিত সমাদর করা হয় নাই—ইহা বুঝাইবার জন্যই যেন আজ ভারতের রবীন্দ্রনাথকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-কলা-সাহিত্য-পরিষৎ ইউরোপের মুখপাত্ররূপে তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার * দান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ১৯১৩ সালে পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ বিবেচিত হইয়াছে। এই বৎসরের জন্য বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-জগতের "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞানে বিশ্ববাসীর পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই দিগ্বিজয় ভারতের নবযুগে নবীনজাতিগঠনে কতখানি সহায়তা করিবে, আমরা ভবিষ্যতে তাহা আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্য ও ভারতবাসীর চিন্তাশক্তি জগৎকে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিবে তাহা অল্পদিনের ভিতরই নিতান্ত অজ্ঞ ও অন্ধ লোকেরাও বুঝিতে পারিবেন। কতকগুলি ঘটনাচক্রের প্রভাবে হিন্দু চিন্তাবীরকে—একটি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার আজীবন সেবককে,—প্রাচ্যজগতের তথাকথিত অর্দ্ধসভ্যজাতি-প্রসূত মানবসন্তানকে পাশ্চাত্যজগৎ বৈঠকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সম্মান ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি কি কারণে ইউরোপীয় সুধীবর্গ প্রাচ্যজগতের একজন চিন্তাবীরকে এরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মান ও গৌরব বোধ করিলেন, তাহার আলোচনা করিবার জন্য অনতিদূর ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন। অধিকন্তু, ইতিহাস-বিজ্ঞানের কোন্ নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পদই মানবজাতিকে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবন-ধারার অন্যান্য বিভাগ বুঝাইবার উপায় ও কেন্দ্রস্বরূপ হইল—তাহার বিশ্লেষণও অল্পকালের ভিতরই দেশবিদেশের পণ্ডিত-সমাজে আরব্ধ হইবে।

* নোবেল পুরস্কারের মূল্য নগদ ১২০,০০০৲ টাকা।

আমরা এখন বাঙ্গালীকে ও ভারতবাসীকে কয়েকটি কথামাত্র স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। প্রথমতঃ, এত উচ্চসম্মান-লাভ অন্য কোন এসিয়াবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই—এমন কি জাপানেরও এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দুর্লভ যশঃ-প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গালীর সম্বর্দ্ধনায় সমগ্র এসিয়াখণ্ডের, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী প্রাচ্য মানবের সম্বর্দ্ধনা হইল। ১৯০৫ সালে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রুশিয়াকে সম্মুখসমরে পরাজিত করিয়া জাপান বিশ্বের রাষ্ট্র-মণ্ডলে এক নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছেন—প্রকৃত প্রস্তাবে মানবেতিহাসের বিংশ শতাব্দীরই উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ জগতের সাহিত্য-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া সেই নবযুগের ক্রম-বিকাশে সহায়তা করিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচ্যপ্রভাব-প্রতিষ্ঠার পথ আরও প্রশস্ত হইল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতেছেন যে, জাপানের জয়লাভ এবং রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তুল্যপ্রভাবসম্পন্ন ও সমগোষ্ঠীভুক্ত—দুই ঘটনা একই শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি—একই ঘটনার বিভিন্ন মূর্ত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি"রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের উপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলেন। তাহার ফলে মানবজাতি রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কেন্দ্র ও পথপ্রদর্শক করিয়া ভারতের আপামর জনসাধারণের যুগযুগান্তরব্যাপী ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র-মনুষ্যত্ব, সভ্যতা-আদর্শ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবে। পরে ক্রমশঃ যখন কথঞ্চিৎ গভীর ও পরিষ্কারভাবে সভ্যজগৎ ভারতবর্ষের বাণী এবং ভারতীয় মর্ম্মকথা বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়া ভারতীয় চিন্তাপ্রবাহের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইতে থাকিবে, তখন তাহারা বুঝিবে যে, রত্নপ্রসবিণী ভারতমাতা রবীন্দ্রনাথকে দৈবক্রমে প্রসব করেন

নাই, রামমোহন-রাণাডে-দয়ানন্দ-রামতীর্থ-ভূদেব-বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের লীলাভূমি ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম আকস্মিক ঘটনা বা প্রকৃতির খেয়াল মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের গরীয়সী জন্মভূমির অসংখ্য বীর-সন্তানের অন্যতম মাত্র—একমেবাদ্বিতীয়ং নহেন। তখন তাহারা নবযুগের প্রবর্ত্তক বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে,—তখন তাহাদের ধারণা জন্মিবে যে ,"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।" তখন তাহারা সত্য-সত্যই বুঝিতে পারিবে—কেন ভারতের অমরকবি দ্বিজেন্দ্রলাল—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ।"

—এই গান গাহিয়া নব্যবঙ্গকে বঙ্গজননীর প্রকৃত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে শিখাইয়াছেন। তখন চিন্তা-জগতের পক্ষপাতদোষশূন্য সমদর্শী ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার উদীয়মান শিশুকবি সত্যেন্দ্রনাথের—

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।

একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে।
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি'
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।
স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যামরাজ্যেতে 'ওঙ্কার-ধাম'—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি'।

* *

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি' আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।

* *

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়,
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
তপের প্রভাবে বাঙ্গালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনের বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়েছে বিয়া
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভাবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

*

অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।'

—ইত্যাদি জাতীয় গৌরবদৃপ্ত উচ্ছ্বাসবাণীর অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই।

তৃতীয়তঃ,—রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বঙ্গভাষারই সেবা করিয়াছেন। বঙ্গসরস্বতী তাঁহার এই একনিষ্ঠ সাধকের সম্বর্দ্ধনায় বজ্রনিনাদে দেশবাসীকে অভয়বাণী প্রচার করিতেছেন:—"যে ভাষায় গান গাহিয়া, কবিতা লিখিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিজয়ী বীর হইতে পারিলেন, যে ভাষার অনুবাদ মাত্র পাইয়া জগৎ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইল, সেই ভাষা আর বেশী দিন সরকারী শিক্ষাবিভাগের বিধানে দেশবাসীর দ্বিতীয় ভাষা মাত্র থাকিবে না। বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় অত্যুচ্চ বিজ্ঞান, অত্যুচ্চ দর্শন, অত্যুচ্চ ইতিহাস রচিত হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে যাঁহারা সন্দেহ করিবেন, তাঁহারা জগতের পণ্ডিত-সমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত হইবেন। সুতরাং অল্পকালের ভিতরই দেশীয় সন্তান-সন্ততির সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রদানের জন্য তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যই গ্রহণ করা হইবে। বিদেশীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিক ও 'জাতীয়' পদবাচ্য হইয়া উঠিবে। সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহের অভাবে দেশীয় জনসাধারণের মাতৃভাষা তাহার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্য প্রকটিত করিতে পারিতেছে না। অচিরেই সেই সকল অভাব ও বিঘ্ন মোচন করিবার যথোচিত ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষের মাতৃভাষাগুলি ও প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহ অতি সত্বরেই শিক্ষার ব্যবস্থায় তাহাদের প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিয়া নানা উপায়ে ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব-গঠনের সহায় হইবে।"

বাঙ্গালীর "গোবরা"

বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম"। বঙ্কিমের উদ্বোধন সার্থক হইয়াছে।

বাঙ্গালী বিলাতে যাইয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সমস্ত পৃথিবীর লোককে বিদ্যায় পরাস্ত করিয়াছিল। সে আজ বেশী দিনের কথা নয়। সে কথা বেশী লোকের মনে নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-প্রচারক আমেরিকার চিন্তারাজ্যে নবযুগ আনিয়া দিয়াছে—তাহা কেহ কোন দিন ভুলিবে না—বরং যত দিন যাইবে ততই দেশবিদেশে তাহার প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হইতে থাকিবে। অধিকন্তু, বাঙ্গালীর বক্তা, বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর সাহিত্যসেবী ইংরাজ-সমাজে ও ইংরাজী-সাহিত্যে অতুলনীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী চিন্তা-প্রবাহের ইতিবৃত্ত লিখিবেন, তাঁহারা বাঙ্গালী জাতির ইংরাজী ভাষায় লিখিত রচনাগুলি ভুলিয়া যাইবেন না। ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালী লেখকগণকে ভুলিয়া গেলে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গালীর বিজ্ঞানবীরও পৃথিবীর বিদ্যারাজ্যের একটা নূতন বিভাগ খুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা এখন বিশ্ববিশ্রুত। আর আজ জননী বঙ্গভাষার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক "জগৎ-কবি-সভার মাঝারে" প্রধান আচার্য্যের অর্ঘ্য লাভ করিয়া এক অভিনব উপায়ে ভারতবাসীর প্রতি মানবজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন।

বাঙ্গালী-সন্তান জগতের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-ভাণ্ডারের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে—সরস্বতীর এই আশীর্ব্বাদ লইয়াই যেন বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর শারীরিক শক্তি ও

বাহুবল সম্বন্ধে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাহিরের অন্যান্য জাতির মধ্যে একটা নিন্দা ও অখ্যাতি প্রচারিত ছিল। দেখিতেছি, জগজ্জননীর কৃপায় এই নিন্দা নিবারিত হইতে চলিয়াছে। অল্পদিনের ভিতর আমরা আমাদের জাতির মধ্যে স্বাস্থ্য ও সবলতার পরিচয় পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের চোখের সম্মুখে একটা কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় বাঙ্গালী সন্তান উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখিয়া "ইংলিশম্যান" ইতিমধ্যেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরে "মোহনবাগানের জয়লাভ" বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা। অর্দ্ধোদয় যোগে এবং সেদিনকার জলপ্লাবনেও বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্মপটুত্ব, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও নেতার আজ্ঞাপালনক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা বর্ষা-রৌদ্রের প্রভাব উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে, এবং অনাহার-অনিদ্রায় ভ্রূক্ষেপ করে না। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই সমুদয় অতি আশাপ্রদ পূর্ব্বলক্ষণ। সেদিন বাঙ্গালী বালক শ্রীমান্ "গোবরা" বিলাতে যাইয়া কুস্তীগির উপাধি লাভ করিয়াছে। আজ সে পৃথিবীর সর্ব্ববিখ্যাত পালোয়ানকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য আমেরিকায় চলিল। "বাহুতে তুমি মা শক্তি"—এই মন্ত্রও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।

ভারতে পাশ্চাত্য পণ্ডিত

পাশ্চাত্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ভারতসমাজ তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সেই সমাজের রীতিনীতি, আইনকানুন বুঝিবার জন্য বিদেশীয় শাসনকর্ত্তারা যত্ন লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের "আবিষ্কার" হয়—এবং কতকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়। সে আজ প্রায় ১০০।১৫০ বৎসরের কথা। তাহার পর বিদেশীয়গণের পক্ষে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, কলা, শিল্প, সভ্যতা কিছুই সম্মান করিবার বা বিশেষরূপে আদর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাশ্চাত্য-জগৎ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এ কথা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় তাঁহাদের সমাজে প্রচারিত ছিল। তুলনা-মূলক সমাজ-বিজ্ঞানের খাতিরে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা বিদ্বৎসমিতি ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে কিছু কিছু মাথা ঘামাইতেন। কিন্তু জাতীয় অভিমান এবং স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ খর্ব্ব করিয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বেশী লোক এজন্য কষ্ট স্বীকার করেন নাই। কিছু দিন হইতে পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সাহিত্য, সমাজ, চিত্রকলা, দর্শন প্রভৃতির গৌরবপ্রচারক জুটিয়াছেন। এই সকল "ভারত-বন্ধু"গণের মধ্যে অনেকেরই একটা মুখ্য উদ্দেশ্য পুস্তকাদি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়।

আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি—সম্প্রতি প্রাচ্যজগতের জীবনবত্তার পরিচয় পাইয়া পাশ্চাত্য জগতের সত্যসত্যই ভাব-পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বিগত ৭।৮ বৎসর হইতে তাহারা প্রাচ্যকে গভীর ভাবে, সত্য ভাবে এবং বৈজ্ঞানিকের চোখে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এজন্য ২।৩ বৎসর হইল বিলাতে Universal Races Congress বা বিশ্ব-মানব-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা না করে, সাহিত্যালোচনা ও বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া যথাসম্ভব সেই চেষ্টা করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। তাহার ঢেউ ভারতে পৌঁছিবে—কথঞ্চিৎ পৌঁছিয়াছে। সময়ের লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে —ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা, ঘরের কথা, সামাজিকতার কথা, ধর্ম্মকর্ম্মের কথা ইত্যাদি ভারতীয় অন্তর্জ্জগতের বিচিত্র রহস্যগুলি দখল করিবার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, গুজরাতী ইত্যাদি সকল প্রকার ভাষা শিখিবেন। এই সকল ভাষাভাষী লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাশ্চাত্য সুধীগণ ভারতীয় ভাষাতেই কথা বলিতে অভ্যাস করিবেন—প্রয়োজন হইলে, ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিতেও সাহায্য করিবেন। আমরা দেখিতে পাইব ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া ভারতের প্রত্নতত্ত্ব, গ্রাম্য কথা, ভাষাতত্ত্ব, মূর্ত্তি-তত্ত্ব, তরু-লতা, কৃষি-শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সংগ্রাম

ভারতবর্ষের বাহিরে অনেক স্থানে ভারতীয় হিন্দুমুসলমান ব্যবসায়াদি উপলক্ষে বাস করিতেছেন। তাহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা একটি প্রধান উপনিবেশ। উপনিবেশ বটে, কিন্তু একদিন "সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ"—এ সে উপনিবেশ নয়। এ উপনিবেশ সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতসন্তানের বনবাসেরই নামান্তর। সুতরাং এখানে দুঃখ দৈন্য লজ্জা ক্লেশের সীমা নাই। অধিকন্তু বিশেষ পরিতাপের কথা এই যে, ভারতভূমি হইতে যাহারা অন্নচিন্তায় অস্থির হইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের খবর লওয়া পর্য্যন্ত আমরা আমাদের গৃহস্থধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করি নাই। নীচাশয়তা ও সঙ্কীর্ণতা আর কাহাকে বলে ?

গত বৎসর মহারাষ্ট্র-জননায়ক শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি সে স্থানে আমাদের স্বজাতীয়-দিগের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় জনগণের কথা ভারতবর্ষে কথঞ্চিত আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা যে ভারতসমাজেরই এক অংশ, এ ধারণা আমাদের হৃদয়ে এখনও বদ্ধমূল হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-বাসীগণ যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষেরই মান-সম্ভ্রম, জগতে প্রতিষ্ঠালাভ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি যে নির্ভর করিতেছে তাহা এখনও আমরা বুঝি নাই। তাঁহারা যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আমাদেরই জীবন-সংগ্রামের এক অধ্যায় মাত্র,

তাঁহাদের জয়-পরাজয়ে আমাদের বিকাশ-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সে তত্ত্ব এখনও আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই।

সেখানে আমাদের স্বজাতীয়েরা কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আজ তাহারা ঘোরতর দুর্দ্দৈব ভোগ করিতেছে। ভারতমাতার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ সেখানে দলে দলে কারাবাসে প্রেরিত হইতেছে এবং প্রাণ দান করিতেছে। ভারতে যে সকল জনকজননীগণ রহিয়াছেন তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আজ দক্ষিণ আফ্রিকার হিন্দু-মুসলমান নর—নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করিতেছে, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিতেছে, ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ উপেক্ষা করিতেছে। শত শত দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয় সন্তান ভারতমাতার 'ইজ্জৎ' রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহারা ঢালতরওয়াল, বন্দুক, গুলিগোলা লইয়া লড়াই করিতে চাহে না, আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহারা হস্ত উত্তোলন করে না, করিবেও না। অন্যায় আইন যতদিন না সংশোধিত হয়, ততদিন নিজেরা সকল প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিবে, জেলে পচিবে, শাসনকর্ত্তাদের হাতে প্রাণ দিবে, তথাপি অপমানসূচক আইন স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিবে না, ইহাই তাহাদের সংগ্রামের মূলমন্ত্র! এ এক বিচিত্র সংগ্রাম—সংগ্রামকারিগণ কাহাকেও আঘাত করে না, কেবল নিজেরাই নিরুদ্বেগে বিনা বাক্যব্যয়ে সর্ব্ববিধ যন্ত্রণা সহ্য করে। এই সংগ্রাম একমুখো।

ভারতবাসী গৃহস্থগণ, এই যে শত শত লোক অবলীলাক্রমে কারাগৃহে যাইয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া তোমাদের মুখ রক্ষা করিতেছে, ইহারা কোন্ শ্রেণীর লোক, জান? যাহাদিগকে

তোমরা অশিক্ষিত, মূর্খ, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক, ইহারা সেই শ্রেণীর লোক। ইহাদের মধ্যে ধনবিজ্ঞানের-সূত্র-মুখস্থ-করা, এম্-এ-ডিগ্রীধারী পাণ্ডিত্যাভিমানী, বিজ্ঞানবীর, সাহিত্যরথী, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী একজনও নাই। প্রায় সকলেই মুদী, দোকানদার, ফেরিওয়ালা ; সোজা কথায় "চাষা" অর্থাৎ massপদবাচ্য। ভারতীয় মূর্খ জনসাধারণের চরিত্রবত্তার এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের আর কোন পরিচয় চাহ কি ?

তোমরা ইহাদের জন্য কি করিবে—পৃথিবীর লোক তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক। জানিয়া রাখিও, এই নীরব রক্তহীন সংগ্রামের ফল জার্ম্মাণি, আমেরিকা, চীন, জাপান, ইংলণ্ড সকলেই অধীরভাবে দেখিতেছে। ভারতবর্ষের প্রাণ আছে কি না, মায়ামমতা, ঐক্য-দৃঢ়তা, স্বজাতিপ্রিয়তা আছে কি না, ভারতবাসী নিজ আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করিতে শিখিয়াছে কি না—এই বিচিত্র ধর্ম্ম-সংগ্রামে তাহারই পরীক্ষা হইতেছে। ভারতবাসীর দৌড় কতদূর—সমস্ত পৃথিবী আজ তাহা দেখিবে।

ভরসা আছে, ভারতবর্ষ একটিমাত্র ভারতসন্তানের জন্যও আর উদাসীন থাকিবে না। ভারতবর্ষ জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে, সেখানে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইবে না। যে সকল পিতামাতা ও কর্ম্মঠ পুত্রকন্যাগণ পরিবারের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া সহাস্যবদনে প্রবেশ করিতেছে, এবং মৃত্যুকে অভিবাদন করিতেছে, তাহাদের নাবালক পুত্রকন্যাগণের অন্নবস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। বাঙ্গালীও পশ্চাৎপদ নহে।

হিন্দুজাতির নিকট পাশ্চাত্যের ঋণ

আজকাল আমরা বলিতে শিখিয়াছি,—"তার পর, দুর্ভিক্ষ-অনাহারের প্রকোপ যখন কমে আস্‌বে, পরে এক দিন এই ভারতের ধর্ম্মনেতারা দেশ হ'তে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'বেন, এবং একে একে ইউরোপের সকল দেশকে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়ে মন প্রাণ কেড়ে ল'বেন। দেখ্‌ব, ভারতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ইউরোপের কর্ম্মবিজ্ঞানকে মুক্তির পথ দেখিয়া দিয়ে ওঁদের জীবন-সংগ্রাম ও সাংসারিকতার হ্রাস করে দেবে। ইউরোপীয় সমাজ এখন বৈষয়িক ভারে জর্জ্জরিত,—এই আধ্যাত্মিক নবজীবনের জন্য বসে' আছে। ভারতের প্রকৃত উন্নতিতে ইউরোপেরও মুক্তি।"

মানবসভ্যতার উপর হিন্দুজাতির প্রভাব-বিস্তারের আশায় এখন আমরা সাহসপূর্ব্বক নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া থাকি; "গ্রীক-সাহিত্য-বিস্তারের দ্বারা ইউরোপের ষোড়শ শতাব্দীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতির নব অভ্যুদয় হিন্দু-সাহিত্য-প্রচারের দ্বারা সংঘটিত হইবে। ভারতের বিদ্যাপ্রচারক, শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্যপ্রচারকগণ, বিশ্বের বিজ্ঞান-ভাণ্ডার,—মানব-জাতির সারস্বতক্ষেত্র, আপনাদের অপূর্ব্ব সাহসিকতা, বিপুলবিস্তৃত অধ্যবসায় ও জগদ্ব্যাপিনী সাধনার ফল প্রতীক্ষা করিতেছে।"

আমাদের এই আশা কি অমূলক? আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা কি বাতুলতা মাত্র? আমাদের এই ভবিষ্যতের নয়নরঞ্জক, চিত্তবিমোহনকারী দৃশ্য কি উন্মাদময়ীকল্পনাসৃষ্ট মরুদেশের মরীচিকার ন্যায় উপেক্ষণীয়? যাঁহারা অতীত-গৌরববাহিনী ইতিহাস-কথাকে কাব্যের ছড়া মাত্র মনে

করেন, তাঁহারা আমাদের ভবিষ্য জাতীয় জীবনের চিত্রকে দুরাশার স্বপ্ন মাত্র বিবেচনা করিবেন, সন্দেহ নাই। আর, যাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্যক্ জানিবার ইচ্ছাকে "নব্য সভ্যতা"র প্রতিবন্ধক বিবেচনা করেন, এবং হিন্দুজাতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের স্তর-বিন্যাসগুলির সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা হিন্দুসভ্যতার আগামী যুগধর্ম্মের উদ্বোধনকে বৃথা বাক্যাড়ম্বর জ্ঞানে তুচ্ছ করিবেন। কিন্তু অতীত কখনও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ত্যাগ করে না—বর্ত্তমান অকৃতজ্ঞ হইলেও তাহারই ভিতর দিয়া অতীত ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করিয়া লয়।

ভারতবর্ষের অতীত মিথ্যা নয়, অলীক নয়—হিন্দুজাতির পূর্ব্ব কার্য্য-কলাপ কবিকল্পনার সামগ্রী নয়, কেবল মাত্র ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত নয়, যোগী-ঋষিরই উপলব্ধিগম্য নয়। আধুনিক জাতীয়-গৌরবদৃপ্ত মিথ্যা অভিমানের আশ্রয়েই স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ আমাদের নিকট দৈবক্রমে পূজা-লাভেব যোগ্য হইয়া উঠে নাই! ভারতবর্ষ চিরকাল মানবজাতির গুরুস্থানীয়, ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যুগে যুগে মানবসন্তানকে শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিতরণ করিয়াছেন। কেবল আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্বই নয়, কেবল মুক্তি, নির্ব্বাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্যের কথাই নয়,—ভারতবাসী সর্ব্বদা এসিয়া ও ইউরোপকে বৈষয়িক জ্ঞান, ব্যবহারিক বিদ্যা, গৃহস্থালী-তত্ত্ব এবং সাংসারিক জীবনে উন্নতির উপায় শিক্ষা দিয়াছে। জগতে ভারতবর্ষের গুরুগিরি ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে—তোমাদের তাম্রশাসন, প্রাচীন পুঁথি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য, বিদেশীয় সাহিত্যের প্রমাণ, চীন, জাপান, আরব, পারস্য এবং গ্রীসের প্রাচীন অর্ব্বাচীন লেখক-গায়ক-শিল্পিকুল সকলেই সাক্ষ্য দিতেছে—ভারতবর্ষের নিকট এসিয়া ও ইউরোপ প্রায় সকল

বিষয়েই ঋণী। আমরা ক্রমে ক্রমে প্রমাণসহ দেখাইব যে, মানবজাতির বড় বড় ধর্ম্মগুলি, বড় বড় দর্শনবাদগুলি, বড় বড় বিজ্ঞানগুলি হিন্দুজাতির উদ্ভাবিত, হিন্দুজাতির মনীষার ফল। হিন্দুজাতি সর্ব্বদা সকল জাতিকে ঋণে আবদ্ধ রাখিয়াছে—ভবিষ্যতেও যে রাখিবে তাহা সন্দেহ করিয়া দুর্ব্বলতার এবং অদূরদর্শিতার ও নৈরাশ্যের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

পাটীগণিতে ভারতবর্ষের দান

এবার আমরা হিন্দুজাতির গণিত-বিজ্ঞানে উৎকর্ষলাভের কথা বলিব। সংখ্যালিখনের দশমিক প্রণালী যে ভারতবর্ষে প্রথম অবলম্বিত হয়, তাহা আজকাল সর্ব্ববাদী-সম্মত। আর্য্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত যে সংখ্যালিখনে দশমিক প্রণালী অবগত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যভট্ট খৃষ্টীয় ৪৭৬ সালে, ব্রহ্মগুপ্ত ৫৯৮ সালে, জন্মগ্রহণ করেন। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীতে এই প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ এই প্রণালী সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করেন। আর্য্যভট্টের আর্য্যভট্টীয় (জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত) ও ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত কালিফ আল্ মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫) সময় আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। কালিফ আল্ মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৩৩) খোরাসান-নিবাসী মহম্মদ ইব্‌ন্ মুসা ভারতবর্ষে আগমন করেন। ৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একখানি বীজগণিত লেখেন। ঐ বীজগণিত আর্য্যভট্টীয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্ত্তী আরব-বীজ-গণিত-লেখকগণ মুসার বীজগণিতের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। যতদূর পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে আরবদেশে সংখ্যালিখনের দশমিক প্রণালীর ব্যবহার ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম হয়। কালিফ ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালে আরবদেশে দশমিক প্রণালীর ব্যবহারের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না।

দশমিক প্রণালী খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচলিত হয়। ১১০২ খৃষ্টাব্দে Leonardo, "Algebra et al muchabala" নামক

গ্রন্থ প্রচার করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি দশমিক প্রণালী বর্ণন করেন এবং সেই সময় হইতে ইউরোপে উহার প্রচার আরম্ভ হয়। লিওনার্ডো ঐ গ্রন্থে রোমক প্রণালী অপেক্ষা আরবীয় প্রণালীর উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠে ইহাও জানা যায় তৎসময়ে দশমিক প্রণালী ইউরোপে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

সংখ্যালিখনের চিহ্নগুলিও যে ভারতবর্ষ হইতেই আধুনিক সভ্যজগতে প্রচলিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানে প্রচলিত দেবনাগরী সংখ্যাচিহ্নগুলিই রূপান্তরিত হইয়া আরবগণের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। আরবগণের নিকট হইতে ইউরোপীয়গণ উহা গ্রহণ করেন।

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ ও ঘনমূল-নিষ্কাশন প্রভৃতি কার্য্যের যে যে প্রণালী আজকাল সভ্যজগতে সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহা ভাস্করাচার্য্যের (১১১৪ খৃঃ অঃ) লীলাবতীতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীধরাচার্য্যের (৯১৩ খৃঃ অঃ) ত্রিশতিকায়ও বর্গ এবং ঘনমূল-নিষ্কাশনের নিয়ম বর্ণিত আছে।

হিন্দুজাতি বীজগণিতের জন্মদাতা

জার্ম্মান্ পণ্ডিত হিকেল (Hæckel) সাহেবের মতে হিন্দুগণ বীজ-গণিতের আবিষ্কর্ত্তা। বস্তুতঃ যদিও ডাওফ্যান্টাস্ (Diophantus) বীজগণিতের কতকগুলি তথ্যের আলোচনা করিয়াছিলেন, সাঙ্কেতিক বীজগণিত ভারতবর্ষেই প্রথম আলোচিত হয়। সময় হিসাবে আর্য্যভট্ট যদিও ডাওফ্যান্টাসের পরবর্ত্তী, কিন্তু আর্য্যভট্টের বীজগণিত যে ডাওফ্যান্টাসের বীজগণিত অপেক্ষা অনেক উচ্চে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্য্যভট্টের বীজগণিতে বর্গসমীকরণের সম্পূর্ণ সমাধান, ১,২,৩,...প্রভৃতি রাশিগুলির, উহাদের বর্গের, ও ঘনফলের সমষ্টি এবং একঘাত (Indeterminate) সমীকরণের সমাধান পাওয়া যায়। বর্গ-সমীকরণের যে দুইটী মূল আছে, তাহা হিন্দুগণ জানিতেন; গ্রীকগণের উহা অবিদিত ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত দ্বিঘাত (Indeterminate) সমীকরণের আলোচনা করিয়াছিলেন। ডাওফ্যান্টাস্ ঐ প্রকার সমীকরণের একটী বিশেষ সমাধান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুগণ সাধারণ সমাধান লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত যে যে সমাধান সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে মাত্র সাধিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্ত-প্রদত্ত একটী দ্বিঘাত (Indeterminate) সমীকরণের সাধারণ সমাধান জগদ্বিখ্যাত ইউলারও (Euler) সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ইউরোপে উহার সমাধান ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে Dela Grange কর্ত্তৃক সাধিত হয় এবং তাঁহার সমাধান ব্রহ্মগুপ্তের সমাধানের অবিকল অনুরূপ। আর্য্যভট্টের কুট্টক-প্রণালী ইউরোপে

ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিদিত ছিল। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে Bachet ঐ প্রণালী প্রথম ইউরোপে প্রচলন করেন। আর্য্যভট্ট একাধিক অব্যক্ত-রাশিঘটিত সমীকরণেরও আলোচনা করিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কিন্তু হিন্দু বীজগণিতজ্ঞগণের প্রথম নহেন। তাঁহার পূর্ব্বেও যে বীজগণিতের চর্চ্চা হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে উপলব্ধি হয়। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীতে শূন্য সম্বন্ধে একটী অধ্যায় আছে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, $অ + ০ = অ$, $0^২ = ০$, $\sqrt{০} = ০$, $অ \div ০ = \infty$। মূল লিখিবার চিহ্ন $\surd$ ভাস্কর প্রথম ব্যবহার করেন। ইউরোপে ঐ চিহ্ন Chuquet (১৬শ শতাব্দী) সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেন, পরে Rudolff ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উহা প্রচলিত করেন। ঋণাত্মক রাশির ব্যবহার হিন্দুগণ প্রথম আবিষ্কার করেন। রাশির উপর একটী বিন্দু লিখিলে তাহা ঋণাত্মক বিবেচিত হইত। ভগ্নাংশ লিখিবার প্রণালী—লবের নীচে হর লেখা—হিন্দুগণ প্রচার করেন; প্রথমতঃ লব ও হরের মধ্যে কষি লিখিত হইত না, পরে কিন্তু ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ভগ্নাংশ লিখিবার এই প্রণালী আরবগণ হিন্দুগণের নিকট শিক্ষা করেন এবং পরে ইউরোপে প্রচার করেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার বীজগণিতের শেষ অধ্যায়ে সংযোগ (Combination) সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

হিন্দুস্থানে জ্যামিতির উৎকর্ষ

পণ্ডিতগণের মতে জ্যামিতির আবিষ্কার ইজিপ্টদেশে সংঘটিত হয়। গ্রীসে ইহার আলোচনা ও সম্যক উন্নতি সাধিত হয়। হিন্দুগণের জ্যামিতিজ্ঞান ও তাহার আলোচনা কিন্তু তাৎকালিক অন্য প্রদেশের তুলনায় কোনও মতেই হীন নয়। পরন্তু কোনও কোনও অংশে তাহা গ্রীক জ্যামিতি অপেক্ষা অনেক উচ্চে। গ্রীক জ্যামিতি ও শুল্ভ-সূত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া গণিতের ইতিহাস-লেখক Cantor সাহেব এই সিদ্ধান্ত প্রকটিত করেন যে, শুল্ভ-সূত্রের লেখক গ্রীক জ্যামিতি-বেত্তা হিয়েরো (Hiero of Alexandria) এবং তাঁহার শিষ্যগণের নিকট অনেকাংশে ঋণী। কিন্তু শুল্ভ-সূত্র খৃষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, প্রোফেসর Ball (W. W. R.) এর মতে হিয়েরোর সময় সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০ সালের পূর্ব্বে নয়। বস্তুতঃ কোনও ইতিহাস-লেখকই তাঁহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৫ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন নাই। ডাক্তার থিবো দেখাইয়াছেন যে, ইউক্লিডের ১ম অধ্যায়ের ৪৭শতম প্রতিজ্ঞা,—যাহা পিথাগোরস (৫৬৯—৫০০ খৃঃ পূঃ) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া প্রবাদ—হিন্দুগণ পিথাগোরসের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছিলেন। জার্ম্মান্ পণ্ডিত Schrderএর মতে পিথাগোরস হিন্দুজ্যামিতি-শাস্ত্র হইতে অনেক জিনিষ লইয়াছিলেন। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত—π—এর মান হিন্দুগণ যত সূক্ষ্ম পরিমাণে জানিতেন গ্রীকগণ তাহা জানিতেন কি না সন্দেহ। আর্কিমিডিস πএর মান ৩ ১/৭ অপেক্ষা বৃহত্তর ও ৩ ১০/৭১ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বলিয়া স্থির করেন। অর্থাৎ তাঁহার গণনানুসারে

π ৩·১৪২৮৫৭ ও ৩·১৪০৮৪৫এর মধ্যবর্ত্তী। হিয়েরো πএর মান ৩ ও ২২/৭ দুই প্রকারই গ্রহণ করেন।•

রোমীয়গণ স্থূলগণনা-কালে πএর মান কখনও ৩, কখনও ৪ গ্রহণ করিতেন; সূক্ষ্মগণনার জন্য তাঁহারা ৩১/৮ = ৩·১২৫ লইতেন।

বৌধায়ন শুল্ভ-সূত্রে πএর মান ৩·০৬২৫ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—
আর্য্যভট্ট πএর মান নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকট করিয়াছেন—

চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাম্।
অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্ত-পরিণাহঃ ॥

অর্থাৎ তাঁহার মতে πএর আসন্নমান ৬২৮৩২/২০০০০ = ৩·১৪১৬।

ভাস্করাচার্য্য πএর মান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

ব্যাসে ভনন্দাগ্নি হতে বিভক্তে খবাণ-সূর্য্যৈঃ পরিধিঃ স সূক্ষ্মঃ।
দ্বাবিংশতিঘ্নে বিহৃতেঽথ শৈলৈঃ স্থূলোঽথবা স্যাদ্ব্যবহার-যোগ্যঃ ॥

অর্থাৎ স্থূলব্যবহারযোগ্য π = ২২/৭ কিন্তু সূক্ষ্মগণনাকালে π = ৩৯২৭/১২৫০ বা ৩·১৪১৬। ইউরোপে পূর্ব্বোক্ত Leonardo πএর মান ১৪৪০/৪৫৮১/৩ লইয়াছেন (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী)। ১৫শ শতাব্দীতে Purbach (১৪২৩—৬১) আর্য্যভট্টোল্লিখিত ৬২৮৩২/২০০০০ মান গ্রহণ করিয়াছেন। ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে Regiomontanus πএর মান ৩·১৪২৪৩ দিয়াছেন।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে πএর যে মান দেওয়া আছে, তাহা হিন্দুস্থানের বাহিরে আধুনিক কাল ভিন্ন কোথাও বিদিত ছিল না।

ব্রহ্মগুপ্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলনিষ্কাশনের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা ইউরোপে Claviousএর (১৬শ শতাব্দী) পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত ইউক্লিডের ১ম অধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বৃত্তান্তর্গত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল, চতুর্ভুজের বাহুপরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল যে ব্যাসার্দ্ধ ও অর্দ্ধপরিধির গুণফল, তাহা

প্রমাণ করিয়াছেন। সূচী ও পিরামিডের ক্ষেত্র ও ঘন ফল নিষ্কাশন করিয়াছেন।

হিন্দু ত্রিকোণ-মিতি

ত্রিকোণমিতি-শাস্ত্রে হিন্দুগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপে প্রচলিত sine শব্দ আরবগণের নিকট হইতে লব্ধ। আরবগণের ব্যবহৃত শব্দ সংস্কৃত শিঞ্জিনী শব্দের অপভ্রংশ।

গণনাকালে গ্রীকগণ কোণের সম্মুখীন চাপের জ্যা ব্যবহার করিতেন, Hipparchus এবং Ptolemy জ্যা সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করেন, উহা নির্ভুল নয়। হিন্দুগণ নির্দ্দিষ্ট কোণের দ্বিগুণ কোণের চাপের অর্দ্ধজ্যা ব্যবহার করিতেন। অধুনা-প্রচলিত sineও এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর্য্যভট্টও ৩৪ অংশ ও উহার গুণিতক পরিমাণ কোণের শিঞ্জিনীর তালিকা প্রস্তুত করেন। π = ৩·১৪১৬ লইলে এই তালিকা নির্ভুল। ভাস্কর একটী সূত্র দিয়াছেন যাহা আজকালকার Differential Calculus-এর অনুসারে লিখিলে $d\,(\text{sine}\theta) = (\cos\theta)\ d\,\theta$ এই সূত্র হইতে অভিন্ন।

গণিতে উৎকর্ষলাভ সাংসারিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। যাঁহারা মনে করেন হিন্দুজাতি কেবল মালা জপিত, এই পার্থিব জগতের কথা ভাবিত না, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বে এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে উন্নতিলাভই-কোন মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। ধর্ম্ম-প্রচারই কোন জাতির একমাত্র লক্ষ্য থাকিতে পারে না। যাঁহারা হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মপ্রচারকের লোভনীয় পদ দান করিয়া আমাদিগের অতীত ইতিহাস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা ভুল বুঝাইয়াছেন। এই ধর্ম্ম-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া মিথ্যা অহঙ্কারে

অন্ধের ন্যায় আমরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া যাইবার পথে চলিতেছিলাম। ইতিহাস নূতন করিয়া আলোচনার ফলে ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুজাতির সাংসারিক জ্ঞান বড় কম ছিল না, ব্যবহারিক বিদ্যা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। তাহারা শিল্পব্যবসায়, বাণিজ্য, সুখভোগ, বিলাস-সামগ্রীর চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল এবং এই বৈষয়িক ভিত্তির উপরেই বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়াছিল।

অস্বাস্থ্যের প্রতীকার

জন-সাধারণের শক্তি বর্ত্তমানের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টায় নিয়োজিত হইবার যে আভাস দেখা যাইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। এতদিন লোকে কিসে অর্থ উপার্জ্জন হইবে এই চিন্তায় সদাই ব্যস্ত থাকিত, বর্ত্তমানে দেশে যদিও মহার্ঘতাই দুর্ভিক্ষের রূপান্তর হইয়াছে—লোকে যদিও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মধ্যে কেবল অর্থকেই উপাসনা করিতে প্রয়াসী থাকিতেছে, তথাপি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতির দিকে লোকের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়াছে। এখন লোকে সেই জন্য "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য শিখিতেছে।

বঙ্গে শুভ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই শারীরিকশক্তি-সঞ্চয়ের জন্য পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়াছিল। পরে সরকারের কুদৃষ্টিতে যখন উদ্যম সমূলে বিনষ্ট হইল—যখন সমিতি মাত্রেই রাজ-দ্রোহিতার প্রধান আড্ডা বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন বলিষ্ঠ যুবক মাত্রেই ডাকাতের প্রধান সর্দ্দার বলিয়া ধৃত হইতে লাগিল। শুনিতে পাই, আজকাল খুলনা যশোহর প্রভৃতি জেলায় সুস্থ সবল বালক মাত্রেরই উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িয়াছে! বাঙ্গালীর সুরেন্দ্রনাথ, এ সম্বন্ধে কি তুমি আন্দোলন তুলিবে না?

সন্তানের শক্তি স্বাস্থ্য-সামর্থ্যই যখন পিতামাতার যথার্থ ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল, তখনই বাঙ্গালা আবার জুজুর দেশে পরিণত হইল। যুবক যেন আবার কঙ্কালসার বালক; লাবণ্য ও শ্রী দেশ ছাড়িয়া পলাইল। দেশ আজকাল ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় খেলায় পূর্ণ হইতেছে। ফলে কাহারও হস্ত কাহারও পদ ভগ্ন হইতেছে।

তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, কিন্তু তাহারা পরিশ্রমানুযায়ী খাদ্যাভাবে অস্থিকঙ্কালসার হইয়া নানাবিধ ব্যাধির আকর হইতেছে—অমৃত বোধ হয় গরলে পরিণত হইতে চলিয়াছে! অপরদিকে বিদেশী জিনিষে স্বদেশীর তর্পণ হইয়া বিদেশীয় বণিকের বেশ দক্ষিণান্তও হইতেছে। ঝাড়ের বাঁশ ঝাড়েই শোভা পাইতে লাগিল—দেশী মুদ্‌গর কাহারও আঙ্গিনায় কাহারও চুল্লিতে আশ্রয় পাইল। যাহা হউক, বালক আবার সুবোধ সুশীল হইয়াছে—যুবক আবার উত্তম কেরাণী, নিষ্কর্ম্মা স্কুলমাষ্টার বা ওকালতনামাহীন উকীল হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল—বৃদ্ধ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—পিতামাতা সুস্থির হইলেন—সরকারও নিরাপদ বিবেচনা করিলেন! বুঝিলে—স্বাস্থ্যের দেবতা কেন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছেন?

এখন প্রায় সকল পীড়ার মূল কারণ ম্যালেরিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এক ম্যালেরিয়ায় বঙ্গ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। বীরভূম প্রভৃতি দুই একটী জেলা ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই ম্যালেরিয়া কিরূপে কি উপায়ে দেশ হইতে বিতাড়িত করা যায়, এখন ইহাই গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মহা সমস্যা।

অনেকে দেশের দূষিত জলবায়ুই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। আমাদের বিবেচনায় ম্যালেরিয়ার কারণ দুইটী —বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। জল-বায়ুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অমনোযোগ বাহ্যিক কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে অনাহারী বা অর্দ্ধাহারী এবং বস্ত্রহীন ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রধানতম কারণ বলিলে অন্যায় হইবে কি? ধন-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, আপনাদের কি মত?—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, আপনারা কি ধন-বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া লোক-সমাজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে সাহস করেন? অন্নবস্ত্রের অভাব যতদিন আছে, ততদিন স্বাস্থ্য বঙ্গে আসিবেন না।

খাঁটী গব্যঘৃত ম্যালেরিয়ানাশক—প্রবাদও কথিত আছে—ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। কিন্তু প্রধানতঃ অর্থাভাবেই আমাদিগকে ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। আজকাল দেশে সব জিনিষই ভেজাল—অকৃত্রিম দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য—ইহাই পীড়ার একটা প্রধান কারণ। সমাজে, দেশে, বাজারে এত ভেজাল মাল কেন চলিতেছে? আমাদের দোকান-দারেরা সকলেই অসাধু, দুশ্চরিত্র ও অসৎ—এ কথা বলিলে চলিবে না। উহা superficial মত মাত্র, একটা ভাসা-ভাসা অগভীর অনুসন্ধানের পরিচয়। যে কারণে দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকে ঘাস পাতা খাইয়াও বাঁচিতে চেষ্টা করে, সেই কারণেই আমরা সাধারণ সময়ে অপুষ্টিকর, স্বাস্থ্য-হানিকর খাদ্য পাইলেই কৃতার্থ বোধ করি।

দুর্ভিক্ষ আমাদের লাগিয়াই আছে—কাজেই আমরা—মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী সকলেই—কোন উপায়ে শরীর ধারণ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। ভেজালেও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না—ভেজালই আমরা চাই। আমরা দরিদ্র, শিল্পহীন, দুনিয়ার মুটে মজুর,—সুতরাং অতি "সুবোধ বালক—যা পাই তাই খাই!" অতএব দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকেরা যাহা চায়, যাহা demand করে, আমরা খুব সুখের সময়েও তাহা অপেক্ষা পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর মাল demand করিতে পারি না! ইহা তোমাদের ধন-বিজ্ঞানের মত। এইমত যদি খণ্ডন করিতে পার, তবে তোমাদের এম্, এ, পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীর বাহাদুরী দিব। গবর্মেণ্ট ত মাঝে মাঝে অনুসন্ধান-সমিতি বসাইতেছেন। "বিশেষজ্ঞগণ" বস্তা বস্তা রিপোর্ট বোধ হয় প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি পড়িতে পড়িতে আয়ু ফুরাইয়া আসিবে—স্বাস্থ্য ফিরিবে না। সরকার বাহাদুর কি practical হইবেন না? দুর্ভিক্ষের অবস্থা কাটিয়া গেলেই ভেজাল আর চলিবে না—স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে।

দেশ রেলে ছাইয়া ফেলিল—বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে অনেকেই ইহার অনুমোদন করেন সত্য। কিন্তু ইহা একদিকে যেমন উপকার দর্শাইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ জলের চলাচল বন্ধ করিয়া দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ উৎপাদনে সদাই নিয়োজিত। যেখানে জলপ্লাবন হয়, সেখানে প্রায়ই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয় না: বড় বড় নদীর উপরে প্রকাণ্ড সেতু নদীর স্রোত বন্ধ করিতেছে। ইহাও ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। "অমৃতবাজার-পত্রিকা" এ সব কথা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন।

আজকালকার সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মানব অধিক পরিমাণে সহরবাসী হইতেছেন—দেশ ছাড়িতেছেন—গ্রাম উজাড় হইতেছে। সন্ধ্যা-সকালে হরিনামে যে গ্রাম উদ্ঘোষিত হইত—শঙ্খ-ঘণ্টায় মুখরিত হইত—ধূপ-ধুনার গন্ধে দিক আমোদিত থাকিত—জন-কোলাহলে সদাই জীবনের লক্ষণ সূচনা করিত, এখন সেখানে শিবার চিৎকার, কাকের কা কা শব্দ, লতা-পাতায় পূতিগন্ধ ও স্থির নির্জ্জনতা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ সূচনা করিতেছে। গ্রামের পতনের সহিত বঙ্গের পতন অনিবার্য্য—বঙ্গের শৌর্য্যবীর্য্য, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য সবই এই গ্রামের পরিপক্ব ফল। প্রতাপ, সীতারাম, কেদার রায় সকলেই গ্রামবাসী ছিলেন—গ্রামই ইঁহাদের লীলা-ক্ষেত্র, গ্রামই ইঁহাদের উন্নতির, মান-মর্য্যাদার প্রধান সোপান। এই গ্রামকে উন্নত করিতে না পারিলে দেশ উন্নত হইবে না। সহরবাসী আর কয়জন?—মুষ্টিমেয়, হৃদয়হীন, ক্ষীণকণ্ঠ, অস্থি-কঙ্কালসার সহরবাসীর সংখ্যা কত? কিন্তু ঐ যে সহস্র সহস্র শত শত লোক গ্রামে বাস করিতেছে—ঐখানে দেশের প্রাণ—ঐখানে দেশের শক্তি—ঐখানেই দেশের সব আশা-ভরসা। এখন যে পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই, তাহার জন্য প্রধানতঃ ধনবান এবং বিদ্বানেরাই দায়ী।

আজকাল সবাই ডাক্তার, সবাই কবিরাজ, সবাই চিকিৎসক। এক

বোতল জল, দুই এক শিশি কুইনাইন এবং একটী আলমারি হইলেই আজকাল ডাক্তারী চলে! অবশ্য, এরূপ 'হাতুড়ে' ডাক্তার না থাকিলে আবার অনেক দরিদ্রের কুটিরে হাহাকার লাগিয়াই থাকিত। তাহা আমর বুঝি। কিন্তু ইহাও সত্য যে,—এই অভিনব চিকিৎসক-সম্প্রদায় দেশে পীড়ার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন। কুইনাইন একেই এদেে লোকের ধাতে অসহ্য, তাহাতে আবার ইহার অপপ্রয়োগ, এ দু'য়ে সংমিশ্রণে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। তবে আমরা এ কথা বলি ন যে, ইহাদেব মধ্যে দু'দশ জন যথার্থ মানব-হিতের জন্য চিকিৎসা-ব্রত অবলম্বন না করিয়াছেন—যাঁহারা এরূপ দায়িত্ব লইয়াছেন, ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। এদিকে সরকার বাহাদুর "মেডিক্যাল বিল" জারি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক্ষণে লোকহিত-ব্রত সুশিক্ষিত চিকিৎসকের উদ্ভব একান্ত আবশ্যক।

একদিকে যেমন ডাক্তারের প্রাদুর্ভাব, অপর দিকে অনেকে দুই একখানি-রসায়ন-শাস্ত্র, ভৈষজ্য-রত্নাবলী প্রভৃতি পুস্তক ক্রয় করিয়া গাছগাছড়া সামান্য চিনিলেই কবিরাজ বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন। ইহাতে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সুনামের পরিবর্ত্তে দুর্ণাম রটিতেছে। যে শাস্ত্র দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের কাছে শিক্ষা করিয়াছিলেন, রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হওয়ায় মুনি-ঋষিদিগের তপস্যাদির বিঘ্ন হওয়ায় অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, আত্রেয়, চ্যবন, কাত্যায়ন, মৈত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ—

"দিব্যভূতা সদারোজ্য প্রাদুর্ভূতা শরীরিণাম্,
তপোপবাসাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারো[illegible] মূলমুত্তমম্।"

ইত্যাদি শ্লোকে প্রজাদিগের দীর্ঘায়ু সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভরদ্বাজের নিকট যে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা করেন, মিত্রতাপরায়ণ পুনর্ব্বসু সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ছয় জন শিষ্যকে যে পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা দেন, তৎপরে অগ্নিবেশ প্রভৃতির সংগ্রহসকল যাবতীয় ঋষির অনুমোদিত হইয়া যে শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ভূতগণের মঙ্গল সাধন করিয়াছে, আজ তাহার এই দুর্দ্দশা! আজকালকার মহামহোপাধ্যায় কবিরাজগণ পাঁচন-বড়ীর দোকানদারী করেন মাত্র, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে নবজীবন সঞ্চারিত করিতে তাঁহাদের অল্পই চেষ্টা দেখা যায়।

ওষধিদিগের প্রয়োগ, নাম ও রূপ অবগত না হইয়া আজকাল অনেকেই উদ্ভিদবিৎ হইতেছেন—উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ না হইয়াই, আজকাল অনেক দেশ কাল ও ব্যক্তিভেদে ওষধি প্রয়োগ না করিয়াই ভিষক-শ্রেষ্ঠ হইতেছেন।

যে ভারত উদ্ভিদের দেশ—যেখানকার উদ্ভিদ দেশবিদেশে প্রেরিত হইয়া ভিন্নাকারে বহুমূল্যে বিক্রয় হইতেছে—তাহার এই দশা! কেবল উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে দেশের নানাবিধ অকল্যাণ হইতেছে, দেশীয় পাঁচনের যে কত ফল তাহা কি কাহারও অবিদিত? এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের যত উন্নতি হইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

খাদ্যাখাদ্যের বিচার শরীর-রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী—দেশের জলবায়ুভেদে খাদ্যদ্রব্যের তারতম্য হয়। শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এইজন্যই খাদ্য বিভিন্ন। কিন্তু আমরা এতই অনুকরণ-প্রিয় যে, খাদ্যাখাদ্যের অবিচার করিয়া অনেক সময়ে পীড়াকে ডাকিয়া আনি।

শরীর ও মন অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ—একের অশান্তিতে

অন্যের অশান্তি। যতদূর সম্ভব মনের শান্তি রাখিয়া সুখে জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। অনাচার, অত্যাচার, দুর্ব্যবহার, অবিবেচনা, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি নানা কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অবসন্ন। এই অবসাদ ও অশান্তি দূরীকরণের প্রধানতম কর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তির আধার ন্যায়বিচারক জগদীশ্বর—তাঁহার করুণার উপর নির্ভর কর।

সর্ব্বশেষে যুবকবৃন্দের নিকট আমাদের নিবেদন—তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান হইতে যাইয়া যেন শারীরিক পরিশ্রম হইতে একেবারে বিরত না হন। কেতাব মুখস্থ করার জন্য অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, সাধারণ। ছাত্রাবাসের অপুষ্টিকর খাদ্য, বহুজনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দূষিত বায়ু গ্রহণ, আহারান্তে বিশ্রামাভাব, জীবনে উৎসাহাভাব প্রভৃতি নানা কারণে—তাঁহাদের শরীরে, অস্বাস্থ্যের বিষ প্রবেশ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনও যে কত নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে—তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিসত্বে অনেকে সামান্য চাকরীর অভাবে যেন দিশাহারা পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, স্রোতোমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিতে থাকেন! ইহাই তাঁহাদের মানসিক দুর্ব্বলতার প্রমাণ। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে মানসিকবৃত্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল বায়ু, শারীরিক পরিশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, সৎ সাহস, আশা-ভরা আহ্লাদ, সাধুচিন্তা, এবং স্বাধীন-প্রবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রকৃত সহায়।

যেরূপ ভীষণ ব্যাপার দেখিতেছি, একমাত্র গবর্মেণ্টের প্রবল শক্তিই স্বাস্থ্যকে বঙ্গদেশে ফিরাইতে পারিবে। সমগ্র সমাজব্যাপী এ দুর্দ্দৈব পূর্ণরূপে নিবারণ করা অর্থহীন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জনসাধারণের

পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টারও কিছু ফল আছে, সে চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। আর আমরা যেন স্বাস্থ্যের জন্য চিরকাল কাঁদিয়াই মরিতে শিখি,—"এস ফিরে, এস ফিরে, এস ফিরে গো।" এ ক্রন্দন বিধাতা শুনিবেন।

বঙ্গের উদীয়মান কাব্য-সাহিত্য

এবার আমরা প্রবীণের কথা বলিব না, দুই একজন নবীনের কিছু পরিচয় দিব। বিক্রমপুরের গোবিন্দদাস, চট্টগ্রামের শশাঙ্কমোহন, কলিকাতার দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, পাবনার 'ত্রিদিব-বিজয়'-লেখক শশধর ইত্যাদি কবিগণ বঙ্গের সাহিত্যে এক একটা পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। সে পথগুলি এবার দেখাইতে চাহি না। এবার আমাদের কয়েকজন শিশুকবির রচনা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বাঙ্গালীর চিন্তা অনতিদূর ভবিষ্যতে কোন্ ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিবে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র দিব মাত্র। নব্য বঙ্গ-কাব্যের এই ধারা ও গতি বুঝাইবার জন্য দুই একজনের কোন কোন রচনার উল্লেখ করিব মাত্র। কোন কবি-বিশেষের নিন্দা বা প্রশংশা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বরিশালের বালক সতীশচন্দ্র রায় ১৩১০ সালে ২২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। স্বদেশী আন্দোলন তিনি দেখিয়া যান নাই।

এই শিশুর স্বপ্ন শুনাইতেছি। ১৩০৯ সালের ১৩ই বৈশাখের ডায়েরীতে লিখিত আছে—"এক দিন গাইব। সেই সঙ্গে সমস্ত জীবনের গান গাইব।

এখনো অনেক মিথ্যাকে দূর করিতে হইবে। সমস্ত স্বদেশকে, জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে,—এখনো প্রাণকে শান্ত হইতে শান্ত, নিবিড়-লীন হইতে নিবিড়লীন করিতে হইবে। এখনো আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিকে সুমার্জ্জিত করিতে হইবে।

কবিতা-রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোন দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি

যে, একটা ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শান্ত-সুন্দর গদ্যধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনাসৌন্দর্য্য এবং বিলাসের আক্রমে বড় এবং বিচিত্র, কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্ত্তি-গুলি কবে বাহির হইবে?—আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।"

ইহার নাম সাহিত্য-সাধনা। ইহার সিদ্ধি কোথায় হইত অনুমান করিতে পারি; কিন্তু লাভ নাই। Paradise. lost লিখিবার পূর্ব্বে মিণ্টন এইরূপ শিক্ষা, চরিত্র-দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করিতেছিলেন।

সতীশচন্দ্র কতকগুলি সাহিত্য-সমালোচনা রাখিয়া গিয়াছেন—সেগুলি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইবে। তিনি যে বয়সে ইংরাজ-সমালোচকগণের প্রদর্শিত পথে ব্রাউনিঙ্গের দুই তিনটি কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন প্রৌঢ় বাঙ্গালীর ক্ষমতায় কুলায় নাই। ভারতবর্ষে Browningএর কবিতাবলী এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয় নাই। এজন্য এখনো এদেশে ব্রাউনিঙ্গের পশার জমে নাই! সতীশচন্দ্র বি, এ পড়িতে পড়িতেই ব্রাউনিঙ্গ বুঝিতেছিলেন। ইহাকে বলে প্রতিভা।

সতীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বোলপুরের অজিতচক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। এই ফাঁপা, আদর্শহীন, চিন্তাহীন, বাগাড়ম্বরপূর্ণ কবিতা-রাশির দিনে সতীশচন্দ্রের গভীরতা, গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও ভাবুকতা উদীয়মান লেখকসম্প্রদায়কে সাধনার প্রণালী দেখাইয়া দিবে। বোধ হয় সতীশচন্দ্র তোমাদের নিকট কর্কশ, নীরস, শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে, কিছু দুর্ব্বোধ্যও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রাণময়ী কবিতার

মধ্যে পাইবে "জীবন, জীবন ভাই, আনন্দ জীবন।" সতীশচন্দ্র পালোয়ান—বিভীষিকার সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতেছেন। তিনি দৃঢ় পদে জীবন-সমুদ্র-মন্থনে ব্যাপৃত। সতীশ মানুষ, মেষ-সুলভ দুর্ব্বলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

"রৌদ্র-মুগ্ধ কবির চিঠি" বাঙ্গালায় নব যুগ আনিতেছিল—উদারতার যুগ, বিপুলতার যুগ, Sublimityর যুগ, সবলতার যুগ, যথার্থ ক্ষমতার যুগ, জীবনের যুগ।

"মনে পড়ে সে বালকে? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রূকুটিমুক্ত, উদার নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরুছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখ স্পৃষ্ট প্রাণে প্রতি বিন্দু অনুভব।

* * *

কত ফিরিলাম,—
কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্ব ছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর—
প্রতি কণ জড় জীবে রন্ধ্র এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?

দৃঢ়-বাহু ওই জেলে ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু তুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাশ্বস্ত ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্য-দৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভাল বাসে
—তা' ন'লে কি জলে পড়ি ওইরূপে হাসে ?
—জীবন, জীবন ভাই। আনন্দ জীবন।

* * *

এ কলিকাতায়
দাঁড়াইয়া পরাণের সমুদ্র-বেলায়
দিনু ছুঁড়ি পত্র খানি। ওগো কবিগণ,
তোমরা বুঝিয়া লও কি এ জলপন।"

অকালে পরলোকগত প্রতিভাবান্ কবির কথা উঠিলে বিলাতী কীট্সের নাম মনে পড়ে। কিন্তু ব্রাউনিঙ্গ-সুলভ এ ক্ষমতা সৌন্দর্য্যোপাসক কীট্সের বেশী আছে কি ? সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এ উদাত্তসঙ্গীত কতবার উঠিয়াছে ? এ যে বিবেকানন্দের "নাচুক সেখানে শ্যামা" গাহিবার জন্য বিপুল অথচ সরল আয়োজন। আমরা ইহার ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্য অন্যান্য অপ্রকাশিত কবিতাগুলি দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম। অজিত বাবু "সে গুলির কোনটাই তেমন আকার প্রাপ্ত হইয়া উঠে নাই" বলিয়া চাপিয়া রাখিয়াছেন।

সতীশচন্দ্রের 'জামদগ্ন্য,' 'চণ্ডালী,' 'দুঃখদেবতার মূর্ত্তি,' 'ভগ্ন-নগরে প্রেম-সম্মিলন,' 'ভগ্নবাড়ির দেবতা,' আজকালকার 'ঝরা ফুল,' 'ফুলের

ফসল,' 'বিল্বদল,' 'একতারা,' 'রেখা' 'লেখা,' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবিতাবলীর নামগুলিতেই আকাশ-পাতাল পার্থক্য! সতীশচন্দ্র একা নূতন রাজ্য গড়িতেছিলেন—তাঁহার কল্পিত কাব্য-প্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার সমসাময়িকগণ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

করুণানিধান—সত্যেন্দ্র নাথ—কুমুদরঞ্জন—কুমুদনাথ—যতীন্দ্র বাগ্‌চি প্রভৃতি কবিকুল অন্তর্জ্জগৎ, প্রকৃতির ভিতরকার কথা, মানবের ভিতরকার কথা, জীবনের গূঢ় রহস্য এ সব বিশ্লেষণ করিতে পারেন না। তাঁহারা রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন—ভাষার কছরত, স্বল্পমাত্র নিম্নশ্রেণীর intellectual gymnastics, কলাচাতুর্য্য, শিল্পনৈপুণ্য, চামড়ার চোখ-কান, বাহিরের আবরণ ইত্যাদি লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত। সতীশচন্দ্রের গাম্ভীর্য্য ও sublimity লাভ করা ত দূরের কথা—ইঁহারা তাহার সংবাদই এখনও পান নাই।

করুণানিধানের নবপ্রকাশিত 'শান্তিজলে' এই উদীয়মান কবিগণের ক্ষমতার দৌড় ও সীমা দেখাইতেছি। কবি তাজমহল দেখিতেছেন—বিশ্বসংসারকে, মানবজগৎকে, প্রকৃতিকে ইঁহারা সকলেই এই স্থূলচোখেই দেখিয়া থাকেন—

"আসিয়াছি আজি প্রবাসী পান্থ
হেরিতে কান্তি রাশি—
বসিয়া তোমার অলিন্দতলে
হেরিব বিমল হাসি।
বিরাট্ দুর্গ-সোপান বাহিয়া
যমুনায় তুমি আসিতে নামিয়া,
কি সুর ধরিতে, মুকুতা তরীতে—
সখীরা বাজাত বাঁশী,

কত না আদরে প্রেমের পেয়ালা
আধেক করিয়া খালি,
মল্লী-মুকুল- তুল্য তোমার
অধরে দিত কে ঢালি ?
রাঙ্গিয়া উঠিত ফুল্ল কপোল
চুম্বন-রাগে বিলোল বিভোল,
আনার আঙ্গুর-রসে-পরিপূর
মোহ-উপহার ডালি।"

ইহার সঙ্গে rugged বা শ্রুতি-তিক্ত কিন্তু গাম্ভীর্য্যময় সতীশচন্দ্রের 'বামুন-শূদ্র তফাৎ'—ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, 'প্রেরণা'য়। অথচ এই খানেই আমাদের নব্য কবিকুলের generic style বা সাধারণ রচনা-কৌশল। ইঁহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই টেনিসনের ঝঙ্কার পাইবে—শব্দসম্পদ পাইবে—অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি পাইবে—সুললিত লিপিভঙ্গী পাইবে—বাক্যজাল পাইবে—ভাব-দারিদ্র্য ঢাকিবার জন্য সহজ-সরল অথবা কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত ভাষার ছটা এবং ছন্দের গরিমা পাইবে। পাইবে না কেবল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নবজীবন—"she gave me eyes, she gave me ears।" পাইবে না হিন্দুর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্মবিচার, গভীর চিন্তাশক্তি। পাইবে না—

"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা"

—সেই situation বা দেশ-কাল-পাত্র সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা। পাইবে না রবীন্দ্রনাথের গভীরতর শিল্পনৈপুণ্য, সূক্ষ্মতর আর্ট—যাহার চাপে মানবাত্মা এবং প্রকৃতি-হৃদয় লুপ্ত ও হতপ্রভ হয় না—বরং যে কলাচাতুর্য্যের সাহায্যে বিশ্বের জীবন-স্পন্দনই আমরা প্রত্যক্ষরূপে

অনুভব করিতে পারি। পাইবে না জগৎকে বুঝিবার ক্ষমতা, ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির করিবার প্রয়াস। পাইবে না সতীশ-চন্দ্রের "ছায়ায়াঃ গর্ভসম্ভূতং"-কবিতা-নিবদ্ধ যথার্থ কল্পনাশক্তি। পাইবে না ব্রাউনিঙ্গের—

The other side, the novel
Silent silver lights and darks undreamed of
Where I hush and bless myself with silence."

একবার নীরব হইতে শিখ, চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে শিখ, সাধনা করিতে শিখ—তবে্ জগৎকে শিখাইতে পারিবে—তোমাদের রচনাগুলি টিকিয়া যাইবে—বন্ধুর-পাঠ এবং শ্রুতিকঠোর হইলেও অমর হইতে পারিবে।

'বিল্বদলে'র শেষ কবিতায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী এই নীরব সাধনার কথা তুলিয়াছেন—

"চুপ্ কর—শান্ত মোর গতিবিধি আজ।
আলোক-বাতাস-বন্যা ছুটে চলি যায়,
পিয়ে লব তরুসম পাতায় পাতায়,
কোথা গুপ্ত রহে রস পাতালের মাঝ,
পাঠায়ে শিকড় তারে লইব শুষিয়া!
কুসুমে সুষমা মাখি', শেষে একদিন
ফুটিয়া রহিব চেয়ে বিরাম বিহীন!
সহসা, কে জানে, অলি কেমনে আসিয়া
গোপনে পরাগ ঢালি গর্ভকোষে মোর
ফলেরে জনম দেবে! সেদিন সুদিন,
দীপিবে জীবন মোর সকল নবীন,
ব্যাপিবে সারাটা দেহে পুলকের ঘোর।"

কুমুদ লাহিড়ী বেশী কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 'বিল্বদল' হইতে বাঙ্গালী দশ বিশ লাইন স্মরণযোগ্য কথা পাইবে মাত্র। কুমুদনাথের 'তুমি', 'পদ্মা', 'স্বাস্থ্য', 'তন্ময়' প্রভৃতি কবিতায় গাম্ভীর্য্যের পরিচয় আছে—একটা নূতন সুর উঠিতেছে। কিন্তু অত অনুসন্ধান করিয়া কে পাঠ করিতে বসিবে?

করুণানিধানও 'চণ্ডীদাসে' এই নীরবতা, অপ্রগল্‌ভতা এবং তন্ময়তার কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাইয়াছেন—

"বারটি বছর চেয়েছিল কভু
কহ নি একটি কথা,
ঝরিত তোমার আঁখির পাতায়
স্বরগ-নির্ম্মলতা!
এমনি করিয়া ফুরাইত দিন,
তোমার হিয়ার মাঝে
কেহ জানিত না রসমূর্চ্ছনা,
সুধার রাগিণী বাজে!"

এই "কেহ জানিত না"-অবস্থা হইতেই গাম্ভীর্য্যের, গভীরতার, ব্যাকুলতার উদ্ভব হয়। এই "কেহ জানিত না"-অবস্থা আমাদের কবিকুলের বড় অল্প। তাঁহারা নিজে মজিবার পূর্ব্বেই অন্যকে কিছু দিতে চাহিতেছেন!

তোমরা অমর হইতে চাহ? তাহা হইলে মরজগতের ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া যাও, নিজকে ভুলিয়া যাও নিজকে ডুবাইয়া ফেল; আত্মহারা তন্ময় হইয়া পড়, নিজের যাহা সত্য সত্যই দিবার আছে দিয়া যাও, পাওনার কথা ভাবিও না। কর্ত্তব্য করিয়া চল, দেখিবে সমগ্র ভারত অমর হইবে। ভারতের অমরতার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমি, রামা শ্যামা,

মুচি ম্যাথর, কুলী মজুর, আমাদের দাঁড়কাক ময়ূর, প্রতি ধূলিকণা—সবই অমরতা লাভ করিবে। ভবিষ্য সমাজ অতীতের নীরব সরব সকলকেই টানিয়া বাহির করিবে—জননী কাহাকেই ভুলিয়া থাকিবেন না—যাঁহার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু তাঁহাকে দিবেন। এ বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে নাই। তবে বৃথাই তুমি কবি সাজিয়াছ!

চোখ খুলিয়া জগতের অবস্থা দেখিতে চেষ্টা করিলে বুঝিবে—আজকাল রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যে পূজা পাইতেছেন তাহার প্রধানতম কারণ বিশ্বে ভারতের গৌরবপ্রচার। ভারত-মাহাত্ম্যেই পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা ঘটিয়াছে। ভারতের গৌরব ও প্রভাব পূর্ব্ব হইতেই পাশ্চাত্যেরা অনুভব করিতেছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা আজ রবীন্দ্র-প্রতিভাকে সম্মান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সেইরূপ ভারত-মাহাত্ম্যেই তোমাদেরও কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে।

সত্যেন্দ্রনাথের "আমরা বাঙ্গালী সাতকোটি ভাই বাস করি সেই বঙ্গে"-কবিতাটি অমর হইবে। এখনই ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশে'র সমকক্ষ—ভবিষ্যৎ সমালোচনায় আরও উন্নত হইবে। বঙ্কিমের 'বন্দে-মাতরং' জগতের ভক্তি-সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাহার সঙ্গে তুলনা কোন রচনারই চলিতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গের জাতীয় সঙ্গীতে যে নূতন শক্তি-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন তাহারই ক্রমবিকাশ সত্যেন্দ্রনাথের এই গানে দেখিতে পাইতেছি।

সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সুন্দর চিত্র আঁকিতে সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার অনুবাদ-কবিতাগুলিও অতি মনোরম। এ গুলি বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা সত্যেন্দ্রনাথকে একটা 'বরাত' দিতেছি। তিনি আমাদের সাহিত্যে দরিদ্রের ক্রন্দন—অশিক্ষিতের আর্ত্তনাদ—জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা—মফঃস্বলের বাণী—

তুলিতে আরম্ভ করুন। সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ইহা সম্ভব—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কনের দ্বারা ইহা সহজেই সাধিত হইবে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানগুলি আলোচনা করিলে বহু দেশ-কালপাত্র পাইবেন। বিলাতী বারণস্, চ্যাটারটন, অসিয়ান, জার্ম্মান্ হার্ডার, এবং রুশ করমসিনের সূত্র ধরিলে বঙ্গসাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব জগৎ আনিয়া ফেলিতে পারিবেন। সে ক্ষমতা তাঁহার আছে দেখিয়াছি।

এই নূতন জগতে—

"নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ দৃঢ় দুঃখজিৎ,
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন, বিজয় তাঁহার সুনিশ্চিত।

* * * *

সুরু হ'ল নূতন নাট্য সূত্রধরের নূতন নাট,
সাগর পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী পাঠ।"

* * * *

"ধর্ম্ম-আচার করছে তারা যাচ্ছে জেলে সস্ত্রীকই,
বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ, রুখ্‌বে তাদের অস্ত্রে কি?"

আমরা অনেকবার বলিয়াছি, এটা আমাদের নবজীবনের দ্বিতীয় যুগ চলিতেছে। তাহার এক লক্ষণ "জনসাধারণের" অভ্যুদয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই "জনসাধারণের যুগে"র কবি হইতে পারিবেন। দরিদ্রের সংসারে সত্যেন্দ্রনাথ বিচরণ করিতে পারেন। দারিদ্র্যের মহানাট্য-গঠনোপযোগী 'নান্দী' তিনি রচনা করিয়াছেন :—

"নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের অত্যাচারে
স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ সাগর পারে,
কেউ বা করে দিন মজুরী, কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার,
তাদের শ্রমে শ্যামল আজি মরুস্থলী আফ্রিকার।

রবার-গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায়তের হয় জনতা,
বো-বাব গাছের তলায় ব'সে রামায়ণের কথকতা।
মৃদং বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে, মন্দিরা,
ভারত-স্বপন জাগায় সেথা পরবাসের বন্দীরা।
আজকে তাদের বন্ধ সারং মাদল মৃদং মৌন হায়!
সবাই যদি মনে কর তো আবার তারা সাহস পায়,
সবাই যদি মনে কর তো চেষ্টা তাদের হয় সফল,
দেশের সুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলী-বেনের দল।
অপমানের ঐক্যে আজি এক হয়েছে ভারত-প্রজা।
হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্মানে হচ্ছে সোজা।"

করুণানিধান ভারতবর্ষের বিচিত্র স্থানগুলিকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার শিল্পে আমাদের ঐতিহাসিক ও ধর্ম্ম-জগৎ প্রধান স্থান পাইয়া থাকে। বাঙ্গালীকে মাতাইবার পক্ষে এই আলোচনাই বিশেষ কার্য্যকরী। করুণানিধান আমাদের জাতীয়জীবন-গঠনোপযোগী দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি অতীতকে কথা কহাইবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে কবিতায় প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন।

কিন্তু দেশের মাটিটাকে আর একটুকু ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন। তাহা না হইলে রচনাগুলি মরমে পশিতেছে না। কেবলমাত্র হিন্দুর পবিত্র জনপদসমূহের আলোচনা করিলেই হিন্দুত্ব বুঝান হইল না। হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শনের কয়েকটা পারিভাষিক শব্দ ছড়াইতে জানিলেই হিন্দুর বাণী প্রচারিত করা হয় না।

বাগ্‌চি মহাশয়ের একটা স্বাভাবিকতা, সরলতা আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি নব্যকবিগণ সকলেই বাহ্য প্রকৃতির মাধুরী লইয়া

নাড়াচাড়া করেন। ভাব অতি অল্পমাত্র—ইহাঁদের বলিবার কথা বড় বেশী নাই—কেবল আর্ট-ফলান—কথা কাটাকাটি। এক কথাই সত্যেন-যতীন-করুণানিধান 'খাড়া থোরবড়ী' 'থোরবড়ী খাড়া' 'বড়ী খাড়া থোর' রূপে প্রকাশ করিতেছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির নীচে যদি লেখকের নাম প্রকাশিত না থাকে তাহা হইলে অনেক সময়ে যতীন, সত্যেন, করুণানিধান ইত্যাদি প্রভেদ করা অসম্ভব। বোধ হয় কাল-হিসাবে করুণানিধান এই যুবকদলের প্রবর্ত্তক।

'একতারা'র লেখক কুমুদ মল্লিককে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি:—
"একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।"

"উজানীতে" আপনার 'তার'। বাঙ্গালায় অনেক উজানী আছে—সেগুলিকে কাব্যে চিত্রিত করুন। রামপাল, রামাবতী, রামকেলী, কেন্দুবিল্ব, বিক্রমপুর, সপ্তগ্রাম, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অসংখ্য ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তীর্থক্ষেত্র বঙ্গের ভাবুকগণকে আহ্বান করিতেছে। আমরা দেখিয়াছি, কুমুদরঞ্জন পল্লীর "মূক মুখে ভাষা দিতে" পারেন। আমাদের বিশ্বাস—তিনি ধর্ম্মভাবে বাণীপূজায় অগ্রসর হইলে দশবৎসর পরে পল্লীরাণীর ভগ্নবুকে আশা ধ্বনিয়া তুলিতে পারিবেন।

মাঝে মাঝে শুনিতে পাই—এটা "রবীন্দ্র-সাহিত্যের যুগ"। মিথ্যা কথা। রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল সূত্র কোন উদীয়মান লেখকই ধরিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ 'ভাবুকতা'র প্রতিমূর্ত্তি। ভাবুকতা কাহাকে বলে গত সংখ্যায় * তাহার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের এই শিশু কবিগণের মধ্যে সে ভাবুকতা একেবারেই নাই বলিলে ইহাদিগকে

---

* গৃহস্থ, পৌষ সংখ্যা, ১৩২০।

নিতান্তই নিন্দা করা হইবে না, কারণ সে ভাবুকতার অধিকারী হওয়া ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। আমাদের প্রধান দুঃখ এই যে, আমাদের নবীন কাব্য-শিল্পে সাধারণ ধরণের চিন্তাশক্তি এবং ভাবেরই যৎপরোনাস্তি অভাব পড়িয়াছে—যথার্থ ভাবুকতার দুর্ভিক্ষ ত লাগিবেই। আমাদের কবিগণের অন্তর্জ্জগৎ বড়ই অন্তঃসারশূন্য—বড়ই দরিদ্র, "বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।" রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে আমরা ত্রিশ বৎসরের ভিতর পাইব কি না জানি না।

ভাবের এত দৈন্য আসিল কোথা হইতে?

যুবক বাঙ্গালার অন্যান্য মহলে ভাবের ত অভাব দেখি না—বরং যথার্থ ভাবুকতাই যথেষ্ট দেখিতে পাই। কেবল কবি-মহলে ভাবের দৈন্য আসিল কোথা হইতে?

সতীশচন্দ্রের ন্যায় ইঁহাদের সাধনা নাই বলিয়া—অথবা সতীশচন্দ্রের ন্যায় ইঁহারা "স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি" লইয়া, নৈসর্গিক প্রতিভা লইয়া জন্মেন নাই বলিয়া।

এই কবিকুল ভাব-সাগরে ডুবিতে পারেন না, ভাব সৃষ্টি করিতে পারেন না। নিজে তন্ময় হইতে জানেন না—অন্যকে মজাইতে পারেন না। ইঁহারা সাধারণতঃ দুই একটা ভাব এখান ওখান হইতে—দুই চারি পাতা ইংরাজী কাব্য, দুই চারিখানা রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র ঘাঁটিয়া সংগ্রহ করেন মাত্র। সেই দুই একটা পরকীয় ভাব নিজের কথায় নানা ঘটনার সাহায্যে ফলাইতে যাইয়া শব্দের আড়ম্বর এবং ভাষার কছ্‌রত করা হইয়া থাকে। কেবল মাত্র যে স্থলে সাময়িক ঘটনা, অথবা একটা পল্লীচিত্র, অথবা কোন ঐতিহাসিক স্থান বর্ণনা করিতে হয়, সেখানে কবিক্ষমতা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু বেশী কিছু শিখিতে পাই না—আমরা মাতিয়া উঠি না। এখনও ইঁহাদের স্বতন্ত্র "message" বা বাণী কিছুই পাই নাই।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অসংখ্য পরিবর্ত্তনগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার জন্য চীন, তিব্বত, নেপাল, আসাম, ব্রহ্মদেশ, যুক্তপ্রদেশ, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র—এই সকল স্থান বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। বাঙ্গালার যাঁহারা ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহাদিগকে এই সকল দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে, জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং জাতীয় জীবনের গূঢ় কথাগুলি অবধারণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় জলপ্লাবন

দামোদরের বিগত বন্যায় ভগবতী আবার চণ্ডী মূর্ত্তিতে বাঙ্গালায় দেখা দিয়াছেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্যই জননীর তাড়না। তাই দেখিতেছি একদিকে যেমন জীব-জন্তু, ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র-আহার্য্যদ্রব্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর একদিকে তেমনি আর একটা জিনিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেটি আমাদের জড়তা, আলস্য-প্রিয়তা। মানুষের মধ্যে পরসেবার যে চিরন্তন প্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে, তাহাই আজ দেশের চারিদিকে নবভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আজ দেখা যাইতেছে কেহই আর্ত্তের রোদনে কর্ণপাত করিতে কুণ্ঠিত নহে—সকলেই আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে, সকলেই সাধ্যমত বিপন্নের সাহায্যজন্য ব্যগ্রচিত্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্দ্ধোদয়-যোগে আমরা এই পরদুঃখকাতরতা, এই পরসেবার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলাম এ দেশ আর ক্ষুদ্র নহে—এ দেশ স্বার্থসঙ্কীর্ণতার জাল ছিন্ন করিতে পারিয়াছে। আর আজ ভীষণ বন্যার ফলে বুঝিতে পারিতেছি, দেশে মাতৃসেবার আকাঙ্ক্ষা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে। আজ চারিদিক হইতেই

সহানুভূতি, দানশীলতা, পরসেবানিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। বিপন্নের সাহায্যকল্পে বহু সম্প্রদায়, বহু সঙ্ঘ, বহু স্বেচ্ছাসেবক কার্য করিতেছেন। হিন্দুস্থানবাসিগণ কলিকাতা মাড়োয়ারি সম্প্রদায়, ও আর্য্য সমাজ, কলিকাতা ও বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্ম-সমাজ, নিঃস্ব হিতৈষিণী, মুসলমানছাত্রসঙ্ঘ, কলিকাতার কেন্দ্রীয় সাহায্য-সমিতি প্রভৃতি বহু সাহায্য-সম্প্রদায় সেবাকর্ম্মে নিরত। এতদ্ভিন্ন আরও কত নূতন নূতন সাহায্য-সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে। কত শিক্ষক, কত ছাত্র কত ডাক্তার, কত উকিল ব্যারিষ্টার স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিতেছেন তাঁহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা কেহ খাদ্য, কেহ ঔষধ, কেহ কাপড়ের বস্তা মাথায় করিয়া আবক্ষ জলের মধ্য দিয়া চলিতেছেন—ভীষণ স্রোত প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত, গর্জ্জনপর দামোদর, আজানু কর্দ্দম, আপতিত বৃক্ষরাশি ভগ্নগৃহ, প্রাণক্ষয়কর পূতিগন্ধ কোন দিকেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বুঝি দেশবাসী তাঁহাদের শোণিতের বন্যায় এই বন্যা ভাসাইয়া দিতে অগ্রসর! এবার বাঙ্গালী জাতি দেশমাতা দুর্গার বোধন-কল্পে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে থাক—

"বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে সকলি দয়া তব জেনেছি মা দুখহরা।"